শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী

প্রথম খণ্ড

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

প্রকাশক ঃ
শ্রীমানসপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক
দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
~~৩, গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট~~
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর ঃ অনিলকুমার ঘোষ
নিউ ঘোষ প্রেস
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ ঃ আষাঢ়, ১৩৩১
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক, ১৩৬৩
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ আশ্বিন, ১৩৭১

উৎসর্গ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যিনি বিশেষ কৃপা পাইয়াছিলেন, শ্রীমৎ স্বামী
বিবেকানন্দ যাঁহাকে আশ্বাস দিয়া যাঁহার কুল পবিত্র
বলিয়াছিলেন, যিনি বিশেষ ধনাঢ্য হইয়াও নম্রতা ও
বিনয়গুণবশতঃ সকলের কাছে নিতান্ত ঋজু থাকি-
তেন, যাঁহার অমায়িক ভাব ও স্নেহপূর্ণ বাক্য
সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল, যিনি
বর্তমান লেখকের বিশেষ সুহৃদ্ ও
যাহাকে তত্ত্বাবধান করিতেন
সেই পুণ্যাত্মা বলরাম
বসুর পবিত্র স্মৃতিকল্পে
এই গ্রন্থখানি
উৎসর্গীকৃত
হইল।

প্রাগ্‌বাণী

১৯২৩/২৪ খৃষ্টাব্দের শীতকালে কনখলে অবস্থানকালে আশ্রমে 'বিনয় পিটক', 'জাতক' ও অপরাপর বৌদ্ধগ্রন্থসকল পাঠ হইতেছিল। সেই সময় এই গ্রন্থখানি লিখিবার প্রথম প্রয়াস হয়, এইজন্য এই গ্রন্থখানিতে অনেক পরিমাণে বিনয় পিটক বা জাতকের রীতি অনুসৃত হইয়াছে।

জীবনী বা ইতিহাস অনেক লিখিত আছে এবং তাহা প্রায় একজনেরই হইয়া থাকে। কিন্তু এই গ্রন্থ জীবনী বা ইতিহাস নহে, ইহাকে ইংরাজীতে Annals বা ঘটনাবলী বলে। যতদূর সম্ভব ঘটনাগুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তবে পারম্পর্য বা নির্ধারিত সময় দেওয়া হয় নাই, কারণ এস্থলে তাহার কোন আবশ্যক নাই। ঘটনাগুলিতে নিজের কোন মত প্রকাশ করা হয় নাই, পাঠ করিয়া যিনি যাহা বুঝিবেন সেইরূপ মীমাংসা করিবেন। ঘটনার কোন কোন অংশ অনাবশ্যক বা অপ্রাসঙ্গিক বুঝিয়া ত্যাগ করা হইয়াছে, তাহাতে মূল উপাখ্যান কিছু বিপর্যস্ত হয় নাই।

প্রত্যেক লেখক আপনার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঘটনাবলী পর পর সন্নিবেশিত করিয়া পাঠকের মনকে অতর্কিতভাবে গন্তব্যস্থানে লইয়া যান, এই নিমিত্ত প্রত্যেক লেখকের লিখিবার নিয়মপদ্ধতি পৃথক পৃথক হইয়া থাকে, কারণ একই ঘটনা বিভিন্নপ্রকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

স্বামীজীর জীবনীর বিষয় অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আমি যতদূর পড়িয়া দেখিয়াছি, প্রত্যেক গ্রন্থই সুন্দর হইয়াছে। প্রত্যেক লেখক নিজের ইচ্ছামত কতকগুলি উপাখ্যান সংযোগ বা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই। প্রচলিত সব গ্রন্থগুলি না পাঠ করিলে ভিতরকার ভাবটি বুঝিতে পারা যায় না, এইজন্য কয়েকখানি গ্রন্থ প্রত্যেকের পাঠ করা উচিত, কারণ প্রত্যেক লোকই স্বামীজীকে আপনভাবে দেখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। স্বামীজীর বহুমুখী ভাব ছিল, বহুপ্রকারে তাহা প্রকাশ করিলেও তাঁহার ভাবের অল্পমাত্র বলা হয়।

প্রচলিত গ্রন্থগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যাঁহারা ভক্তলোক তাঁহারা ভক্তির ভাব হইতে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। যাঁহারা

ঐতিহাসিক তাঁহারা ইতিহাসের দিক হইতে লিখিয়াছেন। ইচ্ছামত একটি ভাবকে মুখ্য ও অপরটিকে গৌণ করিয়া লেখা হইয়াছে, কিন্তু কার্যতঃ তাহাতে কোন প্রভেদ হয় নাই।

এই গ্রন্থখানিতে যে সকল ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে, অধিকস্থলে বর্তমান লেখক উপস্থিত ছিলেন ; যেগুলি কোন বিশিষ্ট লোকের নিকট শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। কতকগুলি ঘটনা একত্রিত সন্নিবেশিত করা এ গ্রন্থে উদ্দেশ্য নহে। প্রত্যেক ঘটনাটিতে একটি বাস্তব চিত্র, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কিরূপ বসিয়াছিলেন বা হাত পা নাড়িয়াছিলেন, পরস্পরের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল এইরূপ অলক্ষিত চিত্র দেখান এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। জীবন্ত ভালবাসা ও স্পর্শনীয় জাগ্রত শক্তি কিরূপ ছিল পাঠক যদি সেইটি স্পষ্টভাবে দেখিতে পান ও আপনার ভিতর সেই জীবন্ত শক্তি জাগ্রত হইয়াছে অনুভব করেন, তাহা হইলে গ্রন্থখানি সফল হইল মনে করিব। এই গ্রন্থে ঘটনাগুলির আবৃত্তি করা আমার উদ্দেশ্য নহে, জীবন্ত চিত্র দেখানই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। গ্রন্থের তারতম্য বিচার করিতে হইলে উল্লিখিত উপাখ্যানটি চিত্রাকারে সুস্পষ্টভাবে চক্ষের সামনে দণ্ডায়মান হয় কি না সেইটি দেখিতে হইবে কারণ ইহাই হইল গ্রন্থের প্রাণ। শব্দবিন্যাসে ভাষায় কিছুই আসিয়া যায় না। সেই জীবন্তচিত্রের ভিতর অলক্ষিতভাবে প্রবল শক্তি হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ করে। ইহাকে কবিতা বা গ্রন্থের জীবনশক্তি বা চিত্র বর্ণনা বা প্রকৃত ধ্যান বলে। ইহারই উপর গ্রন্থের বিচার হইয়া থাকে। যদি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক একটি জীবন্ত শক্তি অনুভব করেন, তাহা হইলে সকল শ্রম সফল হইল মনে করিব।

ইতি—

কলিকাতা

গ্রন্থকার

২৫শে আষাঢ়, ১৩৩১

পরিচয়

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থখানির সামান্য অংশ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীর পরিচয় আমরা পাই। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী-শিষ্য এবং গৃহী-ভক্তদিগের জীবনের ধারা বড় একটা সাধারণে জানেন না, অথচ বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্মসম্প্রদায়ের জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশটি না জানিতে পারিলে ভবিষ্যতে ভারতের ইতিহাস লিখিবার একটি বিশাল স্তম্ভ অঙ্গহীন হইয়া থাকিবে।

সাধকের জীবনী লেখা সম্ভব হয় না, কারণ তাহাদের জীবনে একটা সঠিক দাঁড়িপাল্লা পাওয়া যায় না। গৃহীর জীবন-বৃত্তান্ত সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায় সেইজন্য মোটামুটি একটি খসড়াও তৈরি করা হয়। কিন্তু এই পুস্তখানিতে স্বামীজীর ও তাঁহার ত্যাগী-গুরুভাই এবং গৃহী-ভক্তদিগের জীবনের ঘটনাগুলি ঘটনাবলীর দিক্ দিয়া গ্রন্থকার সাধারণের সম্মুখে প্রদান করিয়া তৎসময়কার জীবনের ধারা সাধারণকে জানিতে সুযোগ দিয়াছেন। কাশীপুরের বাগান, বরাহনগর মঠ এবং আলমবাজার মঠের সাধনার ইতিহাস না জানিতে পারিলে বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশনের বিকাশ জানিতে পারা যায় না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোভাবের পর তৎ-শিষ্যসম্প্রদায় কিরূপভাবে ভগবৎলাভের জন্য দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, দেব-উন্মাদ হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, কিরূপ লাঞ্ছনা ও কষ্টভোগ সহ্য করিয়াছিলেন এবং কিরূপ স্বোপার্জিত সাধনার দ্বারা একটির পর একটি সৌধ নির্মাণ করিয়া বর্তমান ভারতের জীবনী-শক্তির প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছেন তাহারই যৎসামন্য পরিচয় বর্তমান গ্রন্থকার সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই পুস্তক প্রণয়নকালে স্বামী অসঙ্গানন্দ (পঞ্চানন), স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ (যতীন), প্রোঃ বিধুভূষণ দত্ত ও শ্রীত্রিলোচন

সিংহ মহাশয়দিগের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি তজ্জন্য এইস্থানে তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া পুস্তকখানিরপরিচয় সাধারণের নিকট ধরিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইতি—

কলিকাতা.
২৬শে আষাঢ়, ১৩৩১

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিঃ দ্রঃ—বিষয় সূচী সম্পাদক কর্তৃক রচিত, গ্রন্থকার কর্তৃক নহে।



শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী

নরেন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ— শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার পিতামহ ও পিতার বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। পিতামহ ৺দূর্গাপ্রসাদ দত্ত, প্রথম পুত্র সন্তান জন্মালেই ২২ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া ৺কাশী ও পশ্চিমের অপরাংশে চলিয়া গিয়াছিলেন ও সন্ন্যাস লইয়াছিলেন। ১২।১৪ বৎসর পর তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং পরিচিত কবিরাজ সুপ্রসিদ্ধ ৺গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাতের বাড়িতে কয়েক দিবস ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺কালীপ্রসাদ দত্ত জনৈক বন্ধুর পরামর্শে পাল্কীতে বসাইয়া দরোয়ান ও লোকজন ঘিরিয়া তাঁহাকে পৈতৃক ভবন ৩নং গৌরমোহন মুখার্জির গলিতে আনয়ন করেন এবং একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। ৺দূর্গাপ্রসাদ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এইজন্য পূর্বাবাসে যাইতে অনিচ্ছুক, কিন্তু জোর করিয়া আনাতে তিনি সেই নিভৃত গৃহেতে ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং আত্মীয় স্বজনের জল পর্যন্ত গ্রহণ করিলেন না। এইরূপ তিন দিন ও তিন রাত্রি কঠোর অনশন ব্রত গ্রহণ করায় সকলেই মহা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। তখন পল্লীস্থ সকল প্রবীণ লোক বলিল, "যখন পরিত্যক্ত গৃহে জল পর্যন্ত গ্রহণ করিবে না তখন কঠোর সন্ন্যাসীকে এরূপ আবদ্ধ করিয়া রাখা অবিধেয়। শীঘ্র মুক্ত করিয়া দাও, এবং সন্ন্যাসী ইচ্ছামত যথাস্থানে চলিয়া যাউক; তাহা না হইলে সাধুহত্যা পাতক হইবে।" তখন তিনি ইচ্ছামত পদব্রজে চলিয়া গেলেন।

একবার কালীপ্রসাদ দত্ত আত্মীয় স্বজন লইয়া নৌকা যোগে ৺কাশীধাম দর্শন করিতে যান। সঙ্গে একটি অল্প বয়স্কা বিধবা জ্ঞাতি ভ্রাতৃবধু, আপন ভগিনী ও ৺দূর্গাপ্রসাদের পত্নী ৺শ্যামাসুন্দরী ও অপর মহিলা ও পুরুষ ছিলেন। তাঁহারা গরমীকালে যাইয়া ৺কাশীতে

পৌঁছিলেন এবং এক জায়গায় বাসা করিয়া রহিলেন। প্রচণ্ড রৌদ্রে অল্প বয়স্কা বিধবাটি ৺বিশ্বনাথ দর্শন করিবার মানসে যাইবার সময় হোচট খাইয়া পড়িয়া যান। পশ্চাত হইতে একটি সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিল, 'কেঁও মায়ী গির্ গিয়া! ৺দুর্গাপ্রসাদের ভগিনী পূর্বপরিচিত কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল, 'কে ও দুর্গাপ্রসাদ?' সন্ন্যাসীটি তখন গাল দিয়া বলিল, "এখানেও তোরা উৎপাত করতে এসেছিস্! দূর হোক্ এখনি ৺কাশী ছেড়ে পালাচ্ছি।" তদবধি তাঁহাকে আর ৺কাশীধামে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কথিত আছে যে পরিচিত লোকেরা সন্ন্যাসী ৺দুর্গাপ্রসাদকে মাঝে মাঝে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে দেখিয়াছিল; কিন্তু সে বহু বৎসরের পর। কথিত আছে ৺দুর্গাপ্রসাদ নাকি অতি সুপুরুষ ছিলেন, কৌতুকপ্রিয় ও সুকণ্ঠে গাহিতে পারিতেন।

স্বামীজীর পিতার প্রথম পুত্র সন্তান হইয়া মারা যায়। পরে চারিটি কন্যা হইয়াছিল কিন্তু পুত্র সন্তান হয় নাই, এইজন্য ৺কাশীবাসী জনৈক বৃদ্ধা আত্মীয়াকে স্বামীজীর মাতা অনুনয় করেন, যেন তিনি নিয়মিতরূপে ৺বীরেশ্বর মহাদেবকে অর্চনা করেন এবং তিনি কলিকাতায় আপন ভবনে সোমবার ও অন্যান্য ব্রত নিয়মাদি পালন করিতে লাগিলেন। পৌষ মাসের সংক্রান্তি যাহাকে মকর সংক্রান্তি বলে সেই দিবস ব্রহ্ম মুহূর্তে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী ভূমিষ্ট হন। ৺দুর্গাপ্রসাদের ভগিনী তখন জীবিতা ছিলেন, হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সেই চেহারা সেই সবই; দুর্গাপ্রসাদ কি আবার ফিরে এল?" জন্মদিবসে অনেক বাজনাওয়ালা ঢুলি আসিয়াছিল। স্বামীজীর পিতা ৺বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় ঢুলিদিগকে যথোচিত অর্থ দিতে লাগিলেন, অবশেষে নিজের পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত দান করিয়া মেয়েদের একখানা পাছাপেড়ে ছোট কাপড় পরিয়া রহিলেন।

স্বামীজী এইরূপে পরিবর্ধিত হইতে লাগিল। যখন হামাগুড়ি দিয়া উপরকার দালানে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং এটা ওটা ধরিতে যাইত একজন বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী একদিন আসিয়া স্থির হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া

শিশুটিকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল "বিশুবাবুর এ ছেলেটি দেব অংশের। সমস্ত অবয়ব ও ভাবভঙ্গি দেবতারই ন্যায়। ছেলেটি বাঁচিলে ও বড় হইলে দেবতার ন্যায় কাজ করিবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী মাথায় ও গায়ে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিল। স্বামীজী যখন খেলিতে খেলিতে রাগিয়া যাইত, স্বামীজীর মাতা শিশুটির মাথায় জল ঢালিয়া দিতেন ও 'শিব শিব' করিয়া উচ্চস্বরে শিবনাম করিতেন এবং সক্রোধে বলিতেন, "শিবের পূজো করে শিবের একটা পাগলা ভূত পাঠিয়ে দিয়েছে।"

নরেন্দ্রনাথের পাঠারম্ভ : ক্রমে পাঠারম্ভ হইল, তখন প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িতে হইত। নিকটে কোনও গুরু-মহাশয়ের পাঠশালা না থাকায় এবং থাকিলেও অনেক অসভ্য ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে হইবে এইজন্য স্বামীজীর পিতা গৌরমোহন মুখুজ্যের গলির বাটীতে এক উপযুক্ত গুরুমহাশয় আনাইয়া ঠাকুরদালানে একটি পাঠশালা স্থাপন করিলেন এবং পাড়ার সকল ভদ্রসন্তানরা আসিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। স্বামীজী অল্পদিনের মধ্যেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালার বিদ্যা শিখিয়া লইলেন। এবং গঙ্গার বন্দনা অর্থাৎ "বন্দেমাতা সুরধনী, পুরাণে মহিমা শুনি পতিত পাবনী পুরাতনী" এই স্তবটি অতি সুললিত ভাবে পাঠ করিতে শিখিলেন। মকর সংক্রান্তির দিন সকল বালক একত্রিত হইয়া গুরুমহাশয় সমভিব্যাহারে ও অপর সকল লোক লইয়া গঙ্গার তীরে যাইয়া 'বন্দেমাতা' গাহিয়া আসিয়াছিলেন। বালকটির বিশেষ প্রতিভা দেখিয়া গুরুমহাশয় বড়ই প্রসন্ন থাকিতেন। ৺বীরেশ্বর মহাদেবের পূজা করিয়া সন্তান হইয়াছিল বলিয়া স্বামীজীকে সকলে 'বীরেশ্বর' বলিয়া ডাকিত। সমবয়স্ক বালকেরা অপভ্রংশ করিয়া 'বিলে' বলিয়া ডাকিত। এখনও স্বামীজীর বালক বন্ধু যাঁহারা দুই একজন জীবিত আছেন তাঁহারা পূর্বনাম 'বিলে' বলিয়া কহিয়া থাকেন। কিন্তু অন্নপ্রাশনের সময় নামকরণ কালে নাম হইল 'নরেন্দ্র'।

গুরু মহাশয়ের পাঠশালা ছাড়িয়া নরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে অধ্যয়ন করিতে গেলেন। মাষ্টার, পণ্ডিত সকলেই খুব প্রসন্ন। সহপাঠীরা আনন্দপূর্ণ সঙ্গী পাইয়া সকলেই বড় খুসী। কিন্তু একজন নূতন শিক্ষক আসিয়া এক বিপত্তিজনক কার্য করিল। তরুণ বয়স্ক নরেন্দ্রের কান এমন জোরে টানিয়াছিল যে কান ছিঁড়িয়া যায় ও চাপকান ও ইজের রক্তে ভিজিয়া যায়। তখনকার দিনে স্কুলে ইজের চাপকান পরিয়া যাওয়াই প্রথা ছিল। তখন First Book পড়িবার শ্রেণী বা Ninth Class. নরেন্দ্রের পিতা হাইকোর্টের Attorney এবং খুড়া ৺তারকনাথ দত্ত হাইকোর্টের উকিল। উভয়ে স্থির করিলেন যে মাষ্টারকে উকিলের চিঠি দিয়া ফৌজদারী মামলা করা। একথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ণগোচর হওয়াতে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্কুল-এতে মার বন্ধ করিয়াছিলেন ও শিক্ষকটিকে ছাড়াইয়া দিলেন; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ পাছে শিক্ষকের কোন বিপদ হয় এই জন্য সকলকে নিষেধ করিয়া পরদিন যথা সময়ে পুস্তক লইয়া স্কুলে গেল।

সাত, আট বৎসর বয়সের সময় গরমি কাল, নরেন্দ্রনাথ স্কুল থেকে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইজের চাপকান ছাড়িয়া একখানি নূতন কোরা কাপড় পরিয়াছে এমন সময়ে এক সন্ন্যাসী আসিয়া, খোকাবাবু হামকো এক কাপড়া দেও বলিয়া অনুনয় করিতে লাগিল। বালক নরেন্দ্র ইদিক ওদিক চাহিয়া নিজের পরিধেয় নূতন বস্ত্রখানি সন্ন্যাসীকে খুলিয়া দিল। সন্ন্যাসী পাইয়া পরম আহ্লাদ করিয়া মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া লইল। তদ্দর্শনে বাড়ির সরকার সন্ন্যাসীটিকে বিশেষ ভৎ র্সনা করিতে লাগিল। বালক নরেন্দ্রনাথ মুখ কিঞ্চিৎ গম্ভীর করিয়া বাড়ির সরকারকে বলিল, —"ও গরীব, আমার কাছে চেয়েছে আমি দোবোইত।" কিন্তু এমন গম্ভীর স্বরে ও স্নেহপূর্ণ মুখে বলিল যে সরকার অপ্রতিভ হইল ও দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না এবং উপস্থিত সকলেই বলিল যে, "দাতা বিশুবাবুর উপযুক্ত ছেলে বটে যে নূতন কাপড় গরীবকে দিয়ে দেয়।"

যেমন বয়স বাড়িতে লাগিল· অর্থাৎ নয় দশ বৎসরের সময়

পড়াশুনার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের হাসি কৌতুক রহস্য ও খেলা ধুলো খুব বাড়তে লাগল। পায়রা, ময়ূর, ছাগল, বাঁদর এ-সব পোষার সখ খুব বেড়ে উঠতে লাগল। বালকের পিতা এই সব জিনিস আনাইয়া তুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন এবং ভৃত্যদিগকে তত্ত্বাবধান করিতে বিশেষ আজ্ঞা দিলেন। পশুপক্ষীর সখটা বোধ হয় তাঁহার মাতামহ কুল (রামতনু বসুরা) হইতেই আসিয়াছিল কারণ রামতনু বসুদের বংশে পক্ষীর সখটা অতীব প্রবল ছিল। এবং স্বামীজীর বংশেতে পায়রা পুষিবার সখও অদ্যাপি লক্ষিত হইতেছে। এমন কি বেলুড় মঠে যখন নরেন্দ্রনাথ বিখ্যাত বিবেকানন্দ স্বামী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন তখনও তিনি কতকগুলো পায়রা, ছাগল, ভেড়া, নানাবিধ হাস পুষিতেন এবং নিজে দাঁড়াইয়া পক্ষীদিগকে দানা দিতেন। একদিকে পায়রা খাচ্ছে, একদিকে হাসগুলো খাচ্ছে, একদিকে ছাগলগুলো খাচ্ছে আর স্বামীজী অনেক সময় এক কৌপীন লাগিয়ে লাঠির উপর দাড়ি রেখে স্থির হয়ে একমনে চারিদিক দেখিতেছেন। স্বামীজীর জনৈক ভক্ত এই দৃশ্যটি দেখিয়া এত বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন যে তিনি আনন্দ করিয়া বলিলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ ধেনুবংসদিগকে কি করে খাওয়াতেন, স্বামীজীকে দেখিয়া তাহা অনেক বুঝিতে পারিলাম। সমস্ত ভুলিয়াগিয়া স্বামীজী একেবারে রাখালের মত হইয়াছিলেন।"

তখন ক্রিকেট খেলা এত চলিত ছিল না। কপাটী, ব্যাটম্বল (Bat and Ball) আর মারবেল খেলা এই প্রচলিত। নরেন্দ্রনাথ কপাটী খেলা ও ব্যাটম্বলে সিদ্ধ হস্ত ছিল। একদিন কপাটী খেলতে খেলত নরেন্দ্রনাথ পড়িয়া যায়, অপর ছেলেরা চেপে ধরে, ইটের টুকরা বা এক-খানা খোয়া কপালে লাগিয়া ঢুকিয়া যায়, রক্ত দেখিয়া সকলে ছেড়ে দিল ও খোয়াটা বার করিয়া দিল কিন্তু ক্ষত স্থানের দাগ কপালে চিরকাল ছিল। এইজন্য পূজনীয় প্রেমানন্দ স্বামী ছোট ছেলে দেখিলে আহ্লাদ করে বলতেন, "দেখি দেখি তোর কপালে কাটা দাগ আছে কিনা? কাটা দাগ থাকলে বড় লোক হবে। জানিস্ স্বামীজীর কপালে কাটাদাগ ছিল।"

নরেন্দ্রনাথের বাল্যের হাবভাব :—সিমলা পাড়ায় যেখানে ট্রেনিং একাডেমি হইয়াছে—এটা আগে কাঁসারি পাড়া যোগেন পালের জিমনাষ্টিকের আখড়া ছিল। অনেকে গিয়ে ঐখানে কুস্তি, জিমনাষ্টিক শিখত। ট্রপিজ, প্যারালাল বার প্রভৃতি সব টাঙানো ছিল। নরেন্দ্রনাথ গিয়ে খুব কুস্তি জিমনাষ্টিক করতো। সকলেই গিয়ে লেঙ্গট মেরেছে, খেলবার জন্য তৈয়ার হইয়াছে, হয়ত বিলের যেতে কিছু দেরী হয়েছে, সকলেই আগোড়গুলা দোরের দিকে চেয়ে আছে, খেলতে যেন কারও মন নাই। আর যেমনি বিলে গেল, সকলেরই ভিতরে যেন একটা শক্তি এলো সব ছেলেরা উঠে হৈ রই করে খেলতে লাগলো। যেন জন্মেছে সর্দার। উপস্থিত না থাকলে খেলা জমতো না। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের বিশেষ ভাব লক্ষিত হইত, যখন সকলে খেলায় খুব উন্মত্ত হয়েছে বিলেও খুব খেলতে লেগে গেছে, হঠাৎ তার মনে একটা কি উদয় হত লেঙ্গট মেরে ধুলো গায়ে চুপ করে একজায়গায় স্থির হয়ে বসল, কথা-বার্তা নাই —নিস্তব্ধ বড় বড় চোখ দুটো ফ্যাল ফ্যাল করে চাইছে যেন দেহেতে আর মন নাই উদভ্রান্ত ও নিস্তব্ধ। অচিরাৎ খেলা বন্ধ হয়ে গেল। সকলেই চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে, "ভাই বিলে, কি হয়েছে ভাই," বলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল কিন্তু গাত্র স্পর্শ করিতে কিংবা অতি সন্নিকটে যাইতে কারও সাহস হইতেছে না। সকলেই ত্রস্ত, সকলেই বিমুগ্ধ। খেলুড়ে বিলে আর নাই স্বতন্ত্র লোক স্বতন্ত্র মুখভঙ্গি। তারপর খানিকটা পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আবার পূর্ব বিলে হইল এবং হাসি তামাসা করিয়া পুনরায় খেলা আরম্ভ করিল ও সকলকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। স্বভাবসিদ্ধ ধ্যানী এইটে প্রথম আভাস পাওয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করিলে কোন প্রত্যুত্তর দিত না।

বালককালে শিব গড়িতে ও শিব পূজা করিতে নরেন্দ্রর বড় ভাল লাগিত। ছাতুবাবুর মাঠে চড়কের সময় এক বড় শিব কিনে এনে সেইটেকে ফুল দিয়ে খুব পূজা করিত। কৌতুকও বটে আর ভিতরকার শ্রদ্ধা উভয়ে মিশ্রিত হইয়া এই শিব পূজা হইত। কিন্তু শিব পূজা কালে

পায়ের উপর পা দিয়া চক্ষু নিমিলিত করিয়া যখন বালকোচিত ধ্যান করিতে বসিত তখন স্বতন্ত্র হইয়া যাইত। ধ্যান কাকে বলে বালক কিছু জানিত না, কিন্তু ঐরূপে বসিলেই স্থির নিস্পন্দ হইয়া যাইত এবং মুখভঙ্গি স্বতন্ত্র ও গম্ভীর হইয়া উঠিত, যেন প্রত্যক্ষ কোন দৃশ্য চিত্রপটে দেখিতেছে। সেই মাটির শিবটি বহু বৎসর পর্যন্ত দোরের মাথার তাকের উপর ছিল। ওরকম মাটির শিব এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

যোগেন পালের আখড়া ছাড়িয়া যেখানে এখন সাধারণ সমাজ (সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ উপাসনালয়) হইয়াছে সেখানে ঘোষেদের পুকুর ভরাট হবার পর নবগোপাল মিত্রের (National Mitra) জিমনাষ্টিকের আখড়া হয়। ওখানেও কিছুদিন কসরৎ করিয়াছিল, ট্রপিজে যে দোল মারত তা ভীতিজনক। পিকক, সামারসল্ট খুব শিখিয়াছে। তারপর হোগলকুড়ের প্রসিদ্ধ অম্বুগুহর আখড়ায় অনেকদিন কুস্তি লড়িয়াছিল। সেই সময় ব্রহ্মানন্দ স্বামী (রাখাল মহারাজও) কুস্তি লড়িতেন।

স্বামীজী কৌতুক ব্যঙ্গ রহস্য বড় ভালবাসিতেন। তিনি বলিতেন "যে নূতন রকমের ব্যঙ্গ কৌতুক করিতে না জানে, তার মাথা খোলে না; সেটা ডালহেডেড্ জামড়ো মাথা।" কৌতুক ব্যঙ্গ স্বামীজীর স্বভাব সিদ্ধ ছিল। পাড়ার সম্পর্কে জনৈক ব্রাহ্মণ মহিলা পিসী হইতেন। তাঁহার অল্প বয়স্কা একটি কন্যা ছিল। একদিন গণককারকে সেই মেয়েটির হাত দেখাইলে, গণককার ছোট মেয়েটিকে 'যমের মাসী' বলিয়াছিলেন। স্বামীজী পাড়ার সব বাড়িতে ঘুরিতেন। সকল বাড়ির মেয়েরা ও ছেলেরা আপনার লোক বলে অতি যত্ন করিত। একদিন সেই পিসীর বাড়িতে গিয়ে তাদের তক্তায় বসে দোক্তা দিয়ে পান নিয়ে কসে রাখিয়া ছোট মেয়েটিকে বলিলেন 'ও যমের মাসী তুই একটি গান বল দিকি? মেয়েটি মুখ ভঙ্গি ও অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া বলিল, "আমি গান জানিনি মান জানিনি, খাই একপাত দোক্তা। হেসেল ঘরে পড়ে থাকি বড় একখানা তক্তা।" নরেন্দ্রনাথ তাই শুনিয়া ঠিক

সেইরকম মুখ ভঙ্গি ও বিকৃত স্বর করিয়া তাহাকে ভ্যাংচাইতে লাগিল আর মাঝে মাঝে ঐ ছড়াটি কাটাইতে লাগিল। বহু বৎসর পর যখন আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, স্বামীজী তখন সেই গরীব ব্রাহ্মণ পিসীর খোলার ঘর খুঁজিয়া খুঁজিয়া যাইলেন এবং সেই পুরাতন তক্তায় বসিয়া বলিলেন, "ও যমের মাসী দে দোক্তা দিয়ে পান দে।" কসে পান দিয়া সেই ছোট বেলাকার মতন ব্যঙ্গ সুরু করলেন, গান জানিনি, মান জানিনি করে। ব্রাহ্মণ পিসী পূর্ব স্মৃতি মনে হওয়ায় আনন্দে ও হর্ষে অনবরত কাঁদিতে লাগিলেন ও বলিলেন, 'বিলে তোর সব কথা মনে আছে? আমি গরীব, আমায় কেউ দেখে না। তুই এখন বড় লোক হয়েছিস, তুই যে আমার খোলার ঘরে এসে পান চেয়ে খাবি আর আগেকার মত স্নেহ ও সম্মান করে কথা কইবি, আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি।'

নরেন্দ্রনাথ জনৈক সহপাঠির বিবাহ উপলক্ষে একবার বরযাত্রী গেছেন। সভাস্থলে জনৈক বালক চপলতা বশতঃ সকলের সঙ্গে বড় জ্যাঠামো করিতেছিল। সকলেই নিতান্ত বিরক্ত। ছেলেটিকে প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না। নরেন্দ্র হঠাৎ ছেলেটিকে বরের সঙ্গে কি সম্পর্ক জিজ্ঞাসা করিল, ছেলেটি বরের জাস্ শ্বশুরের (জ্যেষ্ঠ শ্বশুর) ছেলে বলে পরিচয় দিলে। নরেন্দ্র অমনি "ওহে, জ্যাঠা শালা, ওহে জ্যাঠা শালা" করে সম্বোধন করিতে লাগিল। এই কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে ছেলেটিকে 'জ্যাঠা শালা, জ্যাঠা শালা', বলে মহারব করিল। ছেলেটি অপ্রতিভ হইয়া কোথায় যে অন্তর্ধান হইল যে দ্বিতীয়বার তাহার দর্শন কেহ পাইল না।

একজনদের বাড়িতে একটি মেয়ে ছিল, কৃশ, কৃষ্ণ বর্ণ, কপাল উঁচু ও চিবুক লম্বা, নাক ও চোখের কাছটা কিছু নিম্ন। নরেন্দ্রনাথ মেয়েটাকে স্নেহ করতো। মেয়েটির দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া বলিল,—"এ যে বাবা মুখটা যে বাংলা পাঁচ, ডোম পাড়ায় যাসনি, হারিয়ে যাবি।" তদবধি মেয়েটাকে 'বাংলা পাঁচ' বলে ডাকত। শেষ পর্যন্তও স্বামীজীর নূতন

প্রকার ব্যঙ্গ কৌতুক খুব ছিল। একজন কথক ছিল, ঠাকুরের কাছে যাইত। স্বামীজী তাহাকে 'Some what' বলে ডাকতেন। হাজরা মহাশয়কে 'Thousand-আ' বলিয়া ডাকতেন।

রায়পুরের কথা—১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ মা ভাই বোন সমেত তাঁহার পিতার কাছে সেণ্ট্রাল প্রভিন্সের রায়পুরে যান, যেখানে স্কুল কিছু ছিল না। নাগপুর থেকে গরুর গাড়ি করে যেতে প্রায় একমাস লাগিয়াছিল। হরিনাথ দে ভাষাতত্ত্ববিদ তখন ছয় মাসের ছেলে। হরিনাথ দে-র পিতা, রায়বাহাদুর ভুতনাথ দে সেখানে ওকালতি করিতেন। একসঙ্গেই যাওয়া ও এক বাড়িতেই থাকা হইত। রায়পুরে যাইয়া নরেন্দ্রনাথের তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Dr, U, D, Banerjee-র মেজো ভাই) সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় এবং দু'জনেই এক সঙ্গে থাকিত ও নানা বিষয়ে কথাবার্তা কহিত। দু'জনের বড়ই হৃদ্যতা হইয়াছিল। ইংরাজী ১৮৭৯ সালে নরেন্দ্রনাথ কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া সেকেণ্ড ক্লাস বাদ দিয়া বিদ্যাসাগরের স্কুলে ফাষ্ট ক্লাসে ভর্তি হইল। Entrance Examination তখন শীতকালে হইত। সেই বৎসর বিদ্যাসাগরের স্কুলে নরেন্দ্রনাথ ফাষ্ট ডিভিসানে পাশ হইল। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইল এবং অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখাইয়া আরোগ্য হয়। রায়পুর যাত্রাকালে একটা বিশেষ উল্লেখ্য ঘটনা হইয়াছিল বলিয়া এখানে সন্নিবেশিত করা যাইতেছে। গরুগাড়ি চারিখানি যাইতেছে বাঘ, ডাকাতের ভয়ের দরুন বন্দুকধারী সেপাই একজন লওয়া হইয়াছিল। জঙ্গল দিয়া যাইতে যাইতে গাড়িগুলি এক উপত্যকায় প্রবেশ করিল। উভয় পার্শ্বে পাহাড় ও জঙ্গল। হিংস্র জন্তুর উপনিবেশ স্থান। সেইখানটা কোনরূপে দ্রুতবেগে যাওয়া আবশ্যক। দিন থাকিতে থাকিতে কোনও সরাইতে পৌছাইতে হইবে। গাড়োয়ানরা ও ভুতনাথবাবু সব বাঘের কথা কহিতেছিল। সকলেই সংযত ও ভীত। হঠাৎ দেখিল নরেন্দ্রনাথ গাড়িতে নাই। সকলেই ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ইদিক ওদিক ছোটাছুটি করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ

পরে দেখে যে পাহাড়ের মধ্যে একটি গুম্ফার ভিতর নরেন্দ্রনাথ স্থির হইয়া বসিয়া আছে। বিভীষিকা বা চাঞ্চল্যের কোনও লেশ মাত্র নাই যেন স্ব-ভবনে সোৎফুল্ল বদনে স্থির হইয়া গুম্ফার ভিতর বসিয়া আছে। সকলেই জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, "স্থানটি বড় সুরম্য। গরুর গাড়িতে অনেকক্ষণ বসে আছি তাই এখানে একটু বসে আছি।" কথা যেন আর কহিতে পারিতেছে না ও চোখগুলো বিভোর। তাহার পর গাড়িতে আসিয়া বসিল কিন্তু অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ও স্থির ভাবে রহিল, যেন অন্যমনস্ক, অন্য কিছু ভাবিতেছিল। দুইখানি নৌকাযোগে (একত্র করিয়া) বানগঙ্গা পার হইয়া একটি মুদির দোকানে আশ্রয় লওয়া হইল। বর্ষাকালে গিরিনদী অতি প্রশস্ত, প্রখর। দুইখানি নৌকা সমবেত করিয়া তাহার উপর গাড়ি রাখিয়া পার হইতে হইত। একবার পার হইতে প্রায় সমস্ত দিন লাগিত। যাই হউক, সকাল বেলা যখন সকলে মুদির দোকানে বসিয়াছে, ভুতনাথ দে (M.A.B.L.) নানা বিষয়ে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদিগের কথাবার্তা উথাপন করিলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন স্কুলের থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়াছে, কিন্তু একজন প্রবীণ লোকের সহিত তর্ক যুক্তি করিয়া ও পুস্তক থেকে উদ্ধরণ করিয়া এমন বাক্যালাপ করিতে লাগিল যে ভুতনাথবাবু বিস্ময়ান্বিত হইয়া গেলেন। অতটুকু ছেলের এত বইপড়া! তিনি বারংবার এই কথা বলিতে লাগিলেন। রায়পুরে অবস্থান কালে নরেন্দ্রনাথ তাহার পিতার সহিত বাক্‌বিতণ্ডায় প্রায়ই প্রবৃত্ত হইত এবং উভয়েই জিজ্ঞাসু হইয়া ঘোরতর্ক করিত। কখনও একের বা অপরের জিত হইত। কিন্তু পুত্রের জয় হইলে, নরেন্দ্রনাথের মাতা বিশেষ হর্ষিত হইতেন, স্বামীর জয় ও পুত্রের পরাজয় হইলে তিনি একটু বিরক্ত ভাব প্রকাশ করিয়া কার্য উপলক্ষ করিয়া বাক্ বিতণ্ডা বন্ধ করিয়া দিতেন।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে নরেন্দ্রনাথ রায়পুর থেকে আসিয়া বিদ্যাসাগরের স্কুলে Entrance class-এ ভর্তি হইল এবং সেই বৎসরই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তখন, স্কুল বাটি সুকীয়া ষ্ট্রীটে ছিল।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হইল কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়াতে একবৎসর পর প্রেসিডেন্সি হইতে জেনারেল এসেমব্লিস্ ইনষ্টিটিউসান বা হেদোর কলেজে পরিবর্তন করিল। তখন W. H. Hesty কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের বহুমুখী মেধা ও শক্তি:—সঙ্গীত বিদ্যা শিখিতে নরেন্দ্রনাথের এই সময় প্রবল ইচ্ছা হইল। কুস্তীতেও সেইরূপ প্রবল ইচ্ছা, তাসখেলা, দাবাবোড়ে ও চুরবোর খেলায়ও খুব দক্ষ ছিল। অধ্যয়নে প্রগাঢ় অনুরাগ এবং ধর্মভাবও বেশ পরিবর্ধিত হইতে লাগিল। অম্বুগুহের আখড়ায় কুস্তিলড়া আবার সময়ান্তরে নানাপ্রকার ওস্তাদের কাছে ধ্রুপদ শেখা এইটে তাহার বিশেষ কার্য হইয়া উঠিল। তিনি সুবিখ্যাত বেণী ওস্তাদের কাছে ধ্রুপদ শিখিতে লাগিলেন এবং অপর কয়েক জনের কাছে শিখিয়া ছিলেন। মুরারী গুপ্তর কাছে অল্পদিন পাখোয়াজ অভ্যাস করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের মেধা ও শক্তি বহুমুখী। শুধু সঙ্গীত ও কুস্তি শিখিয়া তাঁহার পর্যাপ্ত হইত না। এই সময় হেদোর পুকুরে রোইং ক্লাব হইল। নরেন্দ্রনাথ রোইং ক্লাবে একজন বিশেষ গণ্যমান্য সভ্য হইল। হেদোতে নৌকা বওয়া যখন পর্যাপ্ত হইল না, গঙ্গাতে নৌকা লইয়া বাছ খেলিতে লাগিল আর মাঝে মাঝে বাছ খেলার গান গাইত।

কেশব বাবুর সেই সময় চারিদিকে খুব যশ ঘোষণা হইতেছে। নরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে কেশববাবুর সমাজে যাইতেন কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও অপর কয়েকজন কেশববাবুর সমাজ হইতে পৃথক হইয়া সাধারণ সমাজ স্থাপন করিলে, নরেন্দ্রনাথ সাধারণ সমাজে যোগদান করিলেন। সুকণ্ঠ থাকায় ও সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হওয়ায় শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয় বাড়ির সদরদোরে এসে অপেক্ষা করিতেন। নরেন্দ্রনাথ সাধারণ সমাজে উপাসনা কালে অনেক সময় সঙ্গীত গাহিতেন। বাংলাদেশে এই সময় একটা মহাবিপ্লব যাইতেছিল। প্রাচীন বাংলাটা ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতেছিল। এবং নতুন বাংলা

অদৃশ্যভাবে শির উত্তোলন করিতেছিল—কেশববাবু ও শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্রাহ্ম সমাজে নেতৃত্ব, খৃষ্টানদিগের ও বিশেষতঃ স্যালভেসান আরমির খৃষ্টীয় আন্দোলন, রাজনৈতিক আলোচনা, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস, কলিকতায় থিয়েটার প্রতিষ্ঠা এবং নবগোপাল মিত্র-র হিন্দু মেলা, জিম্‌নাষ্টিক ও কুস্তির আখড়া সবই যেন একসঙ্গে জেগে উঠল, সব ভাবগুলো নিজের প্রাধান্যের জন্য চেষ্টা করিল। যুবকেরা কোন্ ভাবটি আশ্রয় করিবে তাহা কেহ স্থির করিতে পারিতেছিল না। মহা এক তুলকালামের অবস্থা। এখনও জনকতক কলিকাতায় জীবিত আছেন, তাঁহারা এই বিষয় বিশেষ জানেন। মানসিক জগতে এরকম বিপ্লব বাংলাদেশে আর কখনও হয় নাই। এমন কি জুতা জামা চুল কাটা পর্যন্ত নূতন রকম হতে লাগল। একটা মহাপ্রলয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বাংলার যুবকেরা এই সময় হয় খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম হইবে না হয় একেবারে নাস্তিক কদাচারী হইবে, কেহই এবিষয়ে কিছু মিমাংসা করিতে পারিতেছিল না।

নরেন্দ্রনাথের ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীটের বাটীতে পড়াশুনা ও নিজের ইচ্ছামত থাকিবার তত সুবিধা হইত না, বাটিতে অনেক লোক সব সময় গল্প গুজব করে এইজন্য তাঁহার পিতা সর্বদাই তাঁহার জন্য নিকটে আর একখানি বাড়ি ভাড়া করিয়া দিতেন। তখন বাড়ি ভাড়া সামান্য ছিল, সাত আট টাকা মাত্র আর একটি চাকর তাঁহার সেবার জন্য থাকিত। নরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বন্ধু বান্ধব যাঁহারা দেখা করিতে আসিত বা সঙ্গীত চর্চা ও অধ্যয়ন প্রভৃতি নিজ আবাস বাটীতে হইত। নরেন্দ্রনাথের শক্তি সর্বতোমুখী। এই সময় তাঁহার রন্ধন কার্যের খেয়াল উঠিল। সিমলা ষ্ট্রীটে গোঁসাইদের বাড়িতে একখানি বাড়ি তাহার জন্য ভাড়া করা হয়েছিল। সেই সময় নরেন্দ্রনাথের এক Greedy club বা পেটুক দল গঠন হইল। বিশেষ কার্য হইল নানা প্রকার রন্ধন করা। পুরানো পুস্তক বিক্রেতা (Hawker) নানা রকম পুস্তক আনিত। নরেন্দ্রনাথ তাহাদের কাছ থেকে ফ্রেঞ্চ কুকিং নামক

অনেক বই কিনিতে সুরু করিলেন এবং সেই সকল বই পড়িয়া নানা প্রকার রন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। নরেন্দ্রনাথের পিতা রন্ধন কার্যে স্বয়ং বিশেষ নিপুণ ছিলেন। কালীয়া, পোলোয়া প্রভৃতি বহুবিধ রন্ধন করিতে পারিতেন। নরেন্দ্রনাথের সেই পৈতৃক ভাবটা এখন জাগিয়া উঠিল। ব্রহ্মানন্দ স্বামী (রাখল মহারাজ) তিনি তখন সিমলায় আসিয়া স্কুলে পড়াশুনা করিতেন এবং আত্মীয়তা থাকায় একসঙ্গে শয়ন উপবেশন ও অধ্যয়ন করিতেন। রাখাল মহারাজ সেই Greedy club এর অন্যতম সভ্য। রন্ধনের মধ্যে বিশেষ একটা জিনিস উল্লেখযোগ্য। এটি বোধ হচ্ছে Greedy club-এর নব আবিষ্কৃত। হাসের ডিম খুব ফেটিয়ে চালে মাখিয়ে কড়াইসুটি ও আলু দিয়া ভুনি খিচুড়ী। সে অতি উপাদেয় হইয়াছিল। অন্য পোলোয়ার চেয়ে এই রকম রন্ধন অনেক শ্রেষ্ঠতম। বর্তমান লেখকের ইহা বিশেষ স্মরণ আছে।

এই সময়েতে কেশববাবু নববৃন্দাবন থিয়েটার আরম্ভ করিয়াছিলেন। বারকতক এই অভিনয় হইয়াছিল। বাংলাদেশে ইহার কিছুদিন পূর্বেই বেঙ্গল থিয়েটার ও ন্যাসানাল থিয়েটার স্থাপিত হয়। 'মোহন্তর একি কাজ' এই প্রহসনটি খুব চলিত। নরেন্দ্রনাথ রায়পুরে যাইবার পূর্বেই অর্থাৎ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে, বাড়িতে এক থিয়েটার দল স্থাপন করেন। নিজে চিত্র করিতে কিছু জানিতেন। এইজন্য সিন্‌গুলো অনেকটা নিজের হাতে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। বাটীর প্রশস্ত ঠাকুর দালানে 'মহন্তর এই কি কাজ' অভিনয় হইত। নরেন্দ্রনাথ মহন্তর বা এলোকেশীর পালা না লইয়া গায়ক বৃন্দের ভিতর থাকিত। এইরূপ বাটীতে দুই তিনবার হবার পর তাহার খুল্লতাত তারকনাথ দত্ত বন্ধ করিয়াদিলেন।

এই সময় একটি কানা ভিখারী এক বড় হাঁড়ী বাজাইয়া গান করিত, বাঁয়া তবলার উভয়ের কাজই সে হাঁড়ী উলটাইয়া তাহাতে তাল রাখিত। তার গান ছিল,—"গি—ই—ন্নী তারকেশ্বরে যাওয়া হবে না। ক—অং—ত্তা করেছে মানা।।"

নরেন্দ্রনাথ কানা ভিখারীর কাছে এই গান শিখিয়া তাঁহার

ঠাকুরমাকে অর্থাৎ বাপের খুড়ী অর্থাৎ যিনি বাটীর গিন্নী ছিলেন তাহার স্মুমুখে যেন বাঁ উরুতের উপর হাড়ীটি রয়েছে এবং দুই হাতেতে হাড়ীটি বাজাচ্ছে এইরূপ ভঙ্গি করে ঐ গানটি গাইত আর সকলে হাসিত। তখন কলিকাতায় অনেকটা গ্রাম্য ভাব, পাড়া প্রতিবেশীকে অনেকটা সম্পর্ক করিয়া ডাকিতে হইত এবং সকলের বাটীতে গতাগতি ছিল। কাহার বাড়ি আটকৌড়ে হইলে নরেন্দ্রনাথ বা বিলে কুলো বাজাবার পাণ্ডা। আর যতক্ষণ না আট কৌড়ে বাটকৌড়ে স্বুরু হয় ততক্ষণ 'আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যু' ও ছাগলের গল্প—হড়াড় হিলি হা য়' এই ছাগলের উপাখ্যানটি বলিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিত। এই হাত নাড়ে তো এই মাথা নাড়ে আর মাঝে মাঝে হাসি তামাসা করিতেছে। ছোট ছেলেরা কেন বয়স্থা স্ত্রীলোকরাও দাঁড়াইয়া মোহিত হইয়া শুনিত।

পায়রা উড়িয়া গেলে বা কোন অপ্রীতিকর ভাব মনে উদয় হইলে নরেন্দ্রনাথ চোখ মিট মিট করিয়া নাসা কুঞ্চিত করিয়া ঊর্ধ্বদিকে মুখ টানিয়া ভঙ্গি করিত ইহা তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। এমন কি শেষ-কাল পর্যন্ত নাসা কুঞ্চিত করার অভ্যাস তাহার ছিল এবং এই অভ্যাস তাহার বংশেতে পর্যায়ক্রমে চলিতেছে। এই স্থলে এই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে নরেন্দ্রনাথের থুথু ফেলা এক বিষম বদ রোগ ছিল। তাহার প্রপিতামহের কাছ থেকে বংশ পরমপরায় চলিয়া আসিতেছিল এবং এই দোষটা তাহাদের সকলেরই আছে। নরেন্দ্রনাথের বয়স যখন দশ এগার বৎসর তখন কলিকাতায় মসলিপট্রম নস্য লওয়ার প্রথা ছিল। নরেন্দ্রনাথ এই সময় খুব নস্য লইতে আরম্ভ করিল, নাকে নস্য দিয়া উডপেনসিল দিয়া ঠেলিয়া দিত, যেখানে সেখানে সিকনি গয়ের ফেলিত, এমন কি ঘুমন্ত অবস্থায় মশারীর গায়ে শিকনি থুতু ফেলিত।

যাই হউক পূর্ব থেকেই অভিনয়ের ব্যাপারে নরেন্দ্রনাথের কিছু জানাছিল। এই জন্য কেশব বাবুর 'নববৃন্দাবনে' তিনি পাহাড়ি বাবার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ চুপ করে বসে ধ্যান করা ইহাতে তাহার বেশ নাম হইয়াছিল।

যদিও চাপল্যভাব তাহার বিশেষ পরিলক্ষিত হইত কিন্তু ধর্মভাবও খুব সেই সময় জাগিয়া উঠিয়াছিল। একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। মহর্ষি যুবা নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া, বিশেষ প্রতিভাশালী ও ভবিষ্যতে বিশেষ প্রধান্য লাভ করিবে, আগেই বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলন—১৮৮০ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথের আত্মীয় রামচন্দ্র দত্তের বাটীতে বিসূচিকা হইয়া তিনটি ছোটমেয়ে মারা যায়। রামচন্দ্র অধীর হইয়া পড়িলেন, শুনিলেন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে জনৈক সাধু আছেন, তাঁহার কাছে যাইলে শান্তি পাইবেন। রামচন্দ্র মাঝে মাঝে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের তখন ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি বিশেষ আস্থা, বিগ্রহ পূজা মানিত না এবং সাধু ও অপর সম্প্রদায় ভ্রান্ত, অনেকটা এইরূপ ধারণা হইয়াছিল কিন্তু প্রাণটা সরল, কোনও উচ্চ জিনিস অনুসন্ধান করিতেছিল। রামচন্দ্র একদিন নরেন্দ্রনাথকে বলিল, 'ছাখ্ দক্ষিণেশ্বরে একটি সাধু আছে, সে বড় সুন্দর, কথা বার্তা তার বড় মিষ্টি, চ-না দেখে আসবি।' নরেন্দ্রনাথ আপত্তি তুলিল, "সে যে ঠাকুর পূজা করে ভাল হবে কেমন করে।" রামচন্দ্র নরেন্দ্রনাথকে রসগোল্লা খাওয়াবে এই লোভ দেখাইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতে রাজি করিল। সম্ভবত ১৮৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। পূজ্যপাদ সারদানন্দ স্বামী এই প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন যে,—"নরেন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকিলে সামান্য একটু কথাবার্তার পর শ্রীরামকৃষ্ণ যেন বহু পূর্ব পরিচিত মনে করিয়া নরেন্দ্রনাথকে স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। অতি মিনতি করুণ স্বরে অত্যন্ত বিলুপ্ত দর্শন ব্যক্তিকে পুনঃ প্রাপ্তি হইলে যেমন মনটা আকুলি বিকুলি করিয়া থাকে, শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া সেই ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন ও স্তব স্তুতি আরম্ভ করিলেন। নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন সতের আঠার বৎসর। নূতন ঢং দেখিয়া ত্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া ধীরে ধীরে নরেন্দ্রনাথের দিকে

অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন নরেন্দ্রনাথের ধারণা হইল, এ লোকটা একটা উম্মাদ পাগল, একটু সামলে থাকাই ভাল শ্রীরামকৃষ্ণ যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নরেন্দ্রনাথ দোরের দিকে পথ ঠিক করিয়া পশ্চাতে সরিতে লাগিল,—'কি জানি পাগল যদি কামড়ে কুমড়ে দেয়, বড় ফ্যাসাদে পড়তে হবে।' এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ একেবারে অচেতন হইতে লাগিল সংজ্ঞা একেবারে তিরোহিত হইতে লাগিল এবং শরীর নিস্পন্দ হইতে লাগিল। এমন সময় নরেন্দ্রনাথ অস্পষ্ট স্বরে বলিতে লাগিল, 'কোথায় নে যাও, কি করো? কি করো? আমার যে বাপ মা আছে। আমি উকিল হবো, গাড়ি ঘোড়া চড়বো।' তারপরই আর কোন শক্তি রহিল না। পরে প্রকৃতস্থ হইয়া বাড়ি ফিরিল।"

নরেন্দ্রনাথ থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ার ক্লাসে পড়িবার সময় সুবিধা পাইলে দক্ষিণেশ্বর যাইতেন এবং বাড়িতে একা হইলেই ধ্যান করিতেন। কথিত আছে যে তিন নম্বর বাড়ির পুরাতন পড়বার ঘরে তিনি একলা থকিয়া ধ্যান করিতেছেন এমন সময় এক জ্যোতির্ময় পুরুষ দেখিয়াছিলেন। জোতির্ময় পুরুষটি ক্রমে দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়া যায়। বর্তমান লেখকের ইহা শ্রুত কথা, পূজ্যপাদ সারদানন্দ স্বামী এ বিষয়ের তথ্য কহিতে পারেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ B. A. পাশ করিল্। পিতা এটর্নি, নিজের অফিস। ছোট কাকা হাইকোর্টের বড় উকিল। পিতার খুব আনন্দ হইল যে নিজের অফিসে আর্টিক্যাল ক্লার্ক হয়ে এটর্নি হইবে এবং বাঁধাঘর (ক্লায়েন্ট) আছে সে সব পাইবে। নরেন্দ্রনাথ, বাপও কাকার সঙ্গে হাইকোর্টে বেরুতে লাগল। খুবই হর্ষ ও উল্লাস।

পিতৃ বিয়োগ ও সংসারের কষ্ট :—১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী নরেন্দ্রনাথের পিতা হঠাৎ মারা যান। নরেন্দ্রনাথ সে রাত্রিতে বরাহনগরে সাতকড়ি মৈত্রের বাড়িতে ছিলেন ও প্রসিদ্ধ হাইকোর্টের উকিল দাশরথি সান্যাল তিনিও সেইখানে ছিলেন, কারণ ইঁহারা সকলে

সহপাঠি। নরেন্দ্রনাথ বরাহনগর থেকে খবর পাইয়া একেবারে নিমতলার ঘাটে আসিল। তখন মৃতদেহ একেবারে নিমতলাঘাটে আনীত হইয়াছে। পিতা হঠাৎ মারা যাওয়াতে কিছু সঞ্চয় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। নরেন্দ্রনাথ একেবারে গরীব হইয়া পড়িল, নিঃসম্বল ও নিঃসহায়। এটর্নি হওয়ার চেষ্টা বন্ধ হইয়া গেল। চাকুরী বাকুরী নাই। কখন কখন ছেলে পড়াইয়া যৎকিঞ্চিত পাইত, তাও সর্বদা নয়। অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া কিছুদিন চলিল, কষ্ট আরও ঘনীভূত হইল। শোকে অনাহারে রাত্রিতে নিদ্রা হইত না; শিরঃপীড়া হইল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গরমিকালে শ্রীরামকৃষ্ণ, রামচন্দ্র দত্তের বাটিতে আসেন অনেক লোক দেখা করিতে গিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়া গেলেন না। যে ডাকিতে আসে তাহাকে ধমকে তাড়াইয়া দেন, বলেন 'আমার মাথা দব্ দব্ করছে আমি যেতে পারবো না।' অবশেষে পূজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার নিজে আসিলেন এবং জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। দেবেনবাবুর সহিত বহুকালের পরিচয় থাকাতে তাঁহার কথা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন তাহাতে নরেন্দ্রনাথের শিরঃপীড়া উপশম হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন,—'ও, নরেন তুমি এতক্ষণ আসনি কেন? আমরা যে নর, তুমি যে নরের ইন্দ্র।' বাড়িতে অনেক লোক থাকাতে ঘরটি বড় গরম হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ রাস্তায় বেঞ্চির উপর বসিয়া সকলের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে লাগিল।

এইরূপ যখন খুব কষ্ট যাইতেছিল নরেন্দ্রনাথ চেষ্টা করিলেন যে বই লিখিয়া কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জন করিয়া সংসার চালাইবেন। হারবার্ট স্পেনসারের 'এডুকেশন' বইখানি 'শিক্ষা' নাম দিয়া অনুবাদ করেন ও সঙ্গীতের বিষয় একখানি পুস্তকের উপক্রমণিকাও কিয়দংশ লিখিয়া দিয়াছিলেন। এই দুইখানি পুস্তক বৈষ্ণব দাস বসাক ছাপায়। আর গীত-গোবিন্দ বঙ্গানুবাদ করিয়া ছাপান হয়। সার্কাসওয়ালা প্রঃ বোস অর্থাৎ মতি বোস তখন ছাপাখানার কারখানা করেছিলেন। মতিলাল

বোস সেই বইখানি ছাপায়। এখন সে পুস্তক ক'খানি অপ্রাপ্য হইয়া গিয়াছে আর কাহারও কাছে দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি কেহ পুস্তক ক'খানি খুঁজিয়া দিতে পারেন, সকলেই তাঁহার কাছে উপকৃত হইবেন।

কিন্তু বই লিখিয়া কলিকাতার সংসারযাত্রা নির্বাহ করা অসম্ভব। এর উপর আবার বাড়ির অংশ লইয়া দেইজীদের (দায়াদ) সহিত ঘোর মোকদ্দমা। উকিল, ব্যারিষ্টারের টাকা যোগাড় করবে, না পেটে খাবে। মোকদ্দমা লাগিবার কিছুদিন পূর্বে অর্থাৎ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষ বা ১৮৮৫-র প্রথমেতে নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যান। আপনার সংসারের সকল দুঃখ কষ্টের কথা শ্রীরামকৃষ্ণকে জানান। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, “তুই যা, মা ভবতারিণীর কাছে, গিয়ে যা চাইবি, তাই পাবি।” নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকোষ্ঠ হইতে ৺কালীর মন্দিরে যাইতে স্বুরু করিলেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া টাকা, সংসারের কথা সব ভুলিয়া গেছেন এবং অন্যমনস্ক হইয়া ৺কালী মন্দিরে গিয়া আদ্যাশক্তির কাছে বিবেক ও বৈরাগ্য যাচ্না করিলেন। এইরূপ বিভোর অবস্থায় তিনি পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকোষ্ঠের দিকে চলিলেন। উঠানটা প্রায় পার হইয়া তাহার মনে পুনরায় উঠিল, ‘টাকার কথা যে বলতে গিছলুম, টাকা মুখ দিয়ে না বেরিয়ে, বিবেক বৈরাগ্য বেরুল। এ শুধু রামকৃষ্ণ করিয়েছে।’ এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের উপর অভিমান, অভিযোগ, রাগ করিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্য বদনে কহিলেন,—‘তা আমি কি করবো? তোর মুখ দিয়ে টাকার কথা বেরুল না, বিবেক বৈরাগ্য চাইলি কেন?” নরেন্দ্রনাথ উত্তরে কহিল “আমার মুখ দিয়ে বেরুল না, আমি সমস্ত ভুলে গেলুম, এতো তুমি একটা ভেতর থেকে কি দুষ্টুমি করলে।” শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন।

কাশীপুরের বাগান

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ—১৮৮৫খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম অসুখ হইল। শ্যামপুকুরে একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে আনা হয়। এই সময়েই নরেন্দ্রনাথ (স্বামীবিবেকানন্দ) একেবারে গৃহত্যাগ করিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পীড়া উপশম না হওয়ায় কাশীপুরের মতিঝিলের সম্মুখের বাগানটি ভাড়া করিয়া তাঁহাকে রাখা হইল ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইল। এই সময় হইতে নরেন্দ্রনাথের প্রকৃত সাধু জীবন আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান করা এবং কঠোর তপস্যা করা এই স্থান হইতে সুরু হইল। পূর্বে যদিও জপ-ধ্যান ও সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রায় সাধারণ লোকেরই সমান; অল্প মাত্র বিশেষত্ব ছিল। এইখানে তিনি, ব্রহ্মানন্দ (রাখাল মহারাজ), সারদানন্দ (শরৎ মহারাজ), রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ), অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর মহারাজ), অভেদানন্দ (কালী মহারাজ), গোপাল ঘোষ (হুট্‌কো গোপাল), অদ্বৈতানন্দ (বুড়ো গোপাল), ত্রিগুণাতীতানন্দ (সারদা মহারাজ), যোগানন্দ (যোগেন মহারাজ) ও শিবানন্দ (তারক মহারাজ) প্রভৃতিকে লইয়া একটি ভ্রাতৃসংঘ সংগঠন করিয়া রীতিমত তপস্যা সুরু করিলেন।

নরেন্দ্রনাথের মহাবীরের ভাব। হুট্‌কো গোপাল কথিত—নরেন্দ্রনাথ ধুনি জ্বালিয়া কয়েক দিবস অনবরত জপধ্যান করিতেছিলেন, গায়ে ভস্মমাখা, হাতে চিম্‌টা। একদিন রাত্রিতে ৯।১০ টার সময় হঠাৎ তাঁহার মহাবীরের ভাব উদয় হইল। ভীষণ গর্জন করিয়া "জয়রাম' জয়রাম' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। অপর সকলে তাঁহার বিশেষত্ব কিছু বুঝিতে পারিল না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আপন দ্বিতল কক্ষেতে তাহা বিশেষ অনুভব করিতে পারিলেন এবং 'কি হইল', 'কি হইল', 'নরেনের আজ কি হইল' বলিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন।

কেহই তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিল না। নরেন্দ্রনাথ ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। অবশেষে কৌপীন পরিয়া হাতে চিম্‌টা লইয়া দক্ষিণেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং মাঝে মাঝে গগন-বিদারক ভীষণ গর্জন করিয়া 'জয়রাম' 'জয়রাম' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ বাগান হইতে বাহির হইয়া যাওয়াতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আরও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং 'আজ কি হয়', 'আজ কি হয়' বলিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিষ্ঠ হুটকো গোপাল নরেন্দ্রনাথের একান্ত অনুগত থাকায় প্রাণ উপেক্ষা করিয়া চিম্‌টাধারী উন্মত্তপ্রায় নরেন্দ্রনাথের পিছু পিছু চলিতে লাগিল। রাত্রি অন্ধকার, তখন বরাহনগর প্রভৃতি স্থানে আলোর বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল না। কেবল রব অনুমান করিয়া গোপাল পিছু পিছু চলিল। কাশীপুর পার হইল, বরাহনগর পার হইল, আলমবাজার পার হইল, নিকটে অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না; অবশেষে দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী হইলে গোপাল পিছন হইতে জাপটাইয়া ধরিল ও চিম্‌টাটা কাড়িয়া লইল। নরেন্দ্রনাথ বেহুঁস হইয়া গোপালের কাঁধে মাথা দিয়া অজ্ঞান হইয়া রহিলেন। পরে গোপাল ধীরে ধীরে মাথায় জল সিঞ্চন করিতে করিতে জ্ঞান সঞ্চার হইলে নরেন্দ্রনাথকে ফিরাইয়া লইয়া আসিল।

পূজ্যপাদ গিরিশচন্দ্র ঘোষ কথিত—একদিন সন্ধ্যার পর নরেন্দ্র ও আমি একটা আমগাছের তলাতে কাশীপুরের বাগানে ধ্যান করিতেছি। ধ্যানটা জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় আমবাগানে কতকগুলি মশা বড় অন্তরায় হইল। আমি দু'চার বার হাত চাপড়াইয়া তাড়াইতে লাগিলাম। কিন্তু মশার উৎপাত কমিল না। প্রাণ বড় জিনিস, আমার ধ্যান বন্ধ হইল, আমি চোখ খুলিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলাম। নরেন্দ্রনাথ সম্মুখে পদ্মাসনে বসিয়া আছে, তাহাকে কেমন করিয়া ছাড়িয়া যাই, মৃদুভাবে তাহাকে দু'চার বার ডাকিলাম। কোনও সাড়া পাইলাম না। অবশেষে গাত্র স্পর্শ করিয়া কিঞ্চিৎ দোলাইলাম। কোনও সাড়া শব্দ নাই। গায়ে কম্বলের মত মশা

বসিয়া আছে। আমি একটা মশা সহ্য করিতে পারি নাই আর নরেন্দ্রের গায়ে অসংখ্য মশা বসিয়া আছে। সাড়া শব্দ নাই। আমার তখন ভয় হইল। এ আবার কি ব্যাপার! আমি ধরিয়া উল্টাইয়া ফেলিয়া দিলাম। নরেন্দ্রনাথ পদ্মাসনে যেমন আসীন ছিলেন তেমনই উল্টাইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞা নাই। অনেক কষ্টে নরেন্দ্রনাথের সংজ্ঞা আনাইলাম। তারপর নরেন্দ্রনাথ উঠিয়া হাস্য করিয়া আমাকে বলিলেন, —দূর শালা 'জি সি,' অত ভয় খাস কেন?'

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ কথিত—কাশীপুর বাগানের নীচেকার হলঘরটাতে নরেন্দ্রনাথ একখানা কাপড় মুড়ি দিয়া বৈকালবেলা শুইয়া ধ্যান করিতেছিলেন। গরমকাল, সকলে এদিক ওদিক ব্যস্ত, কেহ বা বেড়াইতে যাইতেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের ধ্যান অবস্থায় ক্রমে ক্রমে পা স্থির ও নিস্পন্দ হইয়া যাইতে লাগিল। শরীরের উত্তাপ একেবারে তিরোহিত হইতে লাগিল। অবশেষে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত শীতল হইয়া আসিল। নিরঞ্জন মহারাজ কোনও কার্যবশতঃ নরেন্দ্রনাথকে ডাকিতে গিয়া স্পর্শ করিলেন। গায়ে হাত লাগাইয়া দেখিলেন, শরীর নিস্পন্দ, বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ যেন মরিয়া গিয়াছে, কোনও সংজ্ঞা নাই। নিরঞ্জন মহারাজের বড় ভয় হইল। এদিক ওদিক ডাকাডাকি করিয়া শেষে ডাক্তার লইয়া আসিয়া সংজ্ঞার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলে উদ্বিগ্ন ও শোকার্ত—নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ দেহত্যাগ করিলেন। নিরঞ্জন মহারাজের মনে উদয় হইল, সকলে ত ছুটাছুটি করিতেছে কিন্তু পরমহংস মশাইকে তো কিছু বলা হয় নাই, তাঁহাকে একবার জানান অত্যাবশ্যক। দ্বিতল গৃহে ছুটিয়া গিয়া পরমহংসদেবকে বলিলেন, "মহাশয়, নরেন্দ্রনাথ মরিয়া গিয়াছে। তার মৃত শরীর ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।" কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। নিরঞ্জন মহারাজ তাহাতে বিরক্ত হইলেন, নরেন্দ্র মরিয়া গেল, আর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন! নীচের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তখন নরেন্দ্রের ব্রহ্মরন্ধ্রে কিঞ্চিৎ তাপ

সঞ্চার হইয়াছে ও ক্রমে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত তাপ আসিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ সংজ্ঞা পাইয়া সম্মুখে রামচন্দ্র দত্তকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "রামদাদা, আমার শরীর কোথায়, আমার শরীর কোথায়?" ক্রমে শরীরের অন্যান্য অংশে উত্তাপ আসিল ও নরেন্দ্রনাথ পূর্বের ন্যায় হইলেন। সকলে আশ্বস্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন এবং সকলেই বিকালের ঘটনা উল্লেখ করিলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "কিরে নির্বিকল্প সমাধি দেখতে চাস্? এখন বুঝলি? কাজ করতে হবে; এখন চাবি বন্ধ রইল, পরে চাবি খোলা হবে।"

নরেন্দ্রনাথের দয়ার ভাব। স্বামী অখণ্ডানন্দ কথিত—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত জনৈকা স্ত্রীলোক দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহিত দেখা করিতে আসিতেন। স্ত্রীলোকটি অল্পবয়স্কা ও বিধবা। মাথাটি একটু গরম হইয়াছিল এবং মধুর ভাবের সাধক। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এইজন্য তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ ভৎ´সনা করিয়াছিলেন। যাহাই হউক তিনি কাশীপুরের বাগানে একেবারে আসিয়া উপস্থিত, নিরঞ্জন মহারাজ তাঁহাকে উপরকার প্রকোষ্ঠে যাইতে দিলেন না। স্ত্রীলোকটি তখন একটু উন্মাদ হইয়াছেন। নীচেকার হলঘরে যেখানে যুবকেরা বসিয়া আছে স্ত্রীলোকটি সেখানে গেলেন। চুল এলো, হঠাৎ গিয়া তাহাদের মাঝখানে বসিলেন এবং মধুর ভাবব্যঞ্জক সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। হঠাৎ বক্ষস্থলের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া নানাপ্রকার ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের ভিতর। সকলেই মহাবিরক্ত হইয়া উঠিলেন। সম্মুখে গঙ্গাধর মহারাজ বসিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিলেন, "ওরে ও গঙ্গা, বুকের কাপড়টা জড়াইয়া দিস্ত।" গঙ্গাধর মহারাজ উঠিয়া বুকের কাপড়টা জড়াইয়া দিলেন। অবশেষে নকলপটু নিরঞ্জন মহারাজ মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া, হাতে লাঠি লইয়া, কোমরে চাপরাস বাঁধিয়া দারোগা সাজিয়া হিন্দীতে কথা কহিতে কহিতে বাহির হইলেন। দারোগাকে সকলে

ভয় করে। স্ত্রীলোকটিও শশব্যস্ত হইয়া চলিয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন। এদিকে যদিও নরেন্দ্রনাথ মুখে গালমন্দ ও ভয় দেখাইতেছিলেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল এবং অন্যমনস্ক হইয়া মাথা হেঁট করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তিনি সন্নিকটস্থ গঙ্গাধর মহারাজকে বলিলেন, "ছাখ্, স্ত্রীলোকটা খেতে পায়নি, তাই পাগল হয়ে গেছে। দেখছিস্নি, চুলগুলো উড়ি খুড়ি, একটু তেল নাই। ছাখ্ দেখি সতরঞ্চির নীচে যদি কিছু থাকে।" গঙ্গাধর মহারাজ সতরঞ্চি তুলিয়া দেখিলেন ছয় আনা পয়সা রহিয়াছে। তিনি তাহা লইয়া স্ত্রীলোকটির আঁচলে বাঁধিয়া দিলেন। স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেল। তখন নরেন্দ্রনাথ মুখ ভার করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রায় সমস্ত দিন রহিলেন এবং মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন "ওঃ কি কষ্ট! অনাহার—অনাহার, ওঃ কি কষ্ট!" এইভাবে প্রায় সমস্ত দিন চলিল। এইঘটনার দু'চার দিন পরে নরেন্দ্রনাথ খবর পাইলেন যে কোন একটি ব্যক্তি তিনটি সন্তান লইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছেন। সংসারে বড়ই কষ্ট থাকায় অনাহারে তাহার গ্রহণীরোগ হইয়াছে। রোগে তিনি শয্যাগত এবং অর্থাভাবে চিকিৎসা বা ঔষধাদি কিছুই হইতেছিল না। নরেন্দ্রনাথ এই ঘটনা শুনিবামাত্র তিরিশ টাকা যোগাড় করিয়া যোগেন মহারাজকে দিয়া বর্তমান লেখকের নিকট পাঠাইয়া দেন। বর্তমান লেখক যোগেন মহারাজকে সঙ্গে লইয়া দুঃস্থ ব্যক্তিটির নিকট গিয়া সেই টাকা দিয়া আসেন। নরেন্দ্রনাথ আরও বলিয়া পঠান যে তাহার সহপাঠী ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া যেন বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন। ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন্দ্রনাথের অনুরোধে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। যোগেন মহারাজ এ খবর প্রকাশ করিতে বারণ করেন। নরেন্দ্রনাথ সর্বদাই এই দুঃস্থ পরিবারের খবর লইতেন এবং কাশীপুরের বাগান হইতে স্বয়ং আসিয়া একবার দেখা করিয়া গিয়াছিলেন।

স্বামী প্রেমানন্দ কথিত—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পীড়া ক্রমেই বাড়িতে

লাগিল এবং আরোগ্যের কোনও আশা রহিল না। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি রাত্রিতে উদ্দাম কীর্তন সুরু করিলেন। চীৎকার ধ্বনিতে বাড়ি কাঁপিতে লাগিল। অনেকে মনে করিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অল্পদিনের মধ্যেই দেহত্যাগ করিবেন। এই সব ছোঁড়াদের আমোদ আহ্লাদ স্ফূর্তি দেখ, বয়সটা জোয়ান কিনা, তাই বুদ্ধিশুদ্ধি কম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তনীয়া দলের ভিতর থেকে একজনকে ডাকালেন এবং ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, "তোরা ত বেশ রে, কেউ মরে আর কেউ হরি-হরিবোল বলে।" উপস্থিত লোকটি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরক্ষণেই অতি আহ্লাদ করিয়া বলিলেন, "ওরে সুরটা এই রকম, অমুক জায়গায় এক কলি তোরা ভুলেছিলি। ঐখানে এই কলিটা দিতে হয়।" উপস্থিত যুবকটি প্রত্যাগমন করিয়া ভ্রাতৃবৃন্দকে সেই বিষয় বলিলেন ও সুর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া ও কলিটি সংযোজন করিয়া উদ্দাম কীর্তনের আনন্দে সকলে বিভোর হইয়া অনেক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। মহাশোকের ভিতরও মনটাকে কিরূপে বৈষ্ণবভাব দিয়া ভগবানে লইয়া যাওয়া যায় ইহা তাহার দৃষ্টান্ত। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে কিরূপ কীর্তন করিয়াছিলেন, সেই সময় সেই ভাবটি সকলের ভিতর জাগিয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের হাবু দত্তকে স্পর্শ করা—নরেন্দ্রনাথের মনে হইল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তো আর দেহ রাখিবেন না তবে এই সময়ে যাহাকে সম্মুখে পাইব তাহাকেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে স্পর্শ করাইয়া মুক্তিলাভ করাইব। তিনি তাঁহার খুড়তুতো ভাই শ্রীঅমৃত লাল দত্তকে (সুপ্রসিদ্ধ বাদ্যাচার্য হাবু দত্ত) সঙ্গে লইয়া গেলেন। লোকটি গাঁজা, গুলি ও চণ্ডুতে সিদ্ধ। আবগারী বিভাগের সম্রাট ছিলেন। জপ-ধ্যানেরনাম-গন্ধও জানিতেন না। গাঁজাখোর সঙ্গে নিয়া যাওয়াতে নরেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ গাঁজাও সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। লোকটিকে লইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপনীত হইলেন এবং জোর করিয়া বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন যেন তিনি ইহাকে স্পর্শ করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্পর্শ করিতে

অনিচ্ছুক। তিনি বারংবার কহিতে লাগিলেন, "আমি মরতে বসেছি, এখন আর কাকেও ছুঁয়ে দিতে পারব না।" নরেন্দ্রনাথ নাছোড়বান্দা। অবশেষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্মত হইলেন। গেঁজেল লোকটি মেজেতে বসিয়া রহিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাহার বক্ষস্থল আঙ্গুলি দিয়া স্পর্শ করিলেন। তখনই সেই লোকটা একেবারে সমাধিস্থ, স্থির নিস্পন্দ, পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া রহিল। প্রায় দুই ঘণ্টারও অধিক সময় এইরূপে রহিলে নরেন্দ্রনাথের মনে ভয় হইল। পাছে মাথার শির ছিঁড়িয়া যায় সেইজন্য অনেক করিয়া তাহার চৈতন্য আনাইয়া নীচেকার বাগানে লইয়া গিয়া বলিলেন, "দাদা, তোর জন্য গাঁজা এনেছি, গাঁজা খাবি?" সেই লোকটি তখন অর্দ্ধনিদ্রিতবৎ অস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি খুব নেশায় বুঁদ ছিলুম—গাঁজার নেশা ফিকে নেশা, ঐ বুঁদ নেশাটা চাই।" তদবধি সেই লোকটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অস্থিপূজা না করিয়া কখনও অন্ন গ্রহণ করিতেন না।

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল কথিত—নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে একদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাইয়া অতি ব্যগ্রভাবে কহিতে লাগিলেন, "তোমার ত শরীর দিন কতক পরেই যাবে আমার কি করে দেবে দাও।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "ওরে, আমি মরছি, এই সময়ে তোর যত উৎপাত।" নরেন্দ্রনাথ তাহাতে বিশেষ জোর করিয়া বলিলেন, "সেই জন্যই ত বলছি। ডাক্তার বলে গেছে তোমার ব্যামো ভাল হবে না, শরীরত যাবে, তবে আমার কি করে দেবে দাও।" হৃদয়ে নির্ভীক ভালবাসা থাকিলে একজন অপরকে এইরূপ স্থলে এইরূপই কহিতে পারে। তারপরে কথিত আছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নিভৃত সময়েতে নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ গিরিশচন্দ্র ঘোষ কথিত—একদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জনৈক আত্মীয় সাক্ষাৎ করিতে আইসে। ব্যক্তিটি গ্রাম্য, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পদবন্দনা বা প্রণাম না করিয়া বসিয়া রহিল। পূজ্যপাদ গিরিশবাবু লোকটিকে বলিলেন, "কি ঠাকুর, দেখছ কি, যদি উদ্ধার হতে চাও,

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) ওঁর পায়ের ধূলা নাও, তবে উদ্ধার হবে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "ওরে বলিস কি? ও যে আমার মামাশ্বশুর।" গিরিশবাবু কিঞ্চিৎ অপ্রভিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ চট্ করিয়া বলিলেন, "রেখে বসুন মশায় আপনার মামাশ্বশুর। আপনার বাপ এলেও তাঁর ঘাড় ধরে আপনাকে প্রণাম করাইয়া লইব।" গিরিশবাবু বলিলেন, "তখন বাঁচলুম, নরেন আমার দিকে ওকালতী করলে।"

পূজ্যপাদ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও ছুট্‌কো গোপাল কথিত—এই সময়ে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে চিকিৎসা করিতে আসিতেন এবং গিরিশবাবুর সহিত অনেক তর্কবিতর্ক এবং নরেন্দ্রনাথের সহিতও দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিতেন। ডাক্তার সরকার প্রবীণ ও প্রগাঢ় পণ্ডিত। অল্পবয়স্ক যুবক নরেন্দ্রনাথ তাহার পক্ষে কিছুই নহে। ডাক্তার সরকার তর্কের সময় অনেক পুস্তকের নাম করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ চট্ করে মহেন্দ্র সরকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই, আপনি বইয়ের নামটা শুনেছেন না বইটা দেখেছেন, না বইটা পড়েছেন?" তাহাতে সরকার চমকিত হইয়া উঠিলেন। নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বলি, বইটা দু'একটা পাত পড়েছেন, না সবটা পড়েছেন? ডাক্তার সরকার আরও আশ্চর্যান্বিত হইয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিলেন যে তিনি কোন বইটির দু'চার পাত পড়িয়াছেন বা কোনও বইটি অল্পমাত্র পড়িয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ তখনই গম্ভীরভাবে বলিলেন যে সেই বইখানা তাহার অনেক বৎসর আগে পড়া হইয়াছে এবং পুস্তক হইতে অনেক উদ্ধরণ করিয়া ডাক্তার সরকারকে শুনাইতে লাগিলেন এবং তাহাকে তর্কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ডাক্তাব সরকার আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "এত অল্প বয়সের ছেলে যে এত পড়েছে, তাহা আমি কখনও জানতুম না।"

ছুট্‌কো গোপাল কথিত—তর্ককালে গিরিশবাবু বা নরেন্দ্রনাথ যখন বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইত, তখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাহার গায়ে

অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া বলিতেন, "আরে এইটে বল্ না।" উপস্থিত সকলে তাহাতে বুঝিতে পারিতেন যে সেই ব্যক্তিই তর্কে বিজয়ী হইবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এইরূপে সেই ব্যক্তিতে আপন শক্তি সঞ্চার করিয়া দিতেন।

নরেন্দ্রনাথের গয়াধাম যাত্রা—কাশীপুরে অবস্থানকালে বুদ্ধদেবের বই খুব পড়া হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ কালী ও তারকনাথ তিন জনে বুদ্ধগয়ায় চলিয়া গেলেন ও তথায় বুদ্ধদেবের সিদ্ধ প্রস্তরের উপর বসিয়া খুব ধ্যান করিতেন ও সর্বদা এই শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলেন,—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং।
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু॥
অপ্রাপ্য বোধিম্ বহুকল্পদুর্লভাং।
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতি॥

কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্রনাথের জননীর গমন—কথিত আছে, নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের দেহ হইতে একটি জ্যোতি আসিয়া শিবানন্দ মহারাজের শরীরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন; তদবধি তারকনাথ 'মহাপুরুষ' বলিয়া অভিহিত হন। নরেন্দ্রনাথ গয়াধামে চলিয়া গিয়াছে, চিম্‌টা লইয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছে শুনিয়া নরেন্দ্রনাথের জননী বড় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং রামচন্দ্র দত্তের পিতা নৃসিংহ প্রসাদ দত্তকে সঙ্গে লইয়া একখানি গাড়ি করিয়া কাশীপুরের বাগানে গিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আমি তো অনেক করে বুঝিয়ে বললুম, 'যাস নি, তা চিম্‌টা নিয়ে বেরিয়ে গেল, তা আর কি বলব? আবার ফিরে আসবে।" এইরূপ অনেক প্রকার সান্ত্বনা বাক্য কহিতে লাগিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের মায়ের মনে ইহা বড় কষ্টদায়ক হইয়াছিল এবং তিনি ইহাতে একেবারে বিষণ্ণ হইয়া পড়েন। যাহা হউক কিছুদিন পরে নরেন্দ্রনাথ আবার ফিরিয়া আসিলেন।

লাটু মহারাজের নরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা—

কাশীপুরে অবস্থানকালে একদিন লাটু মহারাজের এক খেয়াল উঠিল যে নরেন্দ্রনাথকে Lecture দিতে হবে। লাটু মহারাজ বলিতেন, "দেখ্ ভাই লোরেণ, কিশুববাবু টোউন হোলে কিমন লিক্‌চার কোরে। তুই ভাই ইমন লিক্‌চার কুর্‌বি আর হ্যামি তুর জন্যে এক কুজু জোল লুয়ে বসে থাক্‌বো।" আমেরিকায় অবস্থানকালে স্বামীজী লাটু মহারাজকে পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া দিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, "লাটুর ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছি, শুধু লেকচারের সময় সে হাজির থাকিতে পারিল না।" প্রসঙ্গক্রমে নরেন্দ্রনাথ প্রায় বলিতেন, "বেদান্তের উপদেশ আমি আর কি করব রে, লেটো ফেটো ওরাই করবে।"

নরেন্দ্রনাথের যীশুর ভাবে সাধন—এই সময় বাইবেল পড়া খুব চলিত। নরেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে ও অপর সকলকে বাইবেল উপখ্যান বলিতেন ও Nicodemus-এর উপাখ্যানটা সর্বদাই আবৃত্তি করিতেন। নরেন্দ্রনাথ কি এক মহাভাবে বিভোর হইয়া চক্ষু নিমীলিত করিয়া প্রায় এই কথাটি উচ্চারণ করিতেন, "Thou shalt be born again." সময় অসময় Nicodemus-এর গল্পটি মুখে লাগিয়া থাকিত যীশু যেমন নিজের শিষ্যদের লইয়া একটা সঙ্ঘ করিয়াছিলেন এবং শিষ্যেরা যীশুর অন্তর্ধানের পর পরস্পরে প্রগাঢ় ভালবাসার সহিত একীভূত হইয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথও সেই দৃশ্যটি চোখে রাখিয়া আপনার অল্পবয়স্ক গুরুভাইদিগকে অজ্ঞাতভাবে শুনাইতে লাগিলেন। যীশুর জীবনটা যেন সেই সময় তাঁহার আদর্শ হইয়াছিল এবং শরৎ মহারাজেরও সেই ভাবটি তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। হইবারই ত কথা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আত্মত্যাগ ও ভগবানের উপর নির্ভরতা, অমানুষিক ভালবাসা এবং অল্পবয়স্ক কতিপয় যুবক একত্রিত হইয়া মনপ্রাণ দিয়া ভগবান লাভের জন্য গুরুর শুশ্রূষা করিতেছে,—যীশুর সহিত এই অবস্থার সৌসাদৃশ্যটা খুবই হইয়াছিল। যীশুর ছবি আনিয়া দেওয়ালে রাখিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া যীশুর ভাব বুঝিতে লাগিলেন বা যীশুর বই পড়িয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝিতে

লাগিলেন। একভাব অপর ভাবকে প্রস্ফুটিত করিতে লাগিল। এই জন্যই নরেন্দ্রনাথের Nicodemus-এর গল্পটি এমন ভাল লাগিত এবং নিতান্ত অনুগত শরৎচন্দ্রও সেই গল্পটি মনেপ্রাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রনাথের খুল্লতাত বিয়োগ—এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের পৈতৃক বাটি লইয়া জ্ঞাতিদিগের সহিত মামলা হয় এবং নরেন্দ্রনাথের সংসারেও বিশেষ আর্থিক কষ্ট যাইতেছিল। নরেন্দ্রনাথের খুড়ো তারকনাথ দত্তের অন্তিম অবস্থা। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের কোন এক রবিবার অতি প্রত্যুষে বর্তমান লেখক ঘুরিতে ঘুরিতে কাশীপুরের বাগানের দিকে চলিলেন। চিৎপুরের বাজারপল্লী পার হইয়া শরৎ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পূজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় কিছু চৈ (ঝাল শিকড়) আনিয়াছিলেন। শরৎ মহারাজ সেইটি নরেন্দ্রনাথের বাড়িতে পৌঁছিয়া দিবার জন্য আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হওয়ায় এবং নরেন্দ্রনাথের খুল্লতাতের অন্তিম অবস্থা বলায় উভয়ে কাশীপুরের বাগানে ফিরিয়া যাইলেন। নিচেকার হলঘরটিতে অনেকে বসিয়াছিলেন। সকাল হইয়াছে—রৌদ্র উঠিয়াছে। গঙ্গাধর মহারাজ বর্তমান লেখককে পুকুরের পাড় দেখাইয়া মুখ ধোয়াইয়া আনিলেন। হুট্‌কো গোপাল তখন গেরুয়া কাপড় পরিয়াছিল, সে একটি বড় কেট্‌লি করিয়া সকলের জন্য চা তৈয়ারি করিয়া আনিল এবং শশী মহারাজ বরাহনগরের ফাগুর দোকান হইতে লুচি, গুট্‌কে কচুরি, আলুছেঁচকি ও কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া আনিলেন। সকলে কিছু কিছু খাইয়া কলিকাতার দিকে আসিবার উপক্রম করিলেন। ঘরটার ভিতরের হাওয়াটা যেন গম্ গম্ করিতেছিল সকলেই যেন আনন্দিত ও উৎসাহিত; একটা জীবন্ত বায়ুতে যেন ঘরটি পরিপূর্ণ ছিল। প্রত্যেকেই যেন দেবভাবে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক জিনিসটাই যেন দেবভাবে জীবন্ত। লাটু মহারাজ মেঝেতে একধারে বসিয়া মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে

তর্কবিতর্ক করিতেছিলেন; কথাটা হইতেছিল, 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ'।

নরেন্দ্রনাথের বিভোর অবস্থা—অবশেষে একখানি থার্ড ক্লাস গাড়ি আসিল; গাড়িতে নরেন্দ্রনাথ ও আর এক ব্যক্তি পিছন দিকে বসিলেন এবং কালী বেদান্তী ও বর্তমান লেখক সুমুখের দিকে বসিলেন। বসন্তকাল—নরেন্দ্রনাথ বিভোর, মাঝে মাঝে গাড়ি হইতে মুখ বাহির করিয়া গাছপালা ও পাখি দেখিতেছেন আবার বিভোর হইয়া যাইতেছেন।

অনেক কষ্টে মনটাকে দেহের দিকে ফিরাইয়া আনিতেছেন, এবং কাকার শেষ অবস্থা ও মামলা মোকদ্দমার কথা ভাবিতেছেন, আবার অনতিবিলম্বে মনটা উঁচুদিকে চলিয়া যাইতেছে, জগতের কোন কথাই মনে থাকিতেছে না। ব্যক্ত, অব্যক্ত তখন যুগপৎ মনে খেলা করিতেছিল কিন্তু উভয়বিধ ভাবেতেই নরেন্দ্রনাথ যেন নির্লিপ্ত। গাড়িতে আসিতে আসিতে (তখন কাশীপুর ও চিৎপুর সমান্য গ্রাম) নরেন্দ্রনাথ এদিক ওদিক বাগান দেখিতেছেন এবং কালীকে বলিতেছেন,—"কিরে কেলো, সেই স্তবটা কিরে 'পিতানৈব মে * * গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্'।" এমন স্পষ্ট যতি ও মাত্রা দিয়া উচ্চারণ এবং নাদ-ধ্বনি ও গম্ভীর বাণী, যেন স্পষ্ট কোন জিনিসকে দেখাইয়া দিতেছেন।

ভাবটা যেন প্রত্যক্ষ হইয়া দাঁড়াইতেছে; ইহা গাত্রে যেন স্পর্শ করিতে লাগিল। ইহাকেই বলে নাদ-ধ্বনি। ইহা নাকিসুরে মুখ বিকৃত করিয়া গাইয়ের গান গাওয়া নয়। ইহা স্বতন্ত্র জিনিস এবং শ্রোতার মনটাকে কোথায় ঊর্ধ্বে লইয়া যায়। নরেন্দ্রনাথ বিভোর, মাঝে মাঝে মাথা নাড়িতেছেন, যেন ঘাড়ে মাথাকে স্থির করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। চক্ষু কখন নিমীলিত, কখন বিস্ফারিত; শব্দ কখন স্পষ্ট, কখন শ্লথ, কখন বা নিস্ফল, কখন বা আপনি আপনি মনে কি উদয় হইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছেন। কিন্তু সকল পরিবর্তনের ভিতর এক গম্ভীর মহা আকর্ষণী ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, একটা

মহাভাবে নিমগ্ন ও সংজ্ঞাহীন। জোর করিয়া যেন মনটা ফের দেহের ভিতর নামাইয়া আনিতেছেন।

নরেন্দ্রনাথের গৃহে আগমন—গাড়িখানি বাগবাজারের পোলের নিকট আসিলে অপর ব্যক্তি, সম্ভবতঃ যোগেন মহারাজ, গিরিশ বাবুর বাটির দিকে চলিয়া গেলেন এবং তিনজনে আসিতে লাগিলেন। কালী বেদান্তী আহীরিটোলাতে নামিয়া যাইলেন, শেষে দুজনায় সিমলায় আসিলেন।

ডাঃ নবীন পাল ও নরেন্দ্রনাথ—কাশীপুরের বাগানে নবীন পাল নামক জনৈক সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে যাইতেন। তিনি উদ্ভিদতত্ত্বে বিশেষ নিপুণ ছিলেন; লতাগুল্মাদি আনিলে তিনি দেখিয়া উহা কোন শ্রেণীভুক্ত তাহা বলিয়া দিতেন।

একদিন নরেন্দ্রনাথ, সম্ভবতঃ গঙ্গাধর মহারাজের সহিত মিলিত হইয়া কতকগুলো ঘেঁটুপাতা ও অপর কতকগুলি জংলীপাতা আনিয়া ডাঃ নবীন পালের সম্মুখে দিলেন এবং অতি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই, এই গুল্মজাতি কোন শ্রেণীভুক্ত?" নবীন পাল পাতাগুলি লইয়া কিছু শুঁকিলেন এবং চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এটা Class lemonis" এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ সকল কথায় ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন—Class lemonis; অর্থাৎ যখন কোন জিনিস শ্রেণীভুক্ত করা যাইত না, তখন তাহাকে নরেন্দ্রনাথ Class lemonis বলিতেন। অদ্যাপি স্বগোষ্ঠীর ভিতর এই শব্দটি খুব চলিয়া থাকে।

সংঘবদ্ধ থাকার পথে বাধা—১৮৮৬ সালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দেহ-ত্যাগের পর যাঁহারা অর্থ দিয়া কাশীপুরের বাগানের ব্যয় চালাইতেন, তাঁহারা সকলেই অর্থদানে অনিচ্ছুক হইলেন। বাড়িভাড়া তখন প্রায় দুই বা তিন মাসের অগ্রিম দেওয়া ছিল, এজন্য বাড়িটি রহিল; কিন্তু আহারের বা অন্য কোনও প্রকারের বন্দোবস্ত কিছুই ছিল না। রামচন্দ্র দত্ত বলিলেন, "যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া যাউক এবং নিজ নিজ কর্ম করুক।" সুরেশচন্দ্র মিত্র কহিলেন যে, তিনি তাঁহার অফিসে ছুটকো

গোপালের চাকরি করিয়া দিবেন—"নরেন্দ্রনাথ বাড়ি গিয়া ফের আইন পড়ুক ; শরৎ, শশী ও রাখাল, ইহারা যে যাহার বাড়ি যাউক।" তবে বুড়ো গোপাল, তারকনাথ ও লাটু এই তিনজনকার থাকিবার একটু অসুবিধা হইল। লাটু মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে সেবা করিবার জন্য রামচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। বুড়ো গোপালের ছেলেপুলে সব মরিয়া গিয়াছিল, তাহার বিষয় একটু ভাবিবার কথা। তারকনাথের কথাও একটু চিন্তার বিষয়।

শশী মহারাজ ও কাঁকুড়গাছির উৎসব—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অস্থির ঘড়াটি মাথায় করিয়া শশী মহারাজ ৺জন্মাষ্টমীর দিন মধুরায়ের গলিস্থ শ্রীরামচন্দ্র দত্তের বাটি হইতে নগর সংকীর্তন করিয়া কাঁকুড়গাছির উদ্যানে লইয়া যান। অবশ্য শশী মহারাজ অর্ধেক অস্থি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং সেই অস্থি বেলুড় মঠে পূজা হয়। রামচন্দ্র দত্তের কাঁকুড়গাছির এই উদ্যানে অস্থিস্থাপনের পর মন্দিরের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল এবং একটি মহোৎসব হইল। নরেন্দ্রনাথ কাঁকুড়গাছি হইতে ফিরিয়া গিয়া আবার সকল যুবক গুরুভাইকে লইয়া কাশীপুরের বাগানে রহিলেন। টাকা নাই, আহারের কোনও বন্দোবস্ত নাই, কি করিয়াই বা দশ-বারটি লোক একসঙ্গে থাকে। যখন এইরূপ গোলমাল উঠিয়াছে তখন নরেন্দ্রনাথ সিংহ-বিক্রমে নিজের শক্তি বিকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি অতি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "রাখাল, তুই যা ত সেই বড়বাজারের মাড়োয়াড়ীটার কাছে, সেটাকে ডেকে নিয়ে আয় ; সে টাকা দেবে। আমরা বাড়ি ফিরে যেতে পারব না।" রাখাল মহারাজ অতি ভাল মানুষ, কথায় সম্মত হইলেন, কিন্তু লাজুক ; অগ্রসর হইতে পারিলেন না। দশ টাকা দিয়া পরামাণিক ঘাটে মুন্সীদের ভূতুড়ে বাড়িটি (এস্থানে মুন্সীদের একটি পুরানো বাড়ি ছিল, ইহাকে ভূতুড়ে বাড়ি বলা হইত) ভাড়া করা হইল। মুটের পয়সার অভাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শয্যাদি হুট্‌কো গোপাল অনেকটা স্বীয় স্কন্ধে করিয়াই বহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্র মিত্র সেই সময়ে বলিলেন, "আরে আমরা

সংসারী লোক, সারাদিন খাটিখুটি, টাকা রোজগার করি, একটা জুড়োবার জায়গা চাই ত; বুড়ো গোপাল, তারকনাথ আর লাটু তিনজনে এখানে থাকুক।”

নরেন্দ্রনাথের আবার আইনের পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করা—নরেন্দ্রনাথ রামতনু বসুর গলির বাড়িতে ফিরিয়া আবার আইনের পুস্তক খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। পরীক্ষার আর অল্পদিন বাকী আছে। দরজা সব বন্ধ রাখিতেন, পাছে কেহ আসিয়া বিরক্ত করে। কিন্তু বই খুলিয়া অনেক সময় উন্মনা হইয়া থাকিতেন, শূন্য দৃষ্টি, স্থির নেত্র। একদিন বেলা প্রায় তিনটার সময় হুট্‌কো গোপাল আসিয়া দরজায় ধাক্কা মারিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ গৃহাভ্যন্তর হইতে কোন উত্তর করিলেন না। শেষকালে গোপাল বলিলেন, “ভাই, তোকে একটু তামাক সেজে খাওয়াতে এসেছি, দোরটা খোল না।” নরেন্দ্রনাথ বড় তামাকপ্রিয় ছিলেন। সাতপাঁচ ভাবিয়া দরজাটা খুলিলেন।

হুট্‌কো গোপাল ও নরেন্দ্রনাথের কথা—গোপাল গৃহে প্রবেশ করিয়া একথা ওকথার পর কাশীপুরের কথা তুলিলেন। এদিকে নরেন্দ্রনাথের পুস্তকও বন্ধ হইয়া গেল। দুইজনে বাহির হইয়া পড়িলেন। গোপাল বলিলেন, “শরৎ ও শশী বাড়িতে আছে। দোরের দিক দিয়ে গেলে শরতের বাপ টের পাবে, ওকে জানালার দিক দিয়ে ডাকি গিয়ে।” শরৎ মহারাজ বাড়িতে ছিলেন, জানালা দিয়া চাদরটা ও জুতাটা ফেলিয়া দিলেন, গোপাল তুলিয়া লইলেন এবং রাস্তায় যেন কোন কার্যে যাইতেছেন এই ছলে বাহির হইয়া আসিলেন। ক্রমে তিনজনে একত্র হইলেন। তিনজনে একত্রেই কখন মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ি, কখনও গিরিশ বাবুর বাড়ি, কখনও বা বলরাম বাবুর বাড়িতে যাইতেন। কখনও বা লাটু মহারাজ আসিয়া রামতনু বসুর গলিতে নরেন্দ্রনাথের কাছে বসিয়া থাকিতেন এবং নরেন্দ্রনাথকে টানিয়া লইয়া যাইতেন।

বরাহনগর মঠের অবস্থা—একদিন লাটু মহারাজ রামতনু বসুর গলির বাটীর ঘরটিতে বসিয়া নরেন্দ্রনাথের মাতাকে নরেন্দ্রনাথের বিষয় বলিতে

লাগিলেন যে, "দেখুন, নরেনের মনটা যেন ময়দার তালের মতন। যে রকম ভাবে গড়ুন সেই রকম ভাবেরই হয়।" অর্থাৎ মহাশক্তি ভিতরে রহিয়াছে। যে দিকে যখন লাগাইতেছে তখন সেই দিকেই নূতনত্ব দেখাইতেছে। ঐ সময় মাসখানেক সকলে বিমনায়মান থাকায় আশ্বিন বা কার্তিক মাসে, ১৮৮৬ সালে, বরাহনগর মঠে সকলে আসিয়া একত্র হইলেন। মঠের বাড়িটা অতি প্রাচীন, ভগ্ন, নীচেকার ঘরগুলি মাটিতে ডুবিয়া বসিয়া গিয়াছে; শৃগাল ও সর্পের আবাসস্থান। উপরে উঠিবার সিঁড়ির ধাপগুলি খানিকটা আছে, অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতলের দালানের মেঝের খোয়া দুই হাত আছে ত দুই হাত উঠিয়া গিয়াছে। দরজা জানালার তক্তাগুলির খানিকটা আছে, খানিকটা নাই; ছাতের বরগা পড়িয়া গিয়াছে, বাঁশ চিরিয়া ইটগুলি রাখা হইয়াছে। চতুর্দিকে জঙ্গল। ভূতের বাড়ি ত সত্যই ভূতের বাড়ি। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উত্তরদিকে, অর্থাৎ দক্ষিণ হাতে যাইতে প্রথম একটি নাতিবৃহৎ গৃহ—যেটিকে কালী বেদান্তীর বা "কালী তপস্বীর ঘর" বলা হইত। তাহার পর দুই ধাপ উঠিয়া একটি ছোট দরজা এবং ভিতরে যাইবার পথ। আর একটু ঢুকিলে বাঁ দিকে ঠাকুরের ঘর এবং সম্মুখে একটি লম্বা দালান ও দালানের পশ্চিমে একটি বড় ঘর। বড় ঘরের ভিতর দিয়া যাইলে উত্তর-পশ্চিম দিকে ছোট একটি ঘর, সেখানে জল থাকিত ও সকলে বসিয়া খাইত। তাহার পর উত্তর-পশ্চিম দিকে পায়খানা। আর ভোজনগৃহের পূর্বদিকে একটি গৃহে রান্না হইত। এইটি হইল বরাহনগরের মঠ। কাশীপুরের বাগানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে শয্যা, বালিশ ও ব্যবহৃত-দ্রব্যাদি ছিল, তাহা সংরক্ষিত হইল। মেঝের উপর শয্যা স্থাপন করা হইয়াছিল, পালঙ্ক তখন একটাও ছিল না। দানাদের ঘরে (কালী তপস্বীর ঘরটি ব্যতীত অপর যে একটি বড় গৃহ তাহার নাম "দানাদের ঘর") বালন্দা পট্‌পটীর খান দুই তিন মাদুর সংযুক্ত করিয়া মেঝেতে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে; অপর এক জায়গায় সতরঞ্চি রহিয়াছে—"চোরের বিশ্বাসী", কোনও জায়গায় টানাটা রহিয়াছে,

অপর জায়গায় পড়েনটা রহিয়াছে—জেলের জালবৎ। মাথার বালিশ—বালন্দার চাটাই-এর নীচে নরম নরম ইট দেওয়া। শীত করিলে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া শয়ন, বা তাহাতে শীত না ভাঙ্গিলে রাত্রিতে উঠিয়া একবার কুস্তি লড়িয়া লওয়া; শরীর গরম হইলে শীত পলাইয়া যাইত।

সুরেশচন্দ্র মিত্রের ঠাকুরঘরেতে আপত্তি—সুরেশচন্দ্র মিত্রের ঠাকুরঘর করিতে আপত্তি ছিল। তিনি ইহাকে দোকানদারি বলিয়া মনে করিতেন। তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "শ্যালারা করবি কি; যেমন শীতলাঠাকুর বসায়, তেমনি ঠাকুরের ছবি রেখে ঘণ্টা বাজাবি আর পূজুরিগিরী করবি? তার চেয়ে ঠাকুর ঘর না করাই ভাল।" নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, "দ্যাখ্, আমরা সন্ন্যাসী, কোথায় খাব, কোথায় থাকব, ঠিক নেই। ঠাকুর ঘর করে মিছে বিব্রত করিস নে। ঠাকুরঘর কল্লে একটিকে নিজস্ব থাকতে হবে, আর অনেক চিন্তায়ও থাকতে হয়। তার চেয়ে ঠাকুরের আদর্শ সামনে রেখে সাধনা করাই শ্রেয়।" কিন্তু শশী মহারাজ প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে সমস্ত ভার নিজে লইতে সম্মত হইলেন এবং তিনিই ঠাকুর স্থাপন ও পূজার বিধি প্রণয়ন করিলেন।

শশী মহারাজের ঠাকুরঘর স্থাপন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শরীর থাকিতে যে যে সময়ে যে যে কার্যটি করিতেন এবং যে বস্তুটি ভোজন করিতেন, শশী মহারাজ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ স্বশরীরে বর্তমান বোধ করিয়া সেইরূপভাবে ভোগ, পান ও তামাক দিতে লাগিলেন। মন্ত্র হইল, "জয় গুরুদেব, শ্রীগুরুদেব", "জয় গুরুদেব, শ্রীগুরুদেব" ইত্যাদি এবং গুরুর স্তব পাঠ করিতেন। আর রাত্রিকালে শশী মহারাজ যখন পঞ্চপ্রদীপ নাড়িতেন ও মুখে "জয় গুরুদেব, শ্রীগুরুদেব" শব্দ উচ্চারণ করিতেন, তখন তাঁহার কণ্ঠ হইতে এক গম্ভীরনাদ বাহির হইত। তিনি বিভোর, উন্মত্ত গম্ভীরস্বরে শব্দটি একরূপভাবে উচ্চারণ করিতেন যে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইত এবং সেই গম্ভীর শব্দ বহুদূর হইতে শ্রুত হইত।

গৃহপ্রাচীর ও জানালাসমূহে সেই নাদ প্রতিধ্বনিত হইত। এরূপ একাগ্রচিত্তে, উন্মত্তভাবে পূজা করিতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। শশী মহারাজের বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর; দেহ লম্বা ও পাতলা ছিপছিপে, শ্মশ্রুও অল্প অল্প আছে এবং বর্ণ গৌর। শেষ বয়সের যে স্থূলকায় চেহারা, যুবাবয়সে তাহা ছিল না। সম্ভবতঃ ১৮৮৬ সালের আশ্বিন-কার্তিক মাসে বরাহনগর মঠের প্রারম্ভ; এই সময় এইরূপ একটি স্থান নির্দিষ্ট হওয়াতে সকলে আসিয়া মিলিতে লাগিলেন এবং তারকনাথ প্রধান হইয়া সকলকে দেখিতে লাগিলেন। তারকনাথকে আহ্লাদ করিয়া সকলেই "মহাপুরুষ" বলিতেন এবং বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তিও করিতেন। এই বরাহনগরের মঠেই বাইবেল, তদ্ব্যতীত প্রজ্ঞাপারমিতাদি বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ, বেদান্ত ও হিন্দুশাস্ত্রাদির আলোচনা এবং যথাসম্ভব সাধন, ভজন ও কঠোর তপস্যা আরম্ভ হইল।

বরাহনগর মঠে আহারের বন্দোবস্ত—আহারের কোন বন্দোবস্ত না থাকায় এবং কাহারও প্রদত্ত কিছু গ্রহণ করিবেন না ইহা স্থির করিয়া সকলেই মুষ্টিভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ভিক্ষার যে চাউল আসিত তাহা সিদ্ধ করা হইত। তৎপরে এক বস্ত্রখণ্ডের উপর তৎসমুদয় ঢালিয়া তাহার চতুর্দিকে সকলে মিলিয়া বসিতেন এবং লবণ ও লঙ্কার ঝোল করিয়া তাহাই দিয়া ভোজন সমাপ্ত করিতেন, কখনও বা তেলাকুচা পত্রের ঝোল হইত। জলপানের জন্য একটিমাত্র ঘটি ছিল। একটি বাটিতে নুন-লঙ্কার ঝোল থাকিত; সকলেই একগ্রাস করিয়া একবার ভাত মুখে লইতেন ও একবার ঐ ঝোল হাতে করিয়া মুখে দিতেন; জিহ্বায় অত্যন্ত ঝাল ঝাল লাগিত। গুরুসেবা ও গুরু-ভাইকে সেবা করা একই—এই ভাবটি তখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। উপরকার পায়খানাটিতে পশ্চাতের পুষ্করিণীর জল আনিয়া রাখা হইত। গোটা দুই মাটির গামলা ছিল, তাহাতেই জল থাকিত। একদিন প্রসঙ্গক্রমে নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "তিনি (পরমহংসদেব) 'ষোল আনা' কঠোর করেছিলেন, আমরা কি তার এক আনাও করতে পারব না?

পরমহংস মশাই অপরের পায়খানা ধুয়ে দিয়ে এসেছিলেন আর আমরা কি তার নাম করে কিছুই করতে পারব না !"

বরাহনগর মঠে সকলের শৌচাগার পরিষ্কার করা—তিনি এই কথা এরূপ হৃদয়স্পর্শীভাবে বলিয়াছিলেন যে সকলের ভিতর সেবার ভাব ও কঠোরতা করিবার ইচ্ছা অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রথমে একদিন সকলের অসাক্ষাতে একজন পায়খানাটি ধুইয়া দিয়া দু-তিনটি হুকাতে জল বদলাইয়া দিয়া কলকেতে তামাক টিকা ঠিক করিয়া রাখিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর সকলে পায়খানায় গিয়া দেখেন যে, পায়খানা পরিষ্কার, তামাক তৈয়ারি। পায়খানায় মলপতনের জন্য একটিমাত্র গর্ত। একজন শৌচে বসিলেন ত অপর কয়েকজন স্ব স্ব পাদদ্বয়ের উপর জানু নত করিয়া বসিয়া ধূমপান এবং বেদান্ত ও নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। পুনরায় আর একজনের বেগ আসিয়াছে ত তিনি মলত্যাগে বসিলেন, অপর কয়জন ধূমপান করিতে করিতে শাস্ত্র-চর্চা করিতেছেন; এইরূপে পর্যায়ক্রমে একজন করিয়া শৌচে বসিতেছেন ও অন্য কয়জনে শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। শৌচস্থল বৈঠকখানায় পরিণত হইল। সকলেই দিগম্বর ও মধ্যে মধ্যে কৌতুক রহস্যাদিও চলিতেছে। ক্রমে ক্রমে অল্পদিনের ভিতর বিষ্ঠা-পরিষ্কার একটা মহা সাধনা হইয়া দাঁড়াইল; ইহা যেন তাঁহাদের একটা তপস্যা হইয়া উঠিল। একজন যদি ভোর রাত্রিতে করেন, পরদিন অন্য একজন শেষরাত্রিতে উঠিয়া অলক্ষিতে পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন এবং তৎপরদিন অপর একজন অর্ধরাত্রে উঠিয়া পায়খানা ধৌত করিয়া দিয়া স্বস্থানে শয়ন করিতেন। কে যে পায়খানা ধৌত করিয়া রাখিতেন, পরস্পর কাহাকেও জানিতে দিতেন না। এইরূপ অপূর্বভাব জগতে খুব কমই দেখা গিয়াছে।

সকলের বিধিপূর্বক সন্ন্যাসগ্রহণ ও গঙ্গাধর মহারাজের তিব্বত গমন—বরাহনগর মঠ স্থাপনের কয়েক দিবসের মধ্যেই সকলে রাস্তার দিকের বিল্ববৃক্ষমূলে বিধিপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। মঠে কিছুদিন থাকিয়া

গঙ্গাধর মহারাজ বৌদ্ধধর্ম বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিবার জন্য তিব্বতে চলিয়া যান। তখন তিনি অল্পবয়স্ক বালক মাত্র; বয়স সতের-আঠার, কেশ বর্ধিত, নাক লম্বা ও শরীর কৃশ। নকল করিতে ও হাসাইতে সিদ্ধহস্ত। মঠ স্থাপনের কয়েকমাস পরেই তিনি প্রস্থান করেন এবং তিব্বতে ও হিমালয়ের নানাস্থানে তিন-চার বৎসর ধরিয়া পর্যটন করেন। রাখাল মহারাজ বাহিরের দিকের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠটিতে বসিয়া অনুক্ষণ জপ করিতেন। তাঁহার অতি নিরীহ প্রকৃতি ও বালকস্বভাব ছিল। সকলেই তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিতেন। পরে তাঁহার যেরূপ প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল তখন সেরূপ কিছুই লক্ষিত হয় নাই। নিরীহ নির্বিবাদ যুবক। কিয়দ্দিবস পরে তিনি বৃন্দাবনে প্রস্থান করিলেন। শরৎ মহারাজও অল্পকাল পরেই হিমালয় প্রভৃতি স্থান পর্যটন করিতে চলিয়া যাইলেন। বহুদিনের কথা হওয়ায় কোনটির পর কোনটি হইয়াছিল, ঠিক স্মরণ রাখা সম্ভব নহে। এইজন্য কিঞ্চিৎ বিপর্যস্ত হইতে পারে। মোটামুটি যাহা স্মরণ আছে তাহাই বিবৃত হইতেছে।

শশী মহারাজ ও শরৎ মহারাজের নরেন্দ্রনাথের প্রতি আনুগত্য— এইসময় নরেন্দ্রনাথের আবার বাটির মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। মোকদ্দমা চালাইতে হইবে, আবার ঘোর বৈরাগ্যসাধনাও করিতে হইবে, এবং গুরু-ভাইদিগকে একত্রে রাখিয়া সন্ন্যাসীর কঠোর পথ দেখাইতে হইবে। এই উভয়সঙ্কটে পড়িয়া নরেন্দ্রনাথকে দু-এক বৎসর শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। মহাতেজস্বী ও বীরপুরুষ না হইলে দুইটি বিপরীত ভাব একসঙ্গে রাখিয়া নিজেকে নিরপেক্ষ রাখিতে পারে না। মোকদ্দমা চালাইবার টাকার এত অনাটন যে, একদিন শশী মহারাজ ও শরৎ মহারাজ নরেন্দ্রনাথকে অনুনয় করিয়া বলিলেন যে, "দেখ ভাই নরেন, তোমার টাকার এখন বড্ড দরকার মোকদ্দমার খরচা বেশী; আমরা কেন দুইজনে গিয়ে বালিতে স্কুলে মাষ্টারী করি না, কিছু কিছু রোজগার করি আর মঠে এসে থাকি। তা'হলে সেই টাকা থেকে তোমার কিছু উপকার হতে পারে।"

নরেন্দ্রনাথ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আরে শরৎ, আরে শশী, করিস্ কি? তোরা যে আমার জন্যে প্রাণ দিতে পারিস, তা আমি জানি। এ সব করতে হবে না।" এই বলিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। নিঃস্বার্থ ভালবাসা কাহাকে বলে এবং মহাপুরুষ কি করিয়া হয় দেখাইবার জন্য এই সামান্য গল্পটি উল্লেখ করা হইল।

লাটু মহারাজের জপ করিবার প্রণালী—একদিন শরৎ মহারাজ একটু অভিমান করে বললেন, "দেখছো হে লেটো শ্যালা সব চেয়ে উঁচিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা সব পেছনে পড়ে রইলুম। আমরা রাত্রিটা ঘুমিয়ে কাটাই আর লেটো শ্যালা সমস্ত রাত্রি জপ করে। শ্যালা আমাদের ফাঁকি দেয়।" উপস্থিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন,—"কি রকম করে?" শরৎ মহারাজ বলিলেন,—"প্রথম রাত্রে লাটু নাক ডেকে ভান করে ঘুমায় আর জপের মালাটি লুকিয়ে রেখে দেয়। সকলে যেমন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন লে'টা উঠে বসে আর জপ করতে সুরু করে। আমি একদিন মনে কল্লুম যে, ইঁদুর এসেছে, খুটখাট আওয়াজ কচ্ছে। যেমনি তাড়া দিই আর লেটো মালা ঘোরানো বন্ধ করে শুয়ে পড়ে, আবার খানিকটা পরে উঠে জপ করে। দু দিন এরকম দেখে আমার মনে সন্দেহ হল—এ ইঁদুর নয় লেটো শ্যালা জপ করে। আমিও একদিন ওঁৎ করে মিট্‌কি মেরে ঘুমের ভান করে শুয়ে রইলুম, দেখি না খানিক রাত্রে লেটো শ্যালা উঠে বসল তারপর জপ করতে সুরু কল্লে। আমি বল্লুম, 'তবে রে শ্যালা, আমাদের ফাঁকি দেবে! আমরা ঘুমিয়ে রাত্রিটা কাটাব, আর তুমি শ্যালা বসে মজা মারবে। দাঁড়া তো আমরাও ঐ কাজ কচ্ছি'।"

বাহিরের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠটি পর্দার আচ্ছাদন দ্বারা তিনটি ক্ষুদ্রতর ঘরেতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটিতে কালী বেদান্তী (স্বামী অভেদানন্দ) অধ্যয়ন করিতেন, দ্বিতীয়টিতে সারদা মহারাজ (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ), তৃতীয়টিতে যোগানন্দ স্বামী বসিয়া জপ করিতেন। বিভাগের পূর্বে এই গৃহে রাখাল মহারাজ ও অপরে বসিয়া

একান্তমনে জপ করিতেন। কিন্তু রাখাল মহারাজ বৃন্দাবনে যাওয়ায় অন্যেরা এখন ইহা ব্যবহার করিতেছেন। বড় যে গৃহটি তাহাতে সাধারণতঃ সকলে থাকিতেন।

সারদা মহারাজের বৈরাগ্যভাব—সারদা মহারাজের এই সময় নিরতিশয় বৈরাগ্য ও সাধনেচ্ছা বলবতী হয়। একদিন রবিবার, গ্রীষ্মকাল, বস্ত্রখণ্ডে ভাত ঢালিয়া সকলে খাইয়া লইয়াছেন; সারদা মহারাজ আসিলেন না। মহাপুরুষ শিবানন্দ স্বামী, কর্তা; তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। তিনি যাইয়া সারদা মহারাজের দ্বারে সজোরে আঘাত করিতে লাগিলেন সারদা মহারাজ ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনবরত জপ করিতেছিলেন—হয় ভগবৎলাভ, না হয় অনশনে দেহত্যাগ ব্রত। মহাপুরুষের অনেক ধাক্কাধুক্কি ও ডাকাডাকি করিবার পর সারদা মহারাজ দ্বার খুলিয়া দিলেন, কিন্তু আহার করিলেন না। কঠোর বৈরাগ্য ও সাধনায় উন্মত্ত। মহাপুরুষ মিষ্টবচনে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অবশেষে এই অবধার্য হইল যে, জপ ছাড়িয়া ভোজনে গমন ও প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত মহাপুরুষ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকিবেন। তাহা হইলে জপের কার্য হইবে। মহাপুরুষ অগত্যা তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া ভোজনগৃহে লইয়া গেলেন। সারদা মহারাজ অন্ন ও ব্যঞ্জন যাহা হইয়াছিল মুখে দিয়া জলের সহিত কোনও মতে গলাধঃকরণ করিলেন। এইরূপ পাঁচ-ছয় গ্রাসের পর দ্রুতবেগে স্বীয় গৃহাভিমুখে পলায়ন করিয়া পুনঃ জপে বসিলেন।

কালী বেদান্তীর ধ্যান করিবার প্রণালী—আর একদিনের আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। শনিবার, গ্রীষ্মকাল, বেলা তিন-চারিটার সময় কালী বেদান্তী কৌপীনমাত্র পরিধান করিয়া বারাণ্ডার শেষদিকে লম্বা হইয়া শুইয়া রহিয়াছেন। মেঝের খোয়াগুলি সব উঠিয়া গিয়াছে, তিন-চার ইঞ্চি ধূলি জমিয়া রহিয়াছে। কালী বেদান্তীর গাত্র ধূলিতে সমাবৃত, তিনি ধূলির উপর পদদ্বয় বিস্তৃত ও

চক্ষুদ্বয় মুদিত করিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন ; রৌদ্র, সর্বশরীরে পতিত হইয়াছে। বর্তমান লেখক তাঁহার নিকট স্থির হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। শায়িত ব্যক্তি নিশ্চল, নিস্পন্দ। দর্শকের মনে একটু ভয় হইল। তিনি ভিতরকার বড় প্রকোষ্ঠে যাইয়া যোগেন মহারাজকে বলিলেন, "কালী মরে কাঠ হয়ে গেছে।" যোগেন মহারাজ হাস্য করিয়া বলিলেন, "দুর শ্যালা, কালী মরবে কেন? কেলো শ্যালা এমনি করেই ধ্যান করে।"

শিবানন্দ ও শরৎ মহারাজের বিরহ ভাব—শনিবার, বর্ষাকাল, বৃষ্টি পড়িতেছে। বেলা সওয়া চারটে সাড়ে চারটার সময় বাহিরের বাগানের আমপাতাতে বৃষ্টি পড়িয়া ঝিম্ ঝিম্ শব্দ হইতেছে। বড় ঘরটির দক্ষিণের দেওয়ালের দিকে শিবানন্দ স্বামী ও একটু দূরে শরৎ মহারাজ অর্ধশায়িতাবস্থায় রহিয়াছেন। তখন মঠে লোক জন বিশেষ ছিল না। ম্যালেরিয়ার ভয়ে অনেকে এদিক্ ওদিক্ চলিয়া গিয়াছেন। শরৎ মহারাজ বিষণ্ণ হইয়া কি ভাবিতেছেন। তারকনাথের চোখটা জলে ভরা, হঠাৎ বলিলেন, "শরৎ, বাঁয়াটা ধর ত হা।" শরৎ মহারাজ পশ্চাদ্দিকের দেওয়ালের তাকের উপরিস্থিত পুস্তকগুলির পার্শ্ব হইতে বাঁয়াটি নামাইয়া লইলেন। মহাপুরুষের কণ্ঠধ্বনি একে ত অতি মিষ্ট ছিল তদুপরি প্রাণের আবেগে বিষাদের ভাবে মল্লার সুরে তিনি গান ধরিলেন—

হরি গেল মধুপুরী হাম কুলবালা।
বিপথ পড়ল সহি মালতী মালা॥
নয়নক ইন্দু তুমি বয়ানক হাস।
সুখ গেল প্রিয় সাথে দুখময় পাশ॥

গানটি গীত হইবার সময় কণ্ঠস্বর এরূপ কাতরভাবে ও হৃদয়-বিদারকভাবে নির্গত হইতেছিল যে, রাধিকার কৃষ্ণ অদর্শনে যে বিরহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা যেন চিত্রাকারে চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। দুইজনের গাল বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতেছে ক্ষণে ক্ষণে কণ্ঠস্বর

রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। শরৎ মহারাজ ঠেকা দিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু ভাবে গদগদ। এই বরাহনগর মঠের প্রত্যেক বস্তুরই স্মৃতি অতি পবিত্র, অতি মধুর। রামকৃষ্ণ-মিশন যে শক্তি এখন প্রকাশ করিতেছেন তাহা কাশীপুর উদ্যান ও বরাহনগর মঠেই সঞ্চিত হইয়াছিল।

হীরানন্দের আগমন—গ্রীষ্মকাল, বরাহনগর মঠ মাত্র পাঁচ ছয় মাস হইয়াছে। ভিতরের দালানে যাইতে যে একটি ক্ষুদ্র দ্বার ছিল তন্নিকটে কম্বল ও মৃগচর্মের আসন করিয়া নরেন্দ্রনাথ বসিয়া আছেন,—চতুর্দিকে রাখাল মহারাজ, হরি মহারাজ, শিবানন্দ স্বামী প্রভৃতি পাঁচ সাত জন বসিয়া আছেন,—হস্তে বৌদ্ধদিগের প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ, সকলে একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছেন। দিনটি রবিবার, বেলা সাড়ে নয়টা হইবে; বাগবাজারের তুলসীরাম ঘোষ এবং আরও কয়েকজন ব্যক্তি বাক্যালাপ আরম্ভ করিলে পাঠ বন্ধ হইল। এমন সময় মস্তকে পাগড়ি, হীরানন্দ নামক সিন্ধু প্রদেশস্থ হায়দ্রাবাদের জনৈক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন। হীরানন্দের বয়স বত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। তিনি বাংলা উত্তম জানিতেন, কেশব বাবুর (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন) নিকট লালিতপালিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বদেশ হইতে কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অন্বেষণে কাশীপুর উদ্যানে আগমন করিয়া সংবাদ পাইলেন যে, বরাহনগরের একটি স্থানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণ রহিয়াছেন। বহু অনুসন্ধানের পর হীরানন্দ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় নরেন্দ্রনাথের সহিত হীরানন্দের কথা আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনে হীরানন্দ যাইতেন। কেশব বাবুর বাটিতে তিনি একবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ও তাঁহার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি হীরানন্দের প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। এই সমস্ত কথা হইতে লাগিল।

কেশব সেন ও আরবী পাশা—অনন্তর কেশব বাবুর কথা উঠিল। হীরানন্দ বলিলেন, "যখন মিশর দেশের আরবী পাশা বন্দী-অবস্থায় কলিকাতায় আনীত হন, তখন আরবী পাশা কেশব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ

করিতে আসেন। আরবী ও ইংরাজীবিদ্ একব্যক্তি দ্বিভাষীরূপে মধ্যস্থ হইলেন। আরবী পাশা কেশব বাবুকে ধর্ম সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সন্তোষজনক উত্তর পাওয়ায় নিরতিশয় তৃপ্ত হইয়া সাহ্লাদে কহিলেন, 'যদি মুসলমান কেহ থাকে, যদি কোরান সম্মত কেহ ভক্ত, ঈশ্বরের প্রেমিক থাকে তাহা হইলে কেশব বাবুই ঠিক কোরান অনুযায়ী প্রকৃত ভক্ত মুসলমান। ভক্ত মুসলমানের সহিত পূর্বে কদাচ আলাপ হয় নাই'।" এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া হারানন্দ অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের চলে কি করে?" নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সকলেই মুষ্টি-ভিক্ষে করে নিয়ে আসে, তা'তেই একরকমে চলে যায়।" হীরানন্দের নিকট খুরচা ছয় আনা পয়সা ছিল। তিনি তাহা দিয়া বলিলেন, "এই পয়সায় এবেলা চলুক।" নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পয়সার আবশ্যক হবে না, এ বেলার মত চাল আছে।" অল্পক্ষণ পরেই ভজন ও কীর্তন আরম্ভ হইল। হীরানন্দ সেদিন তথায় থাকিয়া পরমানন্দ ভোগ করিয়াছিলেন।

যোগানন্দ স্বামীর ভিক্ষার গল্প—এই সময় সকলে সুবিধামত ভিক্ষায় বহির্গত হইতেন। যোগানন্দস্বামী বলিতেন, "একদিন আলমবাজারের একটা খোড়ো বাড়িতে ভিক্ষা করতে গেলুম। সকালে একটি স্ত্রীলোক মেটে দাওয়ার সম্মুখে উঠান ঝাঁট দিচ্ছিল। উঠানের সম্মুখে একটা নারিকেল গাছ। গেরুয়াধারী যুবাপুরুষ ভিক্ষে করতে এসেছে, মাথা নেড়া, শিখাও নেই, কণ্ঠিও নেই, কত্তাল বাজিয়ে হরিনাম করছে না, এ তো বৈরাগী বাবাজী নয়; তবে এ লোকটা কে? স্ত্রীলোকটি দেখে তো রেগে অগ্নিশর্মা; বললে—'যা মিন্সে, যা, এখানে ভিক্ষে পাবিনি; খেটে খেতে পারিসনি? দিনের বেলা ভিক্ষের ছলে সব ঘরদোরের সন্ধান নিয়ে যাবি, আর রাত্তিরে সিঁদ কেটে চুরি করতে আসবি।' এই বলে স্ত্রীলোকটি রাগে গর্ গর্ হয়ে নারিকেল গাছটার গোড়ায় শপ্ শপ্ করে ঝাঁটা মারতে লাগল। যোগেন

মহারাজ যদিও জমিদার সন্তান এবং মহা কৌতুকপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ভিক্ষুক, হাসিবার উপায় নাই। অগত্যা স্থিরচিত্তে তথা হইতে চলিয়া আসিলেন এবং মঠে পদার্পণপূর্বক নানাপ্রকার ব্যঙ্গচ্ছলে স্ত্রীলোকটির অভিনয় করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "মাগীটার আছে কি? একখানা খোড়ো ঘর, দু'খানা ছারপোকাওয়ালা ছেঁড়া কাঁথা, আর শতেক তাপ্পি মারা একটি তামার ঘটি।" শরৎ মহারাজ যখন মুষ্টিভিক্ষায় বহির্গত হইতেন, তখন তাঁহারও দুই একটি এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল।

যোগেন মহারাজের বৈরাগ্য ভাব—যোগেন মহারাজের বৈরাগ্য তীব্রতর হইয়া উঠিল। তিনি বরাহনগরের মঠ ত্যাগ করিয়া গঙ্গার তীরে তীরে আসিয়া, পাণিহাটিতেই হউক বা অল্প দূরেই হউক, নদীকূলে এক অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে বসিয়া রহিলেন। অতিশয় কঠোরতায় যদ্যপি শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু চক্ষুদ্বয় দীপ্তিপূর্ণ। প্রতিদিন প্রাতে স্ত্রীলোকেরা নিকটস্থ ঘাটে স্নান করিতে আসিতেন। একটি যুবক সন্ন্যাসী খালিগায়ে বৃক্ষমূলে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া স্ত্রীলোকদিগের মনে দয়ার উদয় হইল। কাহারও হস্তে গঙ্গাবারিপূর্ণ পাত্র, কাহারও বা কটিদেশে কলস; সকলে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীটিকে পরিবেষ্টনপূর্বক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"আহা, কার বাছা রে! আর কার ঘর অন্ধকার করে এসেছিস রে! কোন দিন খেতে পাস, কোন দিন খেতে পাস না! রোদ্দুর হিমে বাইরে পড়ে থাকিস! ওরে, তোর কষ্ট দেখে আমাদের বুকের ভেতর কেমন কচ্ছে যে রে! ওরে তোর মা যে আর ভাত মুখে দিতে পাচ্ছে না, তোর জন্যে বসে কাঁদছে যে রে!—যোগেন মহারাজ দেখিলেন, অনেক স্ত্রীলোক মিলিতা হইয়াছেন এবং ক্রন্দনের রোল তুলিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে দূর করিবার মানসে, বিরক্ত হইয়া বাংলাভাষায় যেন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও তাঁহাদিগের কথা কিছুমাত্র বোধগম্য হয় নাই এই ভান করিয়া হিন্দীতে বলিলেন, "ক্যা মায়ি,

তোম্‌লোগ্‌ ক্যা কহ্‌তি হ্যায় ?" ইহা শ্রবণমাত্র তাঁহাদের দয়াদাক্ষিণ্য সব উড়িয়া গেল। শ্লেষবচনে তাঁহারা কহিলেন, "আ-া-া মর্‌, মে-ে-ড়ো, মে-ে-ে-ড়ো ! চোখগুলো লাল লাল দেখছিসনি, গ্যাঁজা খায় ! আখমটা মিন্সে ! দিনের বেলা গেরুয়া পরে সন্নিসী সেজে বসে থাকে, আর রাত্তিরে চুরি করে। মুখে ঝ্যাঁটা-া মারি ; এটা হচ্ছে বদমায়েসের ইষ্টি।"—যোগেন মহারাজ ত এখন বাংলা বুঝেন না, সুতরাং অতিকষ্টে দন্তে দন্ত নিষ্পেষণপূর্বক কোনও মতে হাস্য সংবরণ করিয়া রহিলেন। অতঃপর বেলুড় মঠে এই প্রসঙ্গটি ব্যঙ্গসহকারে উত্থাপিত করিলে নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "যোগে দ্যাখ্‌, একই বলে Patriotism (পেট্রিয়টিজম্‌—স্বদেশপ্রেমিকতা)। মানুষ নিজের ভাষার লোককে ভালবাসে, অপরের ভাষার লোককে ভালবাসে না। দেখলিনি, তুই যেম্‌নি হিন্দীতে বললি, অম্‌নি তোকে মেড়ো ঠিক করে, মাগীদের ভালবাসা, স্নেহ সব চটে গেল। এই-ই হচ্ছে Patriotism-এর মূল।"

বাইবেল অধ্যয়ন—এই সময় বরাহনগর মঠে বাইবেল অধ্যয়ন সতেজে চলিতেছিল। যীশুখ্রীষ্ট একস্থলে স্বীয় শিষ্যদিগকে বলিতেছেন, Some are born eunuchs some have made themselvs eunuchs for the Kingdom of Heaven···। যোগেন মহারাজেরও মনে একটু প্রফুল্লতা আসিলে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী হেলনপূর্বক হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "জানিস শ্যালা, Some are born eunuchs and some have made themselves eunuchs for the kingdom of Heaven." সেই শুনে বর্তমান লেখক ব্যঙ্গসহকারে বলিতেন, "যাঃ শ্যালা, খোজা গোলাম।" যোগেন মহারাজ হাস্য করিয়া বলিতেন, "দেখবি শ্যালা দেখবি ! একবার যীশু কতকগুলো খোজা গোলাম করে জগতে ছেড়ে দিয়ে গেছল, আর জগৎটা তোলপাড় হয়েছিল। এবারও একবার কতকগুলো খোজা গোলাম করে বার করে দেওয়া হবে। দেখবি শ্যালা জগৎটা টল্‌মল্‌ করবে।" এই কথাটি তিনি মন একটু প্রফুল্ল হইলেই বলিতেন। খোজা

গোলাম বা সন্ন্যাসী, তাহারাই যে জগতের অনেক শুভকার্য করিবে ইহাই তাঁহার বক্তব্য ছিল।

শিবানন্দ স্বামীর তপস্যা—শিবানন্দ স্বামী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহ থাকিতেই মহা কঠোরী হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র দত্তের বাটিতে তিনি এবং নৃত্যগোপাল (জ্ঞানানন্দ অবধূত—রামচন্দ্রের মাতৃস্বস্রীয় ভ্রাতা ও নির্মলানন্দ স্বামীর মাতুল) হস্তে মস্তক রক্ষাপূর্বক সিঁড়ির উপর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠটিতে শয়ন করিতেন। শিবানন্দ স্বামীর একমাত্র সম্বল একখানি ডোরাকাটা কম্বল বা ধোসা ছিল। কিছুদিন তিনি রামচন্দ্র দত্তের কাঁকুড়গাছির উদ্যানে ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স পঁচিশ-তিরিশের ভিতর; দেখিতে অতি কৃশ, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম এবং শ্মশ্রুল, তাহাতে কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো কেশকলাপ ছিল। সর্বক্ষণই যেন অন্যমনস্ক, আত্মহারা ও বিভোর। চলিবার সময় তাঁহার একটি বিশেষ লক্ষণ লক্ষিত হইত। তিনি ভূতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া চলিতেন—দৃষ্টি পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অনতিদূরেই। তিনি ঐরূপভাবে সদাসর্বদা চলিতেন—কোনও উদ্দেশ্য বা কারণবশতঃ নহে। বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেব আপন শিষ্যদিগকে বলিতেছেন, "চলিবার সময়ে পাদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে অনতিদূরে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলেই ধ্যান স্বতঃই আইসে।" কিন্তু চলিবার সময়ে শিবানন্দের স্বভাবতঃই নতদৃষ্টি থাকিত। সর্বদা নগ্নপদে অবস্থানের নিমিত্ত পদদ্বয়ের গোড়ালি ফাটিয়া গিয়াছিল। পরিধানে একটিমাত্র কৌপীন ও একটি বহির্বাস ছিল এবং শীত ও গ্রীষ্মে সেই ডোরাকাটা কম্বলখানি তিনি ব্যবহার করিতেন। বাক্য অতি মৃদুস্বরে কহিতেন।

বৈরাগীবেশে নরেন্দ্রনাথের হরিনাম সংকীর্তন ও জনসমাগম—বরাহনগর মঠে কিয়দ্দিবস অবস্থান করিয়া যোগেন মহারাজ বৃন্দাবনে প্রস্থান করিলেন। তথায় বলরাম বাবুর কুঞ্জে (কালাবাবুর কুঞ্জে) কয়েকমাস থাকিয়া মঠে পুনরাগমনের পর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। বাবুরাম মহারাজ বলিতেন, "যোগে বৃন্দাবন থেকে ফিরে এল;

আনলে কতকগুলো তুলসীর মালা, একটা মালার ঝুলি আর তেলকমাটি। সকলের খাওয়া হলে প্রায় বারটা নাগাদ নরেন বললে, 'ওরে যোগে, শ্যালা ত বৃন্দাবনে গেছলি, দে শ্যালা আমাকে বৈরাগী সাজিয়ে দে।' সকলে মিলে নরেন্দ্রনাথকে কপালে তেলক, গলায় কণ্ঠি, হাতে ঝুলি, আর তা থেকে জপ করবার জন্য আঙ্গুল বার করে দিয়ে এক ঢং সাজায়ে দিলে। নরেন্দ্রনাথ প্রথম খানিকক্ষণ ব্যঙ্গ করে যেন কতই মালা জপ করছে—আওয়াজ করে বলতে লাগল, 'আ—ধা—কে—ত্তো—আ—ধা—কে—ত্তো—আ—ধা—কে—ত্তো', তারপর একটা গান ধরলে, 'নিতাই নাম এনেছে রে।' নাম কথাটা না বলে অপর একটা কথা বলে যোগেন মহারাজকে ভ্যাংচাইতে লাগিল। এই রকম কৌতুক, ব্যঙ্গ, হাসি চলছিল। অল্পক্ষণ পরেই হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের মুখভঙ্গি, কণ্ঠস্বর ও অবয়ব সম্পূর্ণ বদলে গেল, সিংহগর্জনে বলতে লাগল, 'বোল হরি বোল, হরি হরি বোল।' এর পূর্বে সকলে অসংযতচিত্তে বসেছিল, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের সিংহগর্জন শুনে সকলেই ত্রস্ত হয়ে পড়ল। অনতিবিলম্বে সকলে দাঁড়িয়ে উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন করতে লাগল। ঠাকুরঘর থেকে খোল করতাল এনে বাজাতে লাগল। কিন্তু অনবরত খোল বাজান এত দুরূহ হয়েছিল যে, পর্যায়ক্রমে তিনজনকে খোলটা ঘাড়ে করতে হয়েছিল, তবুও তাদের আঙ্গুলগুলো ফুলে গিয়েছিল। হরিনামের রোল আর নৃত্যেতে বাড়িখানি দুলতে লাগল, পড়ে যাবার উপক্রম। শশী মহারাজ তাড়াতাড়ি গিয়ে বাইরে থেকে ভিতরে আসবার যে দরজা, সেটা বন্ধ করে দিয়ে এল। অবিরাম হুঙ্কার-ধ্বনি, উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন! নরেন্দ্রনাথের এবং আর সকলের চোখ থেকে অশ্রুধারা পড়ে মুখ আর বুক ভেসে যাচ্ছে; কিন্তু নৃত্য-কীর্তন বন্ধ নাই। ক্রমে ক্রমে কীর্তনের রোল বরাহনগরের বাজার পর্যন্ত চলল। দোকান-পসারীরা দোকান বন্ধ করে দৌড়ে আসতে লাগল। নীচেকার উঠান সব লোকে ভরে গেছে, রাস্তায় লোক জমে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরকার বাইরের বারান্দায় কাতারে

কাতারে লোক দাঁড়িয়ে আছে। কেউ বা কীর্তন শুনবার ও দেখবার জন্যে দোরের ফাটলে চোখ দিয়ে স্থির হয়ে বসে রয়েছে। শশী মহারাজ ঠিক চারটার সময় ঠাকুরের বৈকালী দিতেন। অত কীর্তনের ভিতরেও শশী মহারাজ চট্ করে এসে ঠাকুরের বৈকালী দিলেন। আমি বাইরে এসে দেখি কিনা উঠানে কত লোক, রাস্তায় লোকারণ্য। তারপর দেখি যে বাইরের উপরকার দালানটা পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য। কীর্তন আরও খানিকক্ষণ চলে বন্ধ হল। লোকেরা সব বলতে লাগল, 'দাদাঠাকুর, এমন কীর্তন কখনও শুনিনি, এমন মধুর হরিনাম কখনও শুনিনি'।"

নরেন্দ্রনাথ ও অতুলবাবু—নরেন্দ্রনাথ বরাহনগর হইতে কলিকাতায় আসিলে কখনও বলরামবাবুর বাড়ি, কখনও গিরিশ বাবুর বাড়ি, কখনও বা ৭নং রামতনু বসুর গলির বাড়িতে গমন করিতেন। গরানহাটার চৌমাথা হইতে বরাহনগর বাজার পর্যন্ত গাড়িভাড়া এক আনা, এবং গাড়ির ছাদে বসিয়া যাইলে দুই বা তিন পয়সা লাগিত। নরেন্দ্রনাথ অনেক সময় অতি দরিদ্র ব্যক্তির ন্যায় গোড়ালি ফাটা নগ্নপদে, মলিন বস্ত্রে, কোঁচটা খুলিয়া গাত্রে জড়াইয়া কোচবাক্সে বসিয়া যাইতেন। একদিন তিনি এরূপ বেশে বাগবাজারের পুল পার হইয়া যাইতেছেন, হঠাৎ গিরিশ বাবুর ভ্রাতা অতুল বাবুর সম্মুখে পড়িলেন। অতুল বাবু তাঁহাকে সেই বেশে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরেন এ রকম ভাবে যাচ্ছ যে?" নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার মা মরে গেছে।" অতুল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে? কি ব্যামো হয়েছিল?" নরেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমার মায়া মরে গেছে।"—অর্থাৎ বিষয়বাসনা একেবারে ত্যাগ হয়ে গেছে। তিনি প্রায়ই এই কথাটি আবৃত্তি করিতেন—নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ। অতুল বাবু কিন্তু ভাবিলেন, 'সে কি? নরেন দুই দিন আগে বড় মানুষ ছিল, উকিল হচ্ছিল, ডেঁপো ইয়ার ছেলে; হঠাৎ তার এত শীঘ্র তীব্র বৈরাগ্য এল? এত জ্বলন্ত বৈরাগ্য যে, হুঁস পর্যন্ত নেই? দুজনেই

ত রামকৃষ্ণের কাছে যেতুম। হঠাৎ নরেনের এমন হল আর আমি হাইকোর্টে সেই ওকালতি করছি ?' অতুল বাবু তিন দিন কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বাগবাজারের খালের ধারে বা গঙ্গার ধারে বেড়াইতে লাগিলেন। পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া স্থির করিলেন, 'নরেন নরেনের কাজ করুক, আমি আমার কাজ করি। আমি ত আর নরেন নই।'

নরেন্দ্রনাথের উৎকটপীড়া ও তদুপলক্ষে তাঁর জননীর আগমন—এইরূপ কঠোর পথ অবলম্বন করায় এবং দুর্ভাবনা ও অনাহারের ফলে, ১৮৮৭ সালে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে, নরেন্দ্রনাথের এক উৎকট পীড়া হইল। জ্বর-বিকার—বড় ভয়ের কারণ হইয়া উঠিল। ভিতরকার বড় ঘরটিতে একটি বিছানায় তাঁহাকে রাখা হইয়াছে ; শুইয়া আছেন। চন্দ্র ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিয়া যাইতেছেন এবং নিকটে সারদা ও বাবুরাম মহারাজ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। নিরঞ্জন মহারাজ ঔষধাদি সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন। সকলেই শশব্যস্ত। নরেন্দ্রনাথ নিয়ম করিয়াছিলেন যে, বরাহনগর মঠে কোনও স্ত্রীলোককে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু বলরাম বাবু নরেন্দ্রনাথের মাতাকে সংবাদ দেওয়ায় তিনি নরেন্দ্রনাথের এক ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথের কিছু জ্ঞান আছে—কখনও নিস্তব্ধ—অর্ধ অজ্ঞানাবস্থায় বলিতেছেন, "এখানে কেন স্ত্রীলোককে ঢুকতে দিলে ? আমিই নিয়ম করলুম আর আমার বেলায়ই নিয়ম রদ হল ?" বাবুরাম মহারাজ কাছে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছেন। বড্ড গায়ের জ্বালা, রাত্রে ব্যামো বৃদ্ধি হইল, এবং নরেন্দ্রনাথের নাড়ীও একটু খারাপ হইল বাবুরাম মহারাজ আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। নরেন্দ্রনাথ জোর করে আত্মসংযমপূর্বক অস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কে ও কাঁদছে, বাবুরাম ? কাঁদিসনি, আমি এখন মরব না, তুই ভয় করিসনি। আমার ঢের কাজ করতে হবে, আমি কাজগুলো যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি, মরবার সময় নেই।" এই বলিয়া

আবার স্থির হইয়া গেলেন। ক্রমে ক্রমে পীড়া উপশম হইল এবং নরেন্দ্রনাথ সুস্থ হইলেন।

রামতনু বসুর গলির বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ ও কালী বেদান্তীর চা খাওয়া—১৮৮৭।৮৮ সালের মধ্যস্থলের শীতকালে একদিন নরেন্দ্রনাথ ও কালী বেদান্তী রামতনু বসুর গলির বাড়িতে সন্ধ্যার সময় আসিলেন। সেদিন তিথি ছিল একাদশী। ছু'জনে এর ওর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সকলে গল্প করলে, কিন্তু কেউ খেতে বলেনি। অভুক্ত অবস্থায় ছু'জনায় রাত্রি সাড়ে ন'টা দশটার সময় রামতনু বসুর গলির বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। সেখানেও তখন কিছু খাবার ছিল না, কারণ নরেন্দ্রনাথের পরিবারদিগের বড় ছুরবস্থা যাইতেছিল। আর নরেন্দ্রনাথও কিছু মুখ ফুটিয়া বলিলেন না। ঘরটি একতলা, এঁদোপড়া, মাটির সঙ্গে বসে গেছে; ঘরের উত্তর দিকে একটা পুকুর, খানিকটা বোজানো হয়েছে আর খানিকটা জল আছে। একজনকার গায়ের লেপও নাই, লুই ধোসা কিছুই নাই, শুধু কোঁচার কাপড় গায়ে। প্রথম একজন শুইয়া তামাক টানিতে লাগিলেন, আর বেদান্ত, অদ্বৈতবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষুধা ও শীত অদ্বৈতবাদ বোঝে না। কালী বেদান্তী বলিলেন, "ভাই নরেন, শীতে যে ঘুমুতে পারছিনি।" নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দূর শ্যালা, ঠেসাঠেসি করে শো, তাহলেই শীত কমে যাবে।" ছুইজনে পিঠে পিঠে ঠেসাঠেসি করে হাঁটুটি বুকে দিয়ে শুয়ে রইলেন। পৌষ মাসের শীত, রাত্রি ছুইটার সময় কালীবেদান্তীর বড় কষ্ট হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "থাক্ শ্যালা, উঠে বস্। তোর জন্য একটু চা করে নিয়ে আসি।" হুট্কো গোপাল একটা চীনামাটির Teapot (চায়ের কেটলি) একটা বাটি ও Saucer (ডিশ) দিয়ে গেছল। বোধ হচ্ছে সেইদিন বিকালে ঐ জিনিস এবং কিছু চাও দিয়া গিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ উঠিয়া হাতড়ে হাতড়ে একটা দেশলাই যোগাড় করিলেন, খুঁজিয়া খুঁজিয়া খান ছুই ঘুঁটে পাইলেন এবং কেরোসিনের ডিপে থেকে একটু তেল লইয়া উনুন ধরাইয়া জল গরম

করিতে বসিলেন। জোগাড় করতে ও উনুন ধরাতে রাত্রি সাড়ে তিনটা বাজিয়া গেল। চা পাবে এই প্রতীক্ষায় কালী বেদান্তীর শীতও অনেক কমিয়া গিয়াছে। হাঁটু দুটির উপর কাপড় জড়াইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন আর ইঁদুর চলে গেলে খুট করে আওয়াজ হওয়ায় মনে করছেন, ওই বুঝি চা এল! অবশেষে রাত্রি চারটা সাড়ে চারটার সময় নরেন্দ্রনাথ Teapot-এ করে চা আর বাম হাতে করে বাটি আর Saucer নিয়ে উপস্থিত। এসে কালীকে ডাকিতেছেন, "কিরে শ্যালা, জেগে আছিস?" কালী বেদান্তী বলিলেন, "আরে জেগে থাকব না ত ঘুম হল কখন, শীতে যে গা কালিয়ে যাচ্ছে।" নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "লে শ্যালা চা খা, গরম হবি।" তারপর একজন বাটিতে আর একজন Saucer-এ চা খেতে খেতে, এদিকেও ফরসা হয়ে এল। তখন দু'জনে প্রস্থান করিলেন।

নরেন্দ্রনাথের বাটিতে শিবানন্দ স্বামীর স্নান করা—১৮৮৮ সাল, কার্তিক মাসের সকালে একদিন নরেন্দ্রনাথ, শিবানন্দ স্বামী, গুপ্ত মহারাজ এবং আরও কয়েকজন রামতনু বসুর গলির বাটিতে আসিলেন। পরে কেবল তিনজন থাকিয়া আর সকলেই চলিয়া গেলেন। দিল্লীতে গা ঘসিবার যে 'গেজে' হয়, বর্তমান লেখক সেই গেজে আনিয়াছেন। তারকনাথ কলের জল দেখিয়া একজনকে বলিলেন, "ওহে একটা দাঁত মাজবার কিছু দিতে পার?" দাঁত মাজিবার একটা গুল্ দিলে, তারকনাথ ও নরেন্দ্রনাথ উভয়ে গুল্ দিয়া দাঁত ঘসিয়া কলে মুখ ধুতে লাগলেন। তারকনাথ আনন্দময় পুরুষ, তিনি বলিলেন, "ওহে অনেকদিন মুখ ধোয়া হয়নি, ভুলেই যাওয়া গিছল, তা যা হোক, আজ দাঁতটা ত মাজা হল।" বর্তমান লেখক তারকনাথকে কলের নীচে বসাইয়া হাতে সেই 'গেজে' দিয়া তাঁহার গা ঘসিতে লাগিলেন। গা ঘসিতে ঘসিতে গা হইতে কাদা-জলের স্রোত বহিতে লাগিল। তখন তাঁর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গায়ের চামড়া বাহির হইল। আর গুপ্ত মহারাজ সেই প্রকারে নরেন্দ্রনাথের গা ঘসিতে লাগিলেন। পায়ের

গোড়ালি একেবারে ফাটিয়া গিয়াছে, তলাও প্রায় তদ্রূপ, মাথায় তাম্রবর্ণ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের চেহারা অতি বিকট হইয়াছিল।

শ্মশানে বসিয়া জপ—হঠাৎ একদিন বরাহনগর মঠের সকলের মনে হইল যে, আজ শ্মশানে বসিয়া জপ করিতে হইবে। শ্মশানটি কাছেই; সকলে গিয়া শ্মশানে বসিলেন। সেই সময় ঘাটে একটা মড়া পোড়াইতে আসে শবদাহীরা ক্রমে ক্রমে চিতা সাজাইল; অগ্নিপ্রদান করিল এবং অবশেষে অগ্নি নিবাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু যুবক সন্ন্যাসীরা সেই একাসনে বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন। সেই সময় বৈরাগ্য ও সাধন-ভজনের এইরূপ প্রবল বন্যা চলিয়াছিল যে, দিক্-পবন হুঁস ছিল না। স্নানাহারের কোন ঠিক ছিল না, সর্বদা ধূলা-ছাই গায়ে মাখা। হলো ত গঙ্গায় গিয়ে একটা ডুব দিয়ে এলেন। তখন শরীর যেন একেবারে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া গিয়াছিল।

রামচন্দ্র দত্ত ও কালী বেদান্তী—বরাহনগর মঠ স্থাপিত হইবার পাঁচ-ছয় মাস পরে একদিন বৈকালবেলা কালী বেদান্তী ও লাটু মহারাজ বর্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া সিমলায় মধু রায়ের গলিতে রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে গেলেন। দক্ষিণদিকের মাঝের দরজার একটু দূরে কালী বেদান্তী বসিলেন, লাটু মহারাজ পশ্চিমের দেওয়ালের অর্থাৎ কাঁচের সার্সিওয়ালা তাকের কাছে, পিঠ দিয়া বসিলেন। রামচন্দ্র দত্ত দক্ষিণদিকে পিঠ করিয়া বসিলেন এবং বর্তমান লেখক দরজার নিকট বসিল। প্রথমে নানাপ্রকার সাদরসম্ভাষণ হইতে লাগিল এবং কথাবার্তায় সকলেই বড় প্রীত হইলেন। ক্রমশঃ গভীর বিষয়ের আলোচনা হইতে আরম্ভ হইল। কালী বেদান্তী বলিলেন,—তাঁহাকে (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে) আদর্শ রাখিয়া জপ, ধ্যান, সাধনা করিতে হইবে, ঈশ্বরলাভ করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত, উপনিষদ্ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রও পাঠ করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, নানা দেশের দর্শনশাস্ত্রে কে কি ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন তাহাও জানিতে

হইবে।" রামচন্দ্র দত্ত বলিলেন, "যখন তাঁকে দর্শন করা গেছে ও তাঁর কথা শুনা গেছে তখন আবার অন্য পড়াশুনার আবশ্যক কি? তিনি পূর্ণব্রহ্ম, অবতাররূপে আসিয়াছেন; তাঁহাকে দর্শন করিলে ও তাঁহার কথা শুনিলেই সব হবে; তপ-জপ ও শাস্ত্র পড়ার আবশ্যক নাই।" এই বলিয়া তিনি একটি গান ধরিলেন, 'ষড়্‌দর্শনে দর্শন মেলে না' ইত্যাদি। ক্রমেই কথা গরম হইতে লাগিল এবং দুইদলেই মহা জেদাজিদি আরম্ভ করিল। কথার কোন মীমাংসা হইল না, অবশেষে কালী বেদান্তী ও লাটু মহারাজ ফিরিয়া আসিলেন।

নরেন্দ্রনাথ ও কালী বেদান্তীর প্রতি কটাক্ষ—ক্রমে এই কথা ভক্তমণ্ডলীর ভিতর চলিল। কেহ কেহ বলিলেন, 'কালী, নরেন তাঁকেই মানত না, তাঁর মুখের উপরই তর্ক করত, ওদের বড় হামবড়াইয়ের ভাব। ওরা বই পড়বে, শাস্ত্র পড়বে, তবে তাঁকে বুঝবে। ভক্তের দল সেই সময় এই সমস্ত কথা বলিতে লাগিলেন এবং অনেকেই কালী বেদান্তীকে একটু কটাক্ষভাবে কথা কহিতে লাগিলেন। ইহার কিছুদিন বাদে গুপ্ত মহারাজ বরাহনগর মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে লইয়া প্রথমে একটু গণ্ডগোল হইয়াছিল। জনকতক বলিলেন, 'নরেন এখন আবার গুরুগিরি ধরেছে, সে পশ্চিমে গিয়ে চেলা করছে—সন্ন্যাসী করছে। তিনি কি তাকে গুরুগিরি করতে বলেছিলেন? তখন তাঁকেই মানত না, তাঁর মুখের উপর তর্ক করত। এখন ত দেখছি স্বয়ং গুরু হচ্ছে আর একটা দল পাকাচ্ছে।' আবার কেহ কেহ বলিলেন, তাঁর সময়কার লোক ভিন্ন আর কাহাকেও লাওয়া হবে না।' এইরূপ নানাপ্রকার অপ্রিয় কথা উঠিতে লাগিল। গুপ্ত মহারাজ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া একটু ভালবাসা পাবার জন্য এসেছিলেন; তাঁহার এই কথাগুলি মর্মে মর্মে লেগেছিল। এমন কি দেহত্যাগের একমাস পূর্বে তিনি এই কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহাতেই বোঝা গেল, কথাটা তাঁহার প্রাণের ভিতর কিরূপ লাগিয়াছল। কিন্তু এই সময় শরৎ মহারাজ এবং কালী বেদান্তী গুপ্তমহারাজের

দিকে থাকিয়া প্রাণপণে তাঁহার হইয়া কথা কহিয়াছিলেন এবং সর্বদা তাঁহাকে দেখাশুনা ও কিসে তাঁহার ভাল হয় সেই চেষ্টাই করিতেন। এইজন্য এই তিনজনের ভিতর বরাবর একটা প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল।

নরেন্দ্রনাথের ঠিকুজি দেখা—১৮৮৭ সালে নরেন্দ্রনাথ, যোগেন মহারাজ, শরৎ মহারাজ ও নিরঞ্জন মহারাজ একদিন সকালে রামতনু বসুর গলির বাড়িতে আসিলেন। গরম কাল, দিন বেশ গরম, পায়ে কাহারও জুতা নাই। শুধু-পায়ে চলিয়া চলিয়া পাগুলো সব ফেটে গেছে। শরীর কৃশ, গায়ে ধূলো-কাদা লাগা; ডুব দিয়া স্নান করেছেন কিন্তু গা না ঘসার জন্য গায়ে কাদা, ময়লা ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া রয়েছে। নরেন্দ্রনাথের কোঁচার কাপড়টি গায়ে দেওয়া এবং শরৎ মহারাজ ও যোগেন মহারাজ গেরুয়া পরা। সকলেই কৃশ। নরেন্দ্রনাথের মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়েছে, প্রায় তিন-চার ইঞ্চি মাথার চুল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, এবং ছাইভস্ম লাগানো চুলগুলি কটাপানা হয়ে গিয়েছে। নরেন্দ্রনাথ বর্তমান লেখককে বলিলেন, "ঠিকুজিখানা থাকে তো নিয়ে এস তো।" বর্তমান লেখক ঠিকুজিখানা আনিয়া দিলে তাহা লইয়া নরেন্দ্রনাথ পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে যোগে, দ্যাখ্ ঠিকুজির সঙ্গে আমার ঠিক মিলেছে! তাম্রবর্ণ কেশ হবে, ভস্মাচ্ছাদিত দেহ হবে, নিরাশ্রয়—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করবে ও উন্মাদ হবে।" তাহার পর আবার পড়িতে লাগিলেন, "দেখি দেখি, পরে কি লিখছে! ওরে, পরে যে এসব ভাল লিখছে রে! দ্যাখ্ শ্যালা, আমার ঠিকুজি হুবাহু মিলে গেছে রে। দ্যাখ্ আমার চুলগুলো তামাটে হয়ে গেছে, গায়ে সব ছাই-ভস্ম ময়লা। আবার এ লিখেছে, পাগল হবে; ঠিক ত পাগলই হয়েছি রে! পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর এর বাড়ি, ওর বাড়ি খেয়ে বেড়াচ্ছি। যা শ্যালা, যা হবার হোগ্‌গে; মরণের ত বড় ভয় ডর রাখি!" যোগেন মহারাজ বলিলেন, "নরেন, ঠিক ত সব মিলে গেছে! তবে এর পরের খবরটা দেখতে হবে।" খানিকক্ষণ এইরূপ হাসিতামাশা করিয়া

সকলে চলিয়া গেলেন। নরেন্দ্রনাথ শুধু বাড়িতে রহিলেন।

সকলেরই জ্বলন্ত বৈরাগ্য—সেই সময় নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুইমত হইয়াছিল। যাঁহারা অন্তরঙ্গ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পরিচিত, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। তাঁহারা দেখিতেন ও বলিতেন 'নরেন্দ্রনাথ অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন, অপর সকলের ঐরূপ তপস্যা করা সম্ভব নয়। কি ত্যাগ, কি বৈরাগ্য! কি জপ-ধ্যান, কি অধ্যয়ন, কি ওজস্বী বাণী আর গুরুভাইদিগের প্রতি কি ভালবাসা!' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তেরা তখন নরেন্দ্রনাথের তপস্যা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং মনে মনে ও প্রকাশ্যে নরেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রসংসা করিতেন। বাহিরের লোকের সাথে মিশিলে পাছে হৈ চৈ হয় সেইজন্য সকলেই তখন সাধারণ লোকের নিকট হইতে দূবে থাকিতেন। লোকের সাথে মেশামিশি বা কথা কহা অতি কষ্টদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল, এবং জপ-ধ্যানের বিশেষ অন্তরায় মনে করায় সাধারণ লোকের সহিত বিশেষ কেহ মিশিতেন না। সকলেই নিজেদের ভিতর থাকিতেন। তখন সকলেরই জ্বলন্ত বৈরাগ্য—'হয় ভগবানলাভ করিবেন, নয় দেহত্যাগ করিবেন।' ইহাই ছিল সকলের মুখের এবং অন্তরের কথা। সর্বদা মুখে এই কথাটি লাগিয়া থাকিত, 'তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) যে কত করেছিলেন, আমরা কি তার এক আনাও করতে পারব না?'

নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা—ইহাই হইল নিজেদের ভিতরকার কথা। কিন্তু সাধারণ লোকের ভিতর কথা উঠিল 'নরেনটা পাগল হয়ে গেছে, তার মাথাটা বিগড়ে গেছে। কি বকে যে তার মাথামুণ্ড নাই, আবার বলে বেদান্ত, অদ্বৈতবাদ··· আমরা ত কোন কালে এসব কথা শুনি নাই বাপু। আর শিখেছেন কতকগুলো বচনের ঝুড়ি। কাজকর্ম করবার নাম নেই, চাকরিবাকরি করবার নামগন্ধ মুখে নেই। এর বাড়ি, ওর বাড়ি পেট ঠেসে আসে, আর কাজের মধ্যে কতকগুলো ছোঁড়াকে বকিয়েছে। সেগুলোকে

নিয়ে কি রকম করছে সব—একটা কর্মনাশার দল করেছে।' যাঁহারা সংসারী লোক, টাকা রোজগার যাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁহারা এই সব কথা বলিয়া ঠাট্টা তামাশা, নিন্দা করিতে লাগিলেন। কালী বেদান্তী এইজন্য নূতন লোক দেখা করিতে আসিলে বলিতেন যে, "বাবা, কর্মনাশার দল, এখানে এস না ; এখানে এলে হাতে খোলা, মালা। এখান থেকে সরে পড়।" আর নিজের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া বলিতেন, "এ একের নম্বর কর্মনাশা।" কিন্তু এই বিদ্রূপ-বাক্যের ভিতর অপর একটা অর্থ থাকিত,—কর্মপাশ ছেদন করিতে হইবে, কর্মনাশ করিতে হইবে, কোন রকম বন্ধন আর থাকিবে না মুক্ত হইতেই হইবে। ইহাই ছিল তাহার পূরা অর্থ। আর সেইজন্যই কালী বেদান্তী এত হাসিতেন।

নরেন্দ্রনাথের পশ্চিমে গমন ও শরৎচন্দ্র গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ— ১৮৮৭ সালে শরৎচন্দ্র গুপ্ত (সদানন্দ স্বামী) প্রথম বরাহনগর মঠে আসেন। এই সময়ে শশী মহারাজ ঠাকুর পূজার কারণে সর্বদা মঠে থাকিতেন। আর বাকি সকলে কখন বরাহনগরে, কখন বা পশ্চিমে বা উড়িষ্যাদেশে চলিয়া যাইতেন। কোন্ মাসে কে কোথায় থাকিতেন, তাহার নিশ্চয় নাই, এই নিমিত্ত সময় নিরূপণ করিয়া সমস্ত কথা বলা অসম্ভব। বিশেষতঃ অনেক দিনের কথা, মাঝে মাঝে কিছু গোলযোগ হইতেও পারে। তবে যতটা স্মরণ আছে, সাধারণের বোধগম্যের জন্য একটা আভাসমাত্র দেওয়া যাইতেছে। ১৮৮৭ সালে নরেন্দ্রনাথ বরাহনগর হইতে পশ্চিমদিকে চলিয়া যান। পথে কেহ একখানি টিকিট কিনিয়া দিয়াছিল, কিন্তু খাবারের কোনও বন্দোবস্ত করিয়া দেয় নাই। যাহা হউক নরেন্দ্রনাথ হাত্রাস স্টেশনে গাড়ি থামিলে নামিয়া পড়িলেন। কিছু পরে যাত্রীরা স্টেশন ত্যাগ করিয়া যে যার গন্তব্যস্থলে চলিয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ একখানি বেঞ্চের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, অতিশয় বিষণ্ণ, চোখে যেন একটু একটু জল আসিতেছে—বেহুঁস, বাহিরের কোন দিকেই যেন মন নাই। একটা কি গভীর চিন্তায়

যেন মগ্ন। সেই সময় নরেন্দ্রনাথের মানসিক কষ্ট অত্যন্ত অধিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। স্টেশনের একটি কর্মচারি আসিয়া বলিল, "ক্যা বাবাজী! ইহাঁ পর কেঁও বৈঠা হ্যায়? যাওগে নেহী?" নরেন্দ্রনাথ উত্তরে বলিলেন, "হাঁ মহারাজ, জায়েঙ্গে। লেকিন কাঁহা জায়েঙ্গে, নেহি জান্‌তা।" এই বলিয়া আবার যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হইতে লাগিলেন। উপস্থিত কর্মচারিটি আবার বলিল, "বাবাজী, তামাকু পিওগে?" নরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "হাঁ মহারাজ! পিলাও তো পিয়েঙ্গে।" কর্মচারিটি জৌনপুরী বাঙ্গালী, তাঁহার ভাষাই হিন্দুস্থানী হইয়াছিল। হিন্দুস্থানীর স্বাভাবিক হিন্দী উচ্চারণ ও বাঙ্গালীর শেখা হিন্দী উচ্চারণ অনেক তফাৎ। এই নিমিত্ত কর্মচারিটি বলিল, "আপনি কি বাঙ্গালী?" নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ আমি বাঙ্গালী।" কর্মচারিটি বলিল, "তবে আর কোথায় যাবেন, আমি বাসায় একা থাকি, আমার বাসায় চলুন।" স্টেশনের কাছে এই কর্মচারি, শরৎচন্দ্র গুপ্তের বাসা। তিনি ইঁদারা হইতে জল তুলাইয়া দিয়া স্নান করাইয়া দিলেন এবং উপস্থিত কিছু খাইতে দিলেন। নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, এই যুবকটি স্টেশনের কর্মচারি,—পশ্চিমে বাঙ্গালী। শরীর খুব হৃষ্টপুষ্ট, বিবাহ করে নাই; প্রাণটা বড় সরল। নরেন্দ্রনাথ আপনা আপনি গান করিতে লাগিলেন, "সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম তুমি কেন অকারণ" ইত্যাদি। তাঁহার মুখের গানটি শুনিয়া উক্ত কর্মচারির যেন মুহূর্তে সব ভাব বদলে গেল—তাহার চাকুরি করা বা বাড়ি ঘরদোরের কথা যেন চিরকালের জন্য একেবারে মন থেকে দূর হয়ে গেল। বাবা, মা, ভাই, বোন, সকলই তার ছিল; কিন্তু সে তখন যেন অন্যপ্রকার হইয়া উঠিল। সংসারের কোন বিষয়ই যেন তার আর উপাদেয় বোধ হইল না।

শরৎচন্দ্র গুপ্তের সন্ন্যাস গ্রহণ—(স্বামী সদানন্দ)—সংসারের মায়া-মমতা বিস্মৃত হইয়া, গুপ্ত নরেন্দ্রনাথকে গিয়া সরলপ্রাণে বলিল, "আমার কি হবে? আমায় তুমি সঙ্গে করে নিয়ে চল।" নরেন্দ্রনাথ ঠাট্টা করিয়া আর একটি গান গাহিতে লাগিলেন, "বিদ্যা পেতে চাও

যদি চাঁদ, চাঁদমুখে ছাই মাখ, নইলে এইবেলা পথ দেখ।" বিদ্যাসুন্দরেতে হীরেমালিনী সুন্দরের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে, মুখ নেড়ে নেড়ে যেমন বলেছিল, নরেন্দ্রনাথও সেইরূপ নকল করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। গুপ্ত বাংলা ভাল জানিত না; "বিদ্যাসুন্দর" যে কি তাও জানিত না। সরলপ্রাণ—তাই তাড়াতাড়ি উনন থেকে কতকটা ছাই নিয়ে মুখে মেখে কিম্ভূতকিমাকার সেজে একেবারে নরেন্দ্রনাথের কাছে হাজির। নরেন্দ্রনাথ হেসে বলিলেন, "দূর শ্যালা, মুখে ছাই মেখে এলি কেন? গুপ্ত বলিল, "এই যে তুমি মাখতে বললে!" দুজনকার বয়স একই, তাই কিছু সময় ঐরূপ ঠাট্টা চলিল। তারপর গুপ্ত স্থির করলে—কাজকর্ম ছেড়ে সন্ন্যাস নিতে হবে। স্টেশন-অফিস থেকে নিজের মাহিনা ও যে টাকা জমা ছিল তাহা বুঝিয়া লইল। কাপড় গেরুয়া রঙে ডুবাইয়া লইল এবং হরিদ্বার হৃষীকেশে যাওয়া হইবে দুজনের মধ্যে এইরূপ স্থির হইল।

নরেন্দ্রনাথের শরৎচন্দ্র গুপ্তের পুটলি মাথায় লওয়া—গুপ্ত সন্ন্যাসী হইল বটে, কিন্তু বরাবর 'ammunition boot' পরিত এইজন্যে মোটা বুট জোড়াটা সঙ্গে লইল। ট্রেনে উঠিয়া সাহারানপুরে নামা হইল। তখন আর রেল হয়নি। সাহারানপুর হইতে হরিদ্বারের দিকে দুইজনে হাঁটিয়া চলিতে লাগিলেন। একটা পুঁটলিতে কাপড়, কম্বল ও পুরানো বুট জোড়াটা আছে; মনে করিল, সামান্য ভার, পুঁটলিটি হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যাইব। অনভ্যাসবশতঃ কিছু পরেই হাতে বেদনা অনুভব হইতে লাগিল, তখন পুঁটলিটি বগলে লইয়া হাতকে বিশ্রাম দিতে লাগিল। ক্রমে ডান বগল, বাঁ বগল করিয়া অবশেষে পুঁটলিটি অত্যন্ত বোঝা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ তখন গুপ্তর হাত হইতে পুঁটলিটি লইলেন এবং এহাত ওহাত করিয়া অবশেষে মাথায় রাখিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। পথ চলিতে চলিতে মুখে Bunyan's Pilgrim's Progress বই থেকে Slough of Despondency, Castle of Doubt, Giant Despair প্রভৃতি

উপাখ্যান তুলিয়া বলিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে হরিদ্বার হইয়া হৃষীকেশে দুইজনে আসিয়া পৌছিলেন। বহুবৎসর পরে গুপ্ত আহ্লাদ ও অভিমান করিয়া বলিত, "আরে তা না হলে কি স্বামীজী আমার গুরু হতে পারে,—অম্লানবদনে আমার পরা জুতা মাথায় করে নিয়ে চললেন! আর আমিও তখন এমনই হাবাগোবা যে, স্বামীজীর কথায় অতদূর অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি, স্বয়ং গুরু যে আমার পরা জুতা মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছেন তা আমার কিছুমাত্র খেয়ালই ছিল না। একমাত্র তাঁর কথার উপরেই আমার ষোলআনা মনটা পড়েছিল। একেই বলে স্বামীজীর অকপট ভালবাসা! আমি জন্মেছি স্বামীজীর সেবা করবার জন্য। আমি আর কিছু জগতে জানি না।"

হৃষিকেশ ভ্রমণকালে শরৎচন্দ্র গুপ্তের খিচুড়ি রান্না ও নরেন্দ্রনাথের আহার—গুপ্ত বলিত, "হৃষীকেশে গিয়ে একটা ঝুপ্‌ড়ীতে বসলুম। স্বামীজী বললেন, 'ওরে চলে চলে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; কিছু খেতে দিবি কি? আমার সঙ্গে তখন কিছু টাকা ছিল; আমি বললুম, 'হাঁ মহারাজ, খিচুড়ি পাকায়গা।' আমি খিচুড়ির বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম, স্বামীজী গঙ্গার দিকে গেলেন। খানিকটা পরে ফিরে এলেন। তখন যেন আর এক মূর্তি! বললেন, 'শ্যালা, তুই আমার পায়ের বেড়ি হলি। আমি সব ছেড়ে একা বেড়াচ্ছি, আবার তুই এক উৎপাত জুটলি; যাঃ শ্যালা, আমি আর থাকব না, চললুম।' এই বলিয়া স্বামীজী লছমন্‌ঝোলার দিক্ হয়ে পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলেন। জঙ্গলের ভিতর আর মানুষটি দেখা গেল না। আমিও ভ্যাবাচ্যাকা হইয়া বসিয়া রহিলাম। খিচুড়িও যেমন উনুনে বসানো ছিল, সেইরূপই পড়িয়া রহিল। আমি স্থির হইয়া বসিয়া ভাবছি? ঘণ্টাতিনেক পরে দেখি যে, স্বামীজী আবার ফিরে আসছেন, এসে বললেন, 'বড় ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু আছে র‍্যা?' আমি বললুম, 'খিচুড়ি ত বসানোই রয়েছে।' স্বামীজী বললেন, 'তুই এখনও খাসনি।' আমি বললুম, 'তুমি না এলে আমি কি করে

খাবো ?' স্বামীজী বললেন, 'দূর শ্যালা, তুই এক পায়ের বেড়ি হয়েছিস! আরে আমি চলে গেলুম—পাহাড় জঙ্গল পার হলুম, তারপর মনে হল, তোকে একা ফেলে এসেছি ; তুই বোকা হাবা, কি করতে কি করে বসবি, তাইতে আবার ফিরে এলুম।' আমরা দুজনে খাচ্ছি আর এই সব কথা হচ্ছে। আমি আহ্লাদ করে বললুম, 'তুমি যাবে কি, আমি তোমায় টেনে নিয়ে এলুম।' স্বামীজী একদৃষ্টিতে আমার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, মনে মনে কি ভাবিতে লাগিলেন, তারপর একটু হেসে বললেন, 'যাঃ শ্যালা'।"

পূর্বেই বলিয়াছি, গুপ্ত বরাহনগর মঠে আসিল। হৃষ্টপুষ্ট হিন্দুস্থানী যুবকের স্থায় চেহারা। একটু আড় বাংলা শুনিলেই বা অপ্রচলিত কথা শুনিলেই হাসিয়া লুটোপুটি ; এবং একে ওকে কথার মানে জিজ্ঞাসা করিত। সকলেই তাকে নকল করিবার জন্য ইচ্ছামত কথার উল্টা মানে করিয়া দেয়, গুপ্ত তাতে আরও হাসিতে থাকে। কারণ গ্রাম্য বাংলা বা হাসিকৌতুকের শব্দ সে কিছুই জানিত না।

বরাহনগর মঠে সদানন্দ স্বামী ও বসন্ত—সেই সময় বসন্ত বলে একটি ছেলে এলাহাবাদ থেকে আসিল ; কানে একটু কম শুনে, কিন্তু বলিষ্ঠ এবং বেশ হৃষ্টপুষ্ট। গুপ্ত ও বসন্ত হিন্দুস্থানী লোক। পরস্পরে হিন্দী কহিয়া শান্তি অনুভব করিত ; এবং মাঝে মাঝে বরাহনগরে মঠের সুমুখের উঠানেতে কোদাল পাড়িয়া লাউগাছ প্রভৃতি লাগাইতে লাগিল। মাস কতক থাকিয়া বসন্ত যে কোথায় চলিয়া গেল, তার আর কোনও খবর পাওয়া যায় নাই।

বরাহনগরের মঠের পৃষ্ঠপোষক—কিছুদিন পরে নরেন্দ্রনাথ আবার বরাহনগর মঠে ফিরিলেন। ১৮৮৬ সালের শেষভাগে বা ১৮৮৭-র প্রথমভাগে বরাহনগর মঠ বেশ জমিয়া উঠিল। এই সময় সুরেশ বাবু (সুরেন্দ্রনাথ মিত্র) খরচের অধিকাংশই দিতেন। প্রথমে যদিও মুষ্টি-ভিক্ষা করিয়া মঠ স্থাপন করা হইয়াছিল, কিন্তু সুরেশ বাবু কয়েক মাসের পর পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি রামঠাকুর রসুই-এর

কাছে ভাঁড়ারের সব খবর লইয়া তাহারই মারফৎ জিনিসপত্র পাঠাইয়া দিতেন। এই সময় কয়েকদিন মাষ্টার মহাশয় স্কুলের ফেরত মঠে যাইতেন। রাত্রিতে সেখানে থাকিয়া পরদিন প্রাতে বাড়ি ফিরিয়া আসিতেন। মাষ্টার মহাশয়ও অনেক পরিমাণে পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। শীত বেশী হওয়াতে বলরাম বাবু খান চার-পাঁচ সাদা ধোসা কিনিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ও অপর কয়েকজন কাহারও কাছে কিছু লইতেন না বা আবশ্যকীয় কোন জিনিস মুখ ফুটিয়া চাহিতেন না। সেই সময় মঠে চা আর তামাক খুব চলিতে লাগিল। জোয়ান বয়স, পেটে অন্ন নাই, আর সারাদিন জপ-ধ্যান বা নানা গ্রন্থের চর্চা, কাজেই শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িল। গুঁড়ো চা গরম জলে দিয়ে একটু কড়া করে নেয়, আর ঢক্ ঢক্ করে খায়, দুধ চিনির ত নামই নেই।

সকলের দিগম্বর অবস্থা—১৮৮৭ সালের গরমের শেষ ও বর্ষার প্রথম—নরেন্দ্রনাথ, নিরঞ্জন মহারাজ ও শশী মহারাজ প্রভৃতি ইহাদের মনে এক ভাব উঠিল। দুইখানি বা তিনখানি বহির্বাস ছিল, আর সকলের নিজের নিজের কপনি মাত্র। যে রাস্তায় যাইত সে বহির্বাস পরিয়া বাহির হইত, বাড়িতে থাকিলে তাহা পরিত না। অবশেষে কপনিও ছিঁড়িয়া গেল। কয়জন একেবারে দিগম্বর মূর্তি! শরৎ মহারাজ বোধ হয় তখন পাহাড়ে গিয়াছিলেন। সুরেশ মিত্র নরেন্দ্রনাথের সিমুলিয়া বাটির পাড়াপড়সী, বয়সে কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন এবং উভয়েরই বাটি সংলগ্ন। এইজন্য বিকালে সুরেশ মিত্র আসিলে, নরেন্দ্রনাথ বহির্বাসটা কোমরে চাপা দিয়া রাখিতেন, কিন্তু অপর সকলে সুরেশ মিত্রের সম্মুখে উদম নেংটা হইয়া থাকিতেন। ঐরূপ দিগম্বর ভাব প্রায় দুই-তিন মাস ছিল। কৌপীনের অভাব ততটা ছিল না; কি একটা সাধনার ভাব উঠেছিল তাহাতেই সকলে এ রকম হয়েছিল।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত ও চীফজাস্টিস্ পিকক্—এই সময় নরেন্দ্রনাথের 'গ্রেভেল স্টোন' বা পাথুরির ব্যামো হয়; ৭নং রামতনু বসুর গলিতে তিনি আসিয়া থাকেন। বড়ই কষ্ট বাড়িতে লাগিল,

যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। দুই-তিন দিন পরে নিরঞ্জন মহারাজ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্তকে ডাকিয়া আনাইলেন। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বাংলাদেশে চালান এবং মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতিকে শেখান। রাজেন্দ্রলাল দত্ত হাতে কিছু খাদ্যদ্রব্য না লইয়া রোগী দেখিতে যাইতেন না। তিনি বলিতেন, তা না হইলে রোগীর মন প্রসন্ন থাকে না। নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে আসিবার কালে নূতনবাজার থেকে একটা খুব বড় বেল কিনিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত ছিলেন নরেন্দ্রনাথের সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ঔষধ দেবার পর ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্ত তাকিয়ার উপর বসিয়া চশমাটা কপালে তুলিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন ও নানা বিষয়ে গল্প আরম্ভ করিলেন, বলিলেন, "দেখ আমার খুড়ীকে গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছে। কাল যদি তাঁর 'fire work' হয়, তাহলে আসতে পারবো না, নইলে আসবো।" নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের সময় ইংরাজ ও বাঙ্গালীতে কি রকম সদ্ভাব ছিল?" ডাঃ বলিলেন, "আমাকে এটর্নিশিপ্‌ পড়িবার জন্য আমার বাড়ির সকলে বলিল; আমি দিনকতক হাইকোর্টে বেরুলুম। একদিন চীফ জাস্টিস, স্যার বার্ন্‌স্‌ পিককের গাড়িতে বসে তাঁর সঙ্গে আসছিলাম। চীফ জাস্টিস বললেন, 'ওহে তুমি কি এটর্নিগিরি শিখছো?' আমি বললুম, 'আমি ছেড়ে দেবো, আইনের ও জোচ্চুরি কাজ আমার ভাল লাগে না।' পিকক্‌ অতি আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'তুমি ঠিক বলেছ, এ কাজ ভাল নয়। দেখ আমি চীফজাস্টিসগিরি করি। যখন একটাকে ফাঁসি দেবার হুকুম দিতে হয়, তখন আমি পাশের কামরায় গিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তারপরে 'রায়' দিই। আর ছ্যাখ গভর্নমেণ্টের চাকুরে; যখন গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু রায় দিতে হয়, তখন বড় ভাবনায় পড়ি, কি জানি উপরওয়ালা মনিবরা চটে যাবে। তা তুমি যে আইন ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছ, তাহা বেশ কথা।' পুনরায় তিনি নরেন্দ্রনাথকে বলিতে

লাগিলেন, "আমি মহেন্দ্রকে বলে এসেছি, কালকে খুড়ীকে একটু ঔষধ দিতে।" নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেন্দ্র কে?" ডাক্তার জোর করে বললেন, "ওই যে মহেন্দ্র সরকার।" এইরূপ নানাপ্রকার কাথাবার্তা হইতে লাগিল। যাহা হউক, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্তের ঔষধেতে নরেন্দ্রনাথের পাথুরি রোগ তখন উপশম হইল।

নরেন্দ্রনাথের ধৈর্যের পরীক্ষা—এই সময়টা নরেন্দ্রনাথের মানসিক ও শারীরিক কষ্ট দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছিল। গুরুভাইদের লইয়া উচ্চ উদ্দেশ্য করিয়া এক মঠ স্থাপন করিলেন। সেখানে মহাকষ্ট—অনাহার, অনিদ্রা, সকলেই বিবস্ত্র, বিকট, মলিন, পাংশুগুণ্ঠিত এবং রাত্রে শয়ন ধরণীতলে। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন অন্নাভাবে কাতর ও নিরাশ্রয়। জ্ঞাতিদের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা; অনেক অর্থের প্রয়োজন। আহার—এর ওর বাড়িতে ভিক্ষা করিয়া খাওয়া। চারিদিকে সকল লোকে বিদ্রূপ ও উপহাস করিতে লাগিল, 'নরেন পাগলা হয়ে গেছে; কি বলে, কি কয়, কথার মাথামুণ্ডু নেই। শঙ্কর, উপনিষদ্, পঞ্চদশী—ও আবার কি সব জিনিস হল। ঠাকুরদেবতার কথা নয়, যত সব বাজে কথা।' কারণ এ সময়ে বেদান্ত-গ্রন্থাদি পাঠ বিরল ছিল। বেদান্ত অদ্বৈতবাদ কাকে বলে, সাধারণ লোকে তাহা শুনে নাই। তাই লোকে নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথের পূর্বপরিচিত একটি বন্ধু একদিন বলিল, 'তাইত হে, নরেন্দ্র পাগল হয়ে বেরিয়ে গেল। এমন গানটা মাটি করে গেল; এত বচ্ছর গানটা শিখে গলা সেধে সব মাঠে মারা গেল।' এইরূপ চারিদিকে বীভৎস ও কটুবাক্য নরেন্দ্রনাথের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। সমস্ত দিনরাত জপ-ধ্যান করা—শরীরের প্রতি কোন লক্ষ্য নাই। গায়ে ধুলো-কাদা মাখা, বড় বড় নখ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া উড়ি খুড়ি চুল, তাতে কত ধুলো-কাদা রয়েছে; কোন হুঁশ নাই, কোন লক্ষ্য নাই, শরীর কৃশ হয়ে গেছে, চোখের কোল বসে গেছে। মনটা যেন শরীর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে। অনেক কষ্টে দেহের ভিতর মন আনিতে হইতেছে। ঘোর তীব্র বৈরাগ্য,

কঠোর তপস্যা, জগতের কোনই জ্ঞান নাই।

বর্তমান লেখকের বরাহনগরের মঠে গমন—একদিন ভাদ্র মাস, ১৮৮৭ সাল, বেলা চারটার সময় বর্তমান লেখক বরাহনগরে নরেন্দ্রনাথের কাছে যান। সিঁড়ি থেকে উঠে বাহিরের দিকে যে লম্বা দালানটা—নরেন্দ্রনাথ তথায় পায়চারি করিতেছেন—চক্ষু স্থির, ঊর্দ্ধে দৃষ্টি, কোন হুঁস নাই, অভ্যাস হিসেবে পাটা যেন আপনি চলিতেছে। কিন্তু নির্দিষ্ট উভয়কেন্দ্র হইতে পা ফেলা এক ইঞ্চি বেশী বা কম হইতেছে না; মুখ ভয়ঙ্কর তেজঃপূর্ণ, শান্ত ও তুচ্ছপ্রেক্ষ। আগন্তুক ব্যক্তি নরেন্দ্রনাথকে সামনে দেখিয়া অনেকবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন। নরেন্দ্রনাথের কোন সংজ্ঞা নাই, পাগুলো নির্দিষ্ট স্থানে কেবল গতায়াত করিতেছে।

ভাবরাজ্যে নরেন্দ্রনাথ—দেহ থেকে মন যেন অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছে। আগন্তুক ব্যক্তিটির একটু ভয় হইল। তিনি ভিতরকার দালানে গিয়া দেখিলেন, রাখাল মহারাজ, শরৎ মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ, আর অপর কয়েকজন দাঁড়াইয়া আছেন, মাঝের দোরটি ভেজিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সকলেই মহা উদ্বিগ্ন ও মহা সশঙ্কিত! আগন্তুক ব্যক্তি রাখাল মহারাজকে বলিলেন যে, নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার একটা বিশেষ কাজ আছে। রাখাল মহারাজ বিনীত, ত্রস্ত ও কাতর হয়ে বললেন, "ভাই তা তুমিই গিয়ে বলোগে যাওনা, আমরা কেউ এগুতে পাচ্ছি না, আজ নরেন কেমন হয়ে গেছে। তার সম্মুখে আজ আমরা কেউ যেতে পাচ্ছি না। নরেনের এমন ভাব পূর্বে কখন দেখি নাই। তুমি কোন রকম করে চেঁচামেচি করে নরেনের মনটা নাবিয়ে দাওগে যাও।" শরৎ মহারাজ ভালমানুষ লোক, সে ভয়ে বললে, "আরে ভাই, রাখালই যখন এগুতে সাহস করছে না, তখন আমি ওখানে এগুতে পারবো না। আর নরেন তুপুরবেলা থেকে বাঘের মত কি একটা হয়ে গেছে, আমরা সকলে ভয়ে কাঁপছি।" নিরঞ্জন মহারাজ শশী মহারাজ প্রভৃতি সকলে ওই কথা বললেন। সেই দিন, বেলা

দু'টো আড়াইটা থেকে নরেন্দ্রনাথের ঐরূপ ভাব হইয়াছিল। কয়দিন ধরিয়া অনবরত জপ-ধ্যান চলিতেছিল এবং সবিকল্প সমাধি, নির্বিকল্প সমাধি, সবিতর্ক সমাধি ও নির্বিতর্ক সমাধি প্রভৃতি বিষয় লইয়া নানা-প্রকার কথাবার্তা হইতেছিল। সেই সকল চিন্তা করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথের মন একেবারে উচ্চস্থানে উঠিয়া যায় এবং সমাধিস্থ হইবা-মাত্র অভ্যাস হিসাবে (বা Original impetus or Inertia of forces) পা আপনি চলিতেছিল।

ভগবান বুদ্ধের চংক্রমণ—কথিত আছে, বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা রাত্রে দ্বাদশ-নিদান উপলব্ধি করার পর সাত দিন ভগবান বুদ্ধদেব পাদচারণ করিয়াছিলেন; ইহার নাম 'চংক্রমণ'। তাহার পর শরীর কৃশ হওয়ায় দেহটি আপনি পড়িয়া যায়। বুদ্ধগয়ার মন্দিরে যাইতে ডানদিকে একটি ছোট প্রাচীরের মত রহিয়াছে এবং তাহাতে মাঝে মাঝে পদ্ম রহিয়াছে, এটাই সেই 'চংক্রমণ' স্থান। নরেন্দ্রনাথের ঠিক সেই ভাবই দেখা গেল; কিন্তু উভয়েই অতি উচ্চস্তরের মহাপুরুষ, চংক্রমণ কালে উভয়েরই মনে যে কি ভাব উদয় হইয়াছিল তাহা আমরা কিছু বুঝিতে পারি নাই। আমি সেদিন চোখে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

নরেন্দ্রনাথের চক্রংমণ ও সাম্য অবস্থায় প্রত্যাবর্তন—এদিকে প্রায় সন্ধ্যা হইতে লাগিল, আগন্তুক ব্যক্তিটিকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। তাই রাখাল মহারাজ প্রভৃতি সকলেই বলিলেন, "ভাই, তুমি এগিয়ে খুব চেঁচামেচি করোগে যাও, আমরা তোমার পেছনে পেছনে থাকবো, তুমি ভাই এই উপকারটি কর" ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—এরূপ উচ্চ অবস্থায় মন উঠিলে নরেন্দ্রনাথের দেহ থাকিবে না। এইজন্য সকলে এত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। আগন্তুক ব্যক্তিটি কাছে দাঁড়াইয়া খুব চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের কোন সংজ্ঞা নাই, পা যেমন চংক্রমণ করিতেছিল সেইরূপ করিতে লাগিল। আগন্তুক ব্যক্তি আওয়াজ উচ্চ করিলেন এবং গালমন্দ সুরু করিলেন, নরেন্দ্রনাথের

কোনই সংজ্ঞা নাই, পা পূর্ববৎ আপনিই চলিতেছে। অবশেষে সাত-আট মিনিট চীৎকার ও গাল দিবার পর নরেন্দ্রনাথের মন যেন পুনরায় অল্পে অল্পে শরীরের ভিতর আসিতে লাগিল। তখন যেন চক্ষু এই জগৎটাকে নূতন বলিয়া দেখিতে লাগিল—কোথায় অসীম অনন্ত ব্রহ্ম আর কোথায় বা খণ্ড আলো, অন্ধকার, বাড়ি, মাটি! নরেন্দ্রনাথ যেন জগৎটাকে প্রথম দেখিতেছিলেন ও কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। আবার পরক্ষণেই মনটা উপরদিকে উঠিয়া যাইতেছিল। দুইতিন মিনিট এই রকম দেখিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিতে সুরু করিলেন,—"কি অঃ, কি অঃ" আর চারিদিকে অনিমেষ-দৃষ্টিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছু যেন বুঝিতে পারিতেছিলেন না। ক্রমে ক্রমে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। আগন্তুক ব্যক্তিকেও কিছুমাত্র চিনিতে পারিতেছিলেন না; রাখাল মহারাজ দৌড়িয়া আগন্তুক ব্যক্তির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নরেন্দ্রনাথ এই দুজনকে যেন পূর্বে কখনও দেখেন নাই ও কিছুই যেন চিনিতে পারিতেছিলেন না, কেবল উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চোখ ও মাথা ঘুরাইতেছিলেন। মিনিট সাতেকের পর আবার আওয়াজ করিতে লাগিলেন—"কি অঃ, কি অঃ, কি অঃ।" যেন অতি কষ্টেতে মনটা জিহ্বা ও কণ্ঠে আনিতেছেন। তাহার পর আগন্তুক ব্যক্তি ও রাখাল মহারাজের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে অনেকটা সাম্য অবস্থায় এলেন। তখন একটু অপ্রতিভ বা চমকিত ভাবে আগন্তুক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"কিরে কখন এসেছিস?" কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ, শব্দ উচ্চারণ যেন অতি কষ্টে করিতেছেন, "একি সন্ধ্যা—অ্যা, অ্যা"—দশ-বারো মিনিটের পর আবার পুরাতন নরেন্দ্রনাথ হইলেন। কিন্তু অতি মধুরভাষী, কণ্ঠস্বর অতি মধুর ও হৃদয়স্পর্শী! ইহাকেই বলে সাম্যস্পন্দন (Rhythmical vibration)। মুখে যে প্রচণ্ড ভাব প্রস্ফুটিত হইতেছিল তাহা তিরোহিত হইল এবং সাধারণ মানুষের ন্যায় পুনরায় হইলেন। তাহার পর রাখাল মহারাজকে বলিলেন, "ওঃ রা—খা—ল,

কি করবার করে দিগে ; খামকা আমায় কেন বিরক্ত কচ্ছিস ?" মনটা নাবিয়ে দেওয়া ও কথা কওয়ানো রাখাল মহারাজের উদ্দেশ্য ছিল, তাহাই হইল। এই সময় শরৎ মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ, সকলেই দৌড়িয়া আসিলেন এবং নানা বিষয়ে কথাবার্তা কহিয়া নরেন্দ্রনাথের মনটা নাবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ঘটনাগুলি ঠিক পরে পরে সন্নিবেশিত হইল না। কারণ বহুদিনের কথা, আগুপেছু হইয়া পড়াই সম্ভাবনা ; তবে যতটা স্মরণ আছে, সাধারণের বোধগম্যের জন্য তাহা লিপিবদ্ধ করা হইল।

নরেন্দ্রনাথ ও তাহার সহপাঠী—একদিন নরেন্দ্রনাথ রামতনু বসুর গলির বাটিতে আসেন। জনৈক সহপাঠী, পথে দেখা হওয়ায়, সঙ্গে সঙ্গে আসিল। সহপাঠীটি বলিল, "তুই কেমন সাধু হয়ে গেলি, আর আমি বে-থা করলুম আর চাকরি করছি।" নরেন্দ্রনাথ বললেন, "দ্যাখ্, তোর দাদা যথার্থ একটা লোক ছিল, তাঁকে আমি এখনও শ্রদ্ধাভক্তি করি। তোর দাদা বে-থা করে নাই, তোর মা আর তোদের ভরণ-পোষণের জন্য ওকালতি করেছে। রাত্রে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মেডিকেল কলেজের রোগীদের শুশ্রূষা করেছে এবং দুই-চার জনকে নিয়ে বেশ একটা দল করেছিল। খুব জপ করত। মিনিট ধরে জপ করত। এক মিনিটও গাফিলতি করত না। ঠিক সময়টি হলে জপ করত। যদি ধ্যানস্থানে যেতে দেরী হত তাহলে রাস্তা থেকেই জপ করতে সুরু করত। দ্যাখ্, যদিও সে সাধারণসমাজের লোক ছিল কিন্তু তার ভিতরকার প্রাণটা সন্ন্যাসীর মত ছিল। বেশ সাধক ছিল রে, বেশ সাধক ! তুই শ্যালা তোর ভাইয়ের কোন খবরই রাখিসনি। এলবার্ট হলে তিনজনে মিলে হঠযোগ করছিল, কাজেই galloping phthisis হয়ে মারা গেল।"

নরেন্দ্রনাথ ও রাধাপ্রেম—সহপাঠীটি অতীব অপ্রতিভ হইয়া নিজেকে হীন মনে করিতে লাগিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই নরেন, ওই যে রাধা রাধা বলে, আর রাধাপ্রেমটা বলে, ওটা কি ?

স্ত্রীকে ভালবাসা কি সেই জিনিস, না অন্য কোন জিনিস?" নরেন্দ্রনাথ এতক্ষণ সখ্যভাব রাখিয়াছিলেন ও কৌতুকব্যঙ্গ করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি গম্ভীর হইয়া উঠিলেন; চোখ দুটি জলে ভরিয়া গেল, তাঁহার প্রাণে যেন ভক্তি-উচ্ছ্বাস অতি প্রবল হইয়া উঠিল। মাথা একটু ডান ধারে, বাঁ ধারে দোলাইতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ নীরব রহিলেন—তারপর ধীরে ধীরে মিষ্ট ভাষায় বলিতে লাগিলেন—"রাধা প্রেমটা কি জানিস? দেহজ্ঞান থাকতে সেটা হয় না রে? গরুর বাঁট থেকে দুধ দুইবার সময় বাঁটলোয় যে গ্যাঁজলা হয়, সেটাও জানিস শক্ত, তাতেও আঙ্গুল কেটে যাওয়া সম্ভব হতে পারে, কিন্তু রাধার প্রেম তার চেয়েও ঢের নরম, তার কোন জিনিসের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় না। দেহজ্ঞান থাকলে সে জিনিস বোঝা যায় না।" এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথ ঘাড়টা বাঁকাইয়া মাথাটা নীচু করিয়া অনেকক্ষণ স্থির, মৌনভাবে মনে মনে কি ভাবিতে লাগিলেন। সহপাঠীটির আর কোন কথা কহিবার সামর্থ্য রহিল না। প্রায় দশটা বাজে, অফিসে যেতে হবে, তাই পালাবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ওরূপ কথাও তার পক্ষে ছোটমুখে পাহাড় গেলার মত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন সহপাঠীটি বলিল, 'ভাই নরেন, আমি যাই, আফিসে যেতে হবে, আমার ডিউটি আছে।" নরেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "দূর শ্যালা, তোর কর্তব্য মার্তণ্ডে তোকে জ্বালিয়ে মারছে।" সে ব্যক্তি তাহার পর প্রস্থান করিল।

নরেন্দ্রনাথের অধ্যয়ন—নরেন্দ্রনাথ যখন রামতনু বসুর গলির বাটিতে আসিতেন ও এক বেলা থাকিতেন, তখন পার্শ্ববর্তী বাটি হইতে বঙ্গবাসীর ছাপা 'পুরাণ' লইয়া শুইয়া পড়িতেন। স্থির হইয়া শুইয়া পুরাণখানি লইয়া একমনে পড়িতেন। তখন যেন আর জগতের কোন খবরই নাই। অত অল্প সময়ের ভিতর বই পড়িতে খুব কম লোককেই দেখা যায়। একনিষ্ঠ, একচিত্ত হইয়া শুধু যেন পুরাণের পাতাগুলি একে একে উলটাইয়া যাইতেছেন! আর কোন সাড়া-শব্দ নাই, কোনদিকেই মন নাই। এইরূপে অল্পদিনের ভিতর অনেকগুলি পুরাণ:

পড়িয়া লইলেন। পাড়াতে মামী, মাসী সম্পর্কের অনেক রমণীরা আসিয়া জপ-ধ্যান, সাধন-ভজন সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিত। তিনি তাহাদিগকে স্ব স্ব ইষ্ট অনুযায়ী ও প্রকৃতি-পার্থক্য হিসাবে সাধন-ভজনের উপদেশ দিতেন। আর একদিন, শীতকাল, মেঘলা, ঝিম্‌ঝিমে বৃষ্টি হইতেছিল, নরেন্দ্রনাথ গিবন (Gibbon) লইয়া পড়িতে বসিলেন, সকালে পড়িতে বসিলেন দুপুরবেলা আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার আহারাদি করিয়া লইলেন। আবার পড়িতে বসিলেন, সন্ধ্যা হইয়া গেল, প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়া পড়িতে লাগিলেন। এইরূপে তিন দিনেতে চার খণ্ড 'গিবন' শুধুই পড়িয়া লইলেন না, সমস্তই কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেন। এমন অদ্ভুত স্মরণশক্তি ছিল যে, পরবর্তীকালে বক্তৃতার ভিতর 'গিবন' থেকে বলিয়া যাইতেন, অথচ ভুল হইত না।

গঙ্গাধর মহারাজ কথিত নরেন্দ্রনাথের পড়িবার প্রণালী—নরেন্দ্রনাথ মীরাটে থাকিতে তাঁহার পড়ার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছিল। গঙ্গাধর মহারাজ গিয়া লাইব্রেরি থেকে নরেন্দ্রনাথের জন্য অনেক বই আনিতেন, মোটা মোটা বড় বড় বই। আর সেই সব বই নরেন্দ্রনাথের পড়া হইলে তাহার একদিন দু'দিন পরে আনীত বইখানি ফেরত দিয়া অন্য নূতন বই আনিতেন। এইরূপে কিছুদিন চলিতে লাগিল। শেষে একদিন লাইব্রেরিয়ান ঠাট্টা করিয়া গঙ্গাধর মহারাজকে বলিল, "কি মশাই, আপনি যে বই নিয়ে যান, সেই বইয়ের রংচঙে বাঁধানো দেখতে, না পড়তে ?" গঙ্গাধর মহারাজ বলিলেন যে, তিনি স্বামীজীর জন্য বই লইয়া যান, তিনি বই সমস্তই পড়িয়া ফেলেন। লোকটি বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "তা ত বটেই,বুঝেছি।" গঙ্গাধর মহারাজ বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন কারণ তিনি নরেন্দ্রনাথকে প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসিতেন। এইরূপ ব্যঙ্গ-উক্তি তাঁহার পক্ষে অতি কষ্টদায়ক হইল। তিনি আসিয়া নরেন্দ্রনাথকে সমস্ত বলিলেন। নরেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "লোকটাকে ডেকেনিয়ে আসিস, কি করে পড়তে হয় দেখিয়ে দেবো। ছাখ, কেউ বা এক একটা কথা দেখে দেখে পড়ে, কেউ বা এক একটা Sentence

দেখে দেখে পড়ে, আর আমি পড়ি কি রকম জানিস? আমি প্যারাগ্রাফ দেখে পড়ি!" এই বলিয়া তিনি গঙ্গাধর মহারাজকে বলিলেন, "তুই বইটা ধর না, আমি বলে যাচ্ছি।" বইতে কি লেখা আছে, এমন কি সেই ভাষাতে তিনি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ ও উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলেই ইহাতে অতি আশ্চর্যান্বিত হইলেন। একাগ্রতা থাকিলে ও ভাবের সহিত তন্ময় হইলে মানুষের এরূপ হইয়া থাকে।

নরেন্দ্রনাথের পিতা মাতার স্মরণশক্তি—এ স্থলে এ কথাটা বলা আবশ্যক যে, নরেন্দ্রনাথের পিতা ও মাতা উভয়েরই অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল এবং উভয়েই লেখাপড়ার চর্চা খুব করিতেন। এইজন্য তাঁহাদের বংশে খুব প্রখর স্মরণশক্তিটা আছে। নরেন্দ্রনাথের পিতা যদিও এটর্নি ছিলেন, কিন্তু ইতিহাসে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং আরবী, পার্শী ও উর্দু, ভাষাতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ওকালতির সমস্ত কার্য সমাপন করিয়া অবসর পাইলে উর্দু, পার্শী বই লইয়া পড়িতেন। ১৮৮৪ সালে, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার রাত্রে উর্দু লিখিতে লিখিতে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে (Heartfail) তাঁহার মৃত্যু হয়। নরেন্দ্রনাথের মাতা ও মাতামহী উভয়েই বৃদ্ধা হইয়াছিলেন, কিন্তু অবসর পাইলে তিন-চার ঘণ্টা করিয়া পড়িতেন। লেখাপড়ার চর্চা করা ইঁহাদের বংশের একটা বিশেষ লক্ষণ। নরেন্দ্রনাথের মাতা বহু উপাখ্যান এবং বৈষ্ণবদিগের সমস্ত সঙ্গীত আবৃত্তি করিতে পারিতেন। এই সব কারণে নরেন্দ্রনাথের এত তীক্ষ্ণ মেধা হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথের শিবরাত্রির উপবাস—১৮৮৭ সালে নরেন্দ্রনাথ শিবরাত্রির উপবাস করিলেন। পূজ্যপাদ গিরিশ বাবু বলিতেন, "পাছে কেউ বুঝিতে পারে যে, নরেন উপবাস করিয়াছে এইজন্য একটা পান চিবাইয়া মুখটা লাল করিয়া এখানে এসে কথা কহিতে লাগিল। মনে করলুম নরেন কোন জায়গায় খেয়ে এসেছে, তাই খাবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করলুম না। দিনকতক পরে টের পেলুম যে, নরেন সেদিন

উপবাস করে শিবরাত্রি করেছিল।” গঙ্গাধর মহারাজ বললেন, “গিরিশ বাবুর ‘দক্ষযজ্ঞ’ সেই বছর বেরিয়েছে। তাহার মধ্য হইতে এই সঙ্গীতটি সকলে মিলে গাইতে লাগিলেন :—

“নাচে বাহু তুলে, ভোলা ভাবে ভুলে,
বব বম্ বব বম্ গালে বাজে।
রজত-ভূধর নিন্দি কলেবর,
শশাঙ্ক সুন্দর ভালে সাজে॥
প্রেমধারে ত্রিনয়ন ছল ছল,
ফণী ফন্ন ফণা, জাহ্নবী কল কল
জটা জলদজাল মাঝে॥”

গাইতে গাইতে ভাব খুব জমিয়া গিয়াছে, সকলে খুব তন্ময় হইয়া গিয়াছে। আমি (গঙ্গাধর মহারাজ) দেখিলাম, আমার বুকের ভিতর যেন একটা কি জাগিয়া রহিয়াছে। বিস্ময়ান্বিত হইয়া, বলিলাম, ‘ভাই নরেন, আমি যেন বুকের ভিতর কি একটা দেখছি!’ নরেন বলিল, ‘চুপ কর্, ঐ রকম হয়েই থাকে।’ তারপর আমাদের কীর্তনে শিবের নাম খুব চলিতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাবা ভারতী)—১৮৮৭ সালের বর্ষার প্রথমে, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (যিনি বাবা ভারতী নামে পরে পরিচিত হইয়াছিলেন) পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া বরাহনগর মঠের বড় ঘরটিতে রহিলেন। দিনটা বোধ হচ্ছে রবিবার নগ্নপদে চলিয়া তাঁহার পা'টা ফাটিয়া গিয়াছিল, পায়ে একটি পটি বাঁধা, পরিধানে গৈরিক বসন। পূর্ববঙ্গে কখন কোন্ স্থানে গিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানের কথা বলিতে লাগিলেন। লোকটির প্রাণ বড় সরল, কোন ঘোর-প্যাঁচ ছিল না। এইজন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তিনি বলিতেন, “একদিন স্টার থিয়েটারে বসিয়া অভিনয় দেখিতেছি, অভিনয় শেষ হইল; আমি, গিরিশ ঘোষ ও কৃষ্ণধন দত্ত তিনজনে মদ খেয়েছি, খেয়ে খেয়াল উঠল যে, দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মশাইকে দেখতে যাব।

একটা গাড়ি ভাড়া করা গেল, রাত্রি দেড়টা-দুইটার সময় তিনজনে বেরুলুম এবং যথাসময়ে ৺কালীবাড়ির ফটকের কাছে এলুম, ফটক বন্ধ, অর্ধেক রাত্রিরও বেশী হয়ে গেছে। দারোয়ানকে এক টাকা বকশিশ দেওয়াতে সে ফটকটা খুলে দিলে। আমরা ত তিনজনে ঢুকিয়াই পরমহংস মশায়ের ঘরের দরজায় চাপোড় আর কিল মারতে সুরু করে দিলুম, আর মাঝে মাঝে দানাই চীৎকার করতে লাগলুম। বুঝলুম পরমহংস মশাই জাগিয়া ছিলেন। তাড়াতাড়ি দোরটা খুলে দিলেন, আমরা তিনজন ঢুকে পরমহংস মশাইকে মাঝে করে দানাই নাচ সুরু করে দিলুম। কৃষ্ণধন শ্যালা বেরসিক। শ্যালা মদ খেয়ে গান ধরলে 'রাধে গোবিন্দ বল'। মাতাল জাতের বদনাম করে দিলে। এরকম নৃত্য ও কীর্তন করে ভোর বেলাতে চলে এলুম। কৃষ্ণধন বললে, 'দ্যাখ্, দক্ষিণেশ্বরের ঐ লোকটা যা, ওর মতন প্রাণের ইয়ার আর দেখিনি ; ও খুব উঁচু দরের ইয়ার।' অন্য সময়েতে গিরিশ বাবুও এই গল্পটি বলিয়াছিলেন এবং পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ পরে বলিয়াছিলেন যে, সে রাত্রে তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ঘরের মেঝেতে শুইয়া ছিলেন।

বাবা ভারতী, শশী মহারাজ ও শিবানন্দ স্বামী—সুরেন মুখুজ্যে পরামানিকের ঘাটে স্নান করিয়া আসিলেন এবং বেলা বারটার সময় সকলে উপস্থিত ডাল ভাত খাইতে লাগিলেন ; শশী মহারাজ 'পরমহংস মশাই' 'পরমহংস মশাই' করিয়া অনেকবার বলিতেছিলেন। সুরেন মুখুজ্যে শশী মহারাজকে অল্পবয়স্ক দেখিয়া একটু কঠোরভাবে বলিলেন, "কোন্ পরমহংস হে? পরমহংস ত অনেক আছেন।" শশী মহারাজ তাহাতে অন্তরে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া বাহ্যিক শান্তভাব রাখিয়া বলিলেন, "পরমহংস মশাই আর কাকে বলি, যিনি দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন —গুরু মহারাজ।" সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাই বল দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস।" যদিও সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়গত কোনও অবজ্ঞার ভাব পরমহংস মশাইয়ের উপর ছিল না, কারণ তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভক্তি ও সম্মান করিতেন, তথাপি কথাটা কিছু বেয়াড়া রকম হওয়াতে

সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, সে বিষয়ের কথা এবং পূর্ববঙ্গের যাত্রার বিষয়ের অনেক কথা এবং অনেক অলৌকিক ও আশ্চর্য বিষয় গল্প করিতে লাগিলেন। শিবানন্দ স্বামী সেই সব গল্পে কোনও কর্ণপাত না করিয়া, উঠিয়া গিয়া নিজের মনে জপ-ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ অপর সকলেও তদ্রূপ করিতে লাগিলেন। পরদিন তাঁহার একটি শিষ্য কাপড় লইয়া আসেন। শিবানন্দ স্বামী ও শশী মহারাজ আগন্তুক ব্যক্তিটিকে বিশেষ যত্ন না করিয়া, চলিয়া যাইতে বলেন এবং বলিলেন, "এখানে স্থান হইবে না।" কাপড়ের কথাটা ঠিক স্পষ্ট মনে পড়িতেছে না। কাপড় লইয়া কি একটা গোল হইয়াছিল। তারপর সুরেন্দ্রনাথ বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার শিষ্যকে অপমান করা আর আমার অপমান এক," ইত্যাদি আরও রোষপূর্ণ বাক্য তিনি বলিয়া পাঠান। শিবানন্দ স্বামী সে সকল কথা অগ্রাহ্য করিয়া, গোটাকতক ধমক দিয়া, যে ব্যক্তি খবর দিতে আসিয়াছিল বা পত্র লইয়া আসিয়াছিল তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাহার পর সুরেন মুখুজ্যে গিরিশ বাবুর বাটিতে মাসকতক ছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের মাষ্টার মহাশয়ের বাটিতে পান্তা ভাত খাওয়া—১৮৮৬ সালের বর্ষায় বা তাহার পর নরেন্দ্রনাথ এবং সঙ্গে আর একটি বা দুটি ভক্ত মাষ্টার মহাশয়ের বাড়িতে গেলেন। অতি গভীর বিষয়ে নানা কথাবার্তা হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথের হঠাৎ খেয়াল হইল, পান্তাভাত খেতে হবে। মাষ্টার মহাশয় ত অপ্রতিভ হইয়া, পান্তাভাত আছে কিনা কে জানে, এই ভাবিতে ভাবিতে বাড়ির ভিতর গিয়া দেখেন যে, বাড়িতে পান্তাভাত আছে। নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীগণ এই সামান্য তুচ্ছ জিনিস এত আনন্দ করিয়া খাইয়াছিলেন এবং সকলের কাছে গল্প করিয়া বেড়াইতেছিলেন যে, সামান্য পান্তাভাত খাওয়া অমৃত ভক্ষণের ন্যায় হইয়াছিল। এ আখ্যায়িকা এখানে বলিবার উদ্দেশ্য যে, তখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদের ভিতর এমন একটা ভালবাসা ছিল,

এমন একমন একপ্রাণ ছিল যে, আগন্তুক ব্যক্তিকে পান্তাভাত দিতে কুণ্ঠিত হইত না এবং আগন্তুক ব্যক্তিও তাহা পরম আনন্দ করিয়া খাইতেন, এবং সকলের কাছে আনন্দ করিয়া বলিতেন। ইহা কেবল পান্তাভাত ছিল না, শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রগাঢ় ভালবাসার জলেতে ভিজান ছিল —এইরূপ কথা পরস্পরের ভিতর শুনা যাইত। যীশুর অন্তর্ধানের পর তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে এইরূপ ভালবাসা ছিল আর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগণের মধ্যে ইহাও স্পষ্টভাবে লক্ষিত হইত। দু'দশ জন যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহারা ইহা বিশেষ অনুভব করিতে পারিবেন।

'চৈতন্যলীলা' দর্শন ও সংগীতের ভাবরাজ্যে নরেন্দ্রনাথ— ১৮৮৪ সালে গ্রীষ্মকালে 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় খুব চলিতেছিল। সহরে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবভক্ত ও ভক্তলোক সকলেই 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দর্শন করিতে যাইতেছেন। এমন কি নবদ্বীপ থেকে প্রসিদ্ধ গোঁসাইগণ আসিয়া 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। অভিনয় সম্বন্ধে একটা বড় পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছিল। ইহার পূর্বে এরূপ আন্দোলন হয় নাই। গ্রীষ্মকাল, শনিবার—বৈকালবেলা বাবুরাম মহারাজ ও অপর দুই-তিন জন এবং গৌরমোহন মুখার্জির গলির বাটিতে আসিলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে অভিনয় দেখিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন বাবুরাম মহারাজের বয়স তেইশ বৎসরের ভিতর। পাতলা রোগাপানা; রং গৌরবর্ণ— অতি ধীর বিনয়ী বালক, কোঁচার কাপড়খানি গায়ে দেওয়া এবং নগ্নপদ। আগন্তুক ব্যক্তিগণ ও নরেন্দ্রনাথ অনতিবিলম্বে অভিনয় দর্শন করিতে গেলেন।

সেই সময় নরেন্দ্রনাথ 'চৈতন্যলীলার' গান গাহিতেন :

"রাধা বই আর নাইকো আমার
রাধা বলে বাজাই বাঁশী।
মানের দায়ে সেজে যোগী,
মেখেছি গায় ভস্মরাশি ॥

কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে,
রাধা নাম বেড়াই সেধে,
যে মুখে বলে রাধে,
তারে বড় ভালবাসি ॥”

রাত্রে বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ এই গানটি প্রাণের ভিতর থেকে, নিজেদের অবস্থা প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সেই উল্লেখ করিয়া অতি মধুর করুণ স্বরে গাহিতেন। গানের প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক শব্দটি শ্রোতার গাত্র বিদ্ধ করিয়া অন্তর পর্যন্ত প্রবেশ করিত। যথার্থই ত গায়ে ভস্ম মেখে নগ্নপদে ভিক্ষুক হইয়া ভগবান লাভের জন্য পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন। সেইজন্য এই গানটি সেই সময়ের উপযোগী হওয়ায় লোকের পক্ষে বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ আর একটি চৈতন্য-বিষয়ক গান গাহিতেন এবং তাঁহার দু'চক্ষে অনবরত অশ্রু বিগলিত হইত ঃ

“তুমি দ্বারে দ্বারে নাকি কেঁদেছ
কত পাষণ্ড-তনয় কত কথা কয়
তবু নাকি প্রেম যেচেছ ॥”

নরেন্দ্রনাথ এই ভাবটি জীবনের সাধনার অঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনে মাদ্রাজে বক্তৃতা দিবার সময় ঠিক এই ভাবটি বিশাল রূপে পরিবর্ধিত হইয়াছিল। এইজন্য যখন এই দুই-কলি গাহিতেন, নিজের অবস্থা ও জীবনের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতেন।

ব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ বৈরাগ্যমূলক ভজনটি নরেন্দ্রনাথ, শরৎ মহারাজ, শিবানন্দ মহারাজ প্রভৃতি সকলেই অনবরত গাইতেন—

“মন চল নিজ নিকেতনে !
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে ?
বিষয়পঞ্চক আর ভূতগণ,
সব তোর পর, কেউ নয় আপন,

পর-প্রেমে কেন হয়ে অচেতন
ভুলিছ আপন জনে ?
সত্য-পথে মন কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন,
গোপনে অতি যতনে।
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ,
পথিকের করে সর্বস্ব শোষণ,
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী,
শম দম দুইজনে ॥
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থ-ধাম,
শ্রান্ত হলে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ
সে পান্থনিবাসিগণে ;
যদি দেখ পথে ভয়ের আকার,
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ,
শমন ডরে যাঁর শাসনে ॥"

বরাহনগরের মঠস্থাপনের অল্পদিন পরে শ্রদ্ধেয় গিরিশবাবুর 'বুদ্ধদেব-চরিত' অভিনীত হয়। তৎপ্রণীত বিখ্যাত গীত :

"জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই,
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই ?
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই, সদা ভাবি গো তাই ॥
কে খেলায় ? আমি খেলি বা কেন ?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন।
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর ?

অধীর—অধীর যেমতি সমীর
অবিরামগতি নিয়ত ধাই।
জানি না কেবা এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি কোথা নিয়ে যায়,
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়
এই আছে, আর তখনি নাই ॥
কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল ?
কে জানে কেমন কি খেলা হল।
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি,
যাই যাই কোথা—কূল কি নাই ?
কর হে চেতন, কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন ?
কে আছ চেতন, ঘুমায়ো না আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তমোনাশ, হও হে প্রকাশ,
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়
তব পদে তাই শরণ চাই ॥"

এই গানটি নরেন্দ্রনাথ হৃদয়ের অন্তর হইতে গাহিতেন। সঙ্গীত-কালে যেন এক বৈরাগ্যের হিল্লোল চারিদিকে প্রবাহিত হইত। শ্রোতৃ-বর্গের মন যেন রাগস্পন্দনের সহিত কোথায় উঠিয়া যাইত। নরেন্দ্রনাথ যখন এই গানটি গাহিতেন তখন যেন প্রত্যক্ষ স্পষ্ট কি একটা ভাব উঠিত ; লোক যেন মাতোয়ারা হইয়া উঠিত। শিবানন্দ স্বামীর কণ্ঠস্বর তখন বড় মধুর, বয়স অল্প, তিনিও ঐ গানটি নরম-সুরে অতি মধুরভাবে গাহিতেন। সাধারণ লোকে সুখ ও আমোদের জন্য গাহিয়া থাকে, কিন্তু সাধক নিজের জীবনটা ভগবান লাভের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন,

তাঁহার অন্তর হইতে জ্বলন্তরূপে আর এক ভাব উদয় হয় এবং শ্রোতৃবর্গের গাত্রে যেন সেই ভাবগুলি প্রলেপ লাগাইয়া দেয়।

নরেন্দ্রনাথের স্বরচিত গান ও সে সম্বন্ধে অতুলবাবুর অভিমত—

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে;
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর।
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্, বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥

এই গানটি স্বামীজী এই সময় রচনা করেন। গ্রীষ্মকাল, প্রাতে গিরিশবাবুর বাটিতে স্বামীজী গিয়াছিলেন এবং উপরকার ছাতের গরাদের কাছে বসিয়া গুনগুন করিয়া গানটি গাহিতেছেন। অতুলবাবু (গিরিশবাবুর ভাই) জিজ্ঞাসা কল্লেন, "হাঁ হে, এ গানটা নূতন দেখছি-যে, কার বাঁধা? মেজদাদার (গিরিশবাবুর) বাঁধা নয় ত?" নরেন্দ্রনাথ কোন কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। অতুলবাবু বলিলেন, "ওহে, ভাব করে একবার গাও না!" শুনিয়া মোহিত হইয়া অতুলবাবু বলিলেন, "এই গানটা যে বাঁধতে পারে, সে একটা বড় লোক—এই একটা গানের জন্য সে জগতে বিখ্যাত হয়ে থাকবে।" নরেন্দ্রনাথ মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন এবং কিছুই বললেন না। অতুলবাবুর গানটা এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি সকলকেই কাহার চরিত গান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে শরৎ মহারাজ ইহা নরেন্দ্রনাথের রচিত বলিয়া দিলেন। অতুলবাবু নরেন্দ্রনাথের তীব্র মেধাশক্তিতে আগেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু এই গানটিতে নরেন্দ্রনাথের যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আছে ও উপলব্ধি হইয়াছে, ইহা তাঁহার ধারণা হইল। এই সময়টা নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার অন্তেবাসী ও সতীর্থবাসীগণের

মধ্যে ঈশ্বরপ্রেমের এমন একটা উন্নত উন্মত্তভাব চলিতেছিল ও একটা জ্বলন্ত শক্তি উপলব্ধি হইতেছিল যে, কি জপ-ধ্যান, কি সাধন-ভজন, কি শাস্ত্রাদি পাঠ, কি ভজন-সঙ্গীত, কি হাস্যকৌতুক সবই যেন দেবভাবে পরিপূর্ণ ছিল। সব যেন এক তপস্যা—এক ঈশ্বর-উপলব্ধির ভিন্ন ভিন্ন পন্থা মাত্র। এইরূপ জ্বলন্ত ভগবান-উপলব্ধির প্রয়াস জগতে খুব কম দৃষ্ট হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথের হাতে জনৈক মুন্‌সেফের লাঞ্ছনা—গিরিশবাবুর 'বুদ্ধদেব-চরিত' রাত্রে অভিনীত হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথ—মাথা নেড়া, শুধু পা; রাত্রি-জাগরণ ও অনবরত জপধ্যান করায় শরীর কৃশ, চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল; গিরিশবাবুর উপরকার ঘরটিতে বারাণ্ডার দিকের দ্বারের মধ্যে যে স্তম্ভটি আছে তাহাতে ঠেস দিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। হাতে একটা কাগজ লইয়া কি দেখিতেছেন। অভিনয়ে যিনি বুদ্ধদেব সাজিয়াছিলেন তিনি, গিরিশবাবু ও নরেন্দ্রনাথের মাঝখানে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। এই সময় গিরিশবাবুর পূর্ব পরিচিত একজন মুন্‌সেফ সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। মুন্‌সেফটি বলিলেন, "হ্যাঁ হে গিরিশ, বুদ্ধ নাকি নাস্তিক ছিল, ভগবান মানিত না? আমি ইংরাজী পুস্তকে এই সব পড়েছি।" এই বলিয়া তিনি তাঁর ইংরাজী বিদ্যার পরিচয় দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু একটু ব্যঙ্গ করিবার এবং মুন্‌সেফটিকে বিশেষ আক্কেল দিবার ইচ্ছায় বলিলেন, (অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) "ঐ যে উনি বসিয়া আছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন না।" এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিলেন। তিনি গিরিশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও যুবকটি কে?" গিরিশবাবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন—"একটা ভিখারী, দুটি ভাতের জন্য এখানে বসে আছে।" এই বলিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন ও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। মুন্‌সেফটি ভিখারীর সঙ্গে কথা কহিব, এটা হীনতা, এইজন্য গম্ভীর মাতব্বরী-চালে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে, বুদ্ধ নাকি নাস্তিক ছিল?" নরেন্দ্রনাথ সব কথাই শুনিতেছিলেন, কাগজখানা

শুধু মুখটি আড়াল দিবার জন্য দু'হাতে ধরিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ পা দুটি ছড়াইয়া বসিয়াছিলেন। মুন্‌সেফ আসিলে তাহা গুটাইয়া লন নাই। ইহাতে মুন্‌সেফ একটু মনে মনে চটিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ চট্ করে উত্তর দিলেন, (অভিনেতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া "ঐ যে বুদ্ধদেব বসে রয়েছে, ওকে জিজ্ঞাসা করুন না!" কথাটা একটু ব্যঙ্গকৌতুকের ছলে বলিলেন। অভিনেতা নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ সম্মান করিতেন ও চিনিতেন। অভিনেতা ত্রস্ত হইয়া নরেন্দ্রনাথের প্রতি করজোড় করিয়া বলিলেন, "আমি কিছু জানি না, আমি মুখ্যু মানুষ, আমি থিয়েটারে সাজি, ভাঁড়ামো করি, এই পর্যন্ত।" গিরিশবাবু একটু একটু মুচকে হাসছেন ও তামাসা দেখছেন। মুন্‌সেফটি চটিয়া বলিলেন, "কি হে, বল না বুদ্ধের বিষয় কি জান!" নরেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গচ্ছলে হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, বুদ্ধ নাস্তিক ছিল, এটা নাকি 'হায়রে মজা শনিবার' কাগজে লিখেছে।" সেই সময় মাতালদের ভিতর একটা বোল উঠেছিল, 'হায়রে মজা শনিবার বড় মজার রবিবার'। নরেন্দ্রনাথ সেইজন্য ঠাট্টা করিয়া ঐ কথা বলিলেন। মুনসেফ অগ্নিশর্মা হইয়া চটিয়া উঠিয়া নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "কিহে—কি কর। কাজকর্ম কর না কেন?" ইত্যাদি আরও মাতব্বরী কথা বলিতে লাগিলেন, "কেবল গিরিশের অন্ন ধ্বংস করতে এসেছ? দেখছ সকলে হাসছে?" নরেন্দ্রনাথ চট্ করিয়া জবাব দিলেন, "আমার প্রতি কেউ হাসছে না, তোমার দুর্গতি দেখে হাসছে, তোমার ন্যাকামি বোকামি দেখে হাসছে।" মুন্‌সেফ একটা ভেতুড়ে ভিখারী ছোঁড়ার কাছে এরূপ অপদস্থ হইতেছেন ও সকলে হাসিতেছে, ইহা তাঁহার নিকট যেন বজ্রাঘাততুল্য বোধ হইল। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া নরেন্দ্রনাথের প্রতি দেখিতে লাগিলেন এবং কি উত্তর করিবেন তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। মুন্‌সেফকে শিক্ষা দেওয়াই গিরিশবাবুর উদ্দেশ্য ছিল। তাহা বেশ রীতিমত হইয়াছে দেখিয়া গিরিশবাবুর ভারি আহ্লাদ। তখন তিনি মুন্‌সেফকে বলিলেন, ওহে থামো থামো, ওঁর সঙ্গে অমন করো না।

এক সময়ে ওঁর বিষয় পরে বলব ” মুন্‌সেফও রেগে তর্‌তর্‌ করে চলে গেলেন।

শিবানন্দ স্বামীর চা দিয়া তর্পণ—একদিন প্রাতে বরাহনগরের মঠের বড় ঘরটিতে সকলে বসিয়া আছেন। নরেন্দ্রনাথ একটি বাটিতে রুক্ষ চা লইয়া খাইতেছেন।

শিবানন্দ স্বামী বাটিতে চা লইয়া কৌতুক করিতে লাগিলেন, 'সবরকমের তর্পণ হইয়াছে, চা দিয়া তর্পণ করিতে হইবে।' কারণ তিনি পূর্বে বুদ্ধগয়া গিয়াছিলেন এবং শুনিয়াছিলেন যে, দার্জিলিংএ ভুটিয়ারা চা দিয়া দেবতার পূজা-অর্চনাদি করে। শিবানন্দ মহারাজ আগ্রহ ও কৌতুক উভয়-মিশ্রিতভাবে চায়ের বাটিতে হাত দিয়া তর্পণের মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন—"অনেন চায়য়া" বর্তমান লেখক বলিলেন, "না, অনয়া চায়য়া।" শিবানন্দ স্বামী বলিলেন, "ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ।" তারপর নরেন্দ্রনাথ কথা তুলিলেন—নানা বিষয়ে শাস্ত্রের কথা উঠিল।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি—একজন বলিলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ঈশ্বর, ব্রহ্ম কিছু মানেন না। তিনি বোঝেন জগতের কল্যাণ, বিদ্যাচর্চা—ইহাই প্রধান। নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আরে, সে কখন হ'তে পারে? আগে ব্রহ্ম না জানলে, কেউ কি জগৎ বুঝতে পারে? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তাহলে যে ভুল পথ ধরা হয়। আগে জগৎ তারপর ব্রহ্ম—একি হয়? আর দেখ অত বড় লোক, ও কি কখন ভুল করে? ও নিশ্চয় আগে ব্রহ্মের জ্ঞান বা আভাস পেয়েছে, তারপর জগৎ ও ধর্ম বুঝেছে।" সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। আবার বলিলেন,—"ইউরোপে এখন সমাজ, দর্শন, জীবের উৎপত্তি এ সব নানা বিষয়ের তর্ক উঠছে। মহাভারতে এ সব বিষয় বহুকাল আগে তন্ন তন্ন করে বিচার করে গিয়েছে। ইউরোপ এখন যেগুলো করছে, হিন্দুরা আগে তা অনেক বিচার করে মীমাংসা করে গেছে। আমি সব বইগুলো পড়ে দেখলাম। একশো বছর পরে কি

হবে, তা যেন আমার চোখের উপর ভাসছে, যেন স্পষ্ট সব দেখতে পাচ্ছি।" কথাগুলি এমন গম্ভীর ও নির্ভীকভাবে বলিতে লাগিলেন যে, সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কথাগুলি অলীক বা অহঙ্কার-প্রসূত নয় যথার্থ ই যেন দেখিতে পাইতেছেন, ইহা স্পষ্টই যেন সকলের বোধ হইত লাগিল।

বাইবেল সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথের মন্তব্য—বাইবেলের কথা উঠিল। নরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"সাধারণ লোক, ভক্ত শ্রেণীর পক্ষে বাইবেলের ধর্মটি বেশ। অল্পতেই মোটামুটি ধর্ম ও ভক্তির পথ বুঝিতে পারে কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর অধিকারীর পক্ষে ইহা তত ফলদায়ক নয়। অনেক সময় বিভীষিকা ও বন্ধনের ভাব আনয়ন করে। বেদান্তই উচ্চ শ্রেণীর অধিকারীর পক্ষে ভাল।"

প্রেমানন্দ স্বামী কথিত নরেন্দ্রনাথের প্রথমভাগ পাঠ—একদিন নরেন্দ্রনাথ বলরাম বাবুর বাটিতে বড় ঘরটিতে বসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানা প্রথমভাগ নিবিষ্ট হইয়া দেখিতেছেন। তিনি প্রথমভাগের উপক্রমণিকাটি একমনে পড়িতেছেন ও চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন; মুখটি অতি গম্ভীর। বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, এখন আবার প্রথমভাগ পড়ছ নাকি?" নরেন্দ্রনাথ বিস্ফারিত-নেত্রে বাবুরাম মহারাজের দিকে দৃষ্টি করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আগে প্রথমভাগ পড়েছিলুম, এখন বিদ্যাসাগরকে পড়ছি?" বাবুরাম মহারাজ অপ্রতিভ হইয়া একটু দাঁড়াইয়া সরিয়া গেলেন।

নরেন্দ্রনাথের উচ্চাবস্থা ও বিচিত্র ভাবপ্রদর্শন (তুলসীরাম ঘোষ কথিত)—এই সময় নরেন্দ্রনাথ বলরাম বাবুর বাটিতে প্রায় থাকিতেন। সকলেরই সঙ্গে বেশ কথাবার্তা হাসিতামাসা করিতেন। কিন্তু এক এক সময় এমন গম্ভীর ও চিন্তান্বিত হইয়া উঠিতেন যে, তাঁহার মুখের তেজ, চক্ষের দৃষ্টি, ভাবভঙ্গি সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকেই কার্য-ব্যপদেশে গৃহটি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত। নরেন্দ্রনাথ তখন একটি ঘরে একাই বসিয়া থাকিতেন। নিজ মনে নিজেই কখনও পড়িতেছেন কখনও,

শূন্যদৃষ্টিতে রহিয়াছেন, কখনও বা ডানহাতের তর্জনী নির্দেশ করিয়া কাহাকে যেন কিছু বলিতেছেন, কখনও বা নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া সতেজে কোন ভাব প্রকাশ করিতেছেন, কখনও বা নিজের বিজয় হইল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বিধ্বস্ত হইল এইরূপ ভাবে মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, কখনও বা বিড়বিড় করিয়া অস্পষ্ট-স্বরে কি বকিতেন কিছু বুঝা যাইত না। আমি একদিন ইচ্ছাপূর্বক গৃহটি ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিলাম, (কিন্তু পুনঃ পুনঃ দেখিতে এত ভাল লাগিত যে অলক্ষিতভাবে আড়নয়নে মাঝে মাঝে দেখিতাম) এবং চিন্তায় বিঘ্ন না হয় এইজন্য খুব সাবধানে দূর হইতে দেখিতেছিলাম। এই সময় নরেন্দ্রনাথের মন বড় উদ্বিগ্ন ছিল। একটা মহাবিজয় করিবেন, না হয় দেহ রাখিবেন—কি যে তাঁর মনে চিন্তাতরঙ্গ উঠিতেছিল, তিনি নিজেই কেবল বুঝিতেন, আমরা ভাবভঙ্গি দেখিয়া অল্পমাত্র অনুভব করিতে পারিতাম।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ কথিত—একদিন সকালে নরেন্দ্রনাথ আসিয়া বসিল—বিভোর, কি যেন একটা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, দেহের কোন হুস নাই, জগৎকে ভ্রূপেক্ষ করিতেছে না। তাহার চেহারা ও মুখের ভাব দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। কোন কথা কহিতে পারিতেছিলাম না। নরেন্দ্রনাথ আসিয়া রাস্তার দিকের দেয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিল, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিতে আরম্ভ করিল,—"দেখ, জি, সি, আমার ভগবান লাভ করা হল না। আমি সব ত্যাগ করেছি, আমি সব ভুলেছি কিন্তু ঐ দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুনটাকে ভুলতে পারি না। ওই আমার যত কণ্টক হয়েছে।" গিরিশবাবু ভক্তলোক, তাঁহার পক্ষে গুরু বিস্মৃত হওয়া অতি কষ্টকর কথা। নরেন্দ্রনাথ এমন উচ্চ অবস্থা হইতে কথা কহিতেছিলেন যে, গিরিশবাবু বলিতেন, "আমি তার কিছুই জবাব করিতে পারিলাম না এবং তাহার কত উচ্চ অবস্থা তা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। যাহোক আমি চুপ করে রইলাম।"

কৌতুকপরায়ণ শিবানন্দ স্বামী ও বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদ—মহাপুরুষদিগের প্রসঙ্গ অতি তুচ্ছ হলেও তাহার ভিতর এত মাধুর্য ও মহত্ত্ব থাকে যে, পরবর্তী লোকেরা তাহা সাগ্রহে শ্রবণ করে। এইজন্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনা এইখানে সন্নিবেশিত হইল। নরেন্দ্রনাথ কালী বেদন্তী ও হরি মহারাজ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের বিষয় আলোচনা ও বিচার করিতেন। বড় ঘরটি যেন একটা তেজে সদাসর্বদা পরিপূর্ণ থাকিত; জপ ধ্যান ও বিদ্যাচর্চা অনবরতই চলিতেছিল। এই সময় নরেন্দ্রনাথ রামায়ণ, মহাভারত এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয় কয়েকদিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছিলেন। শিবানন্দ স্বামী কঠোর জপ ধ্যান করিতেন, চক্ষু ঢুলু ঢুলু বিভোর, মাঝে মাঝে হাসিতেন। তিনি তখন বড় কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন। মাইকেলের কথাবার্তা শুনিয়া একদিন তাঁহার মনে খেয়াল লইল, বাংলা ভাষার সংস্কার করিতে হইবে। তিনি আরম্ভ করিলেন, "দ্যাখ্, বাংলা ভাষায় একটি ক্রিয়াপদের সহিত দুই-তিনটি শব্দ সংযোগ না করিলে ক্রিয়া হয় না। ওরূপ চলিবে না। অন্যশব্দ সংযোগ না করিয়া একটিমাত্র ক্রিয়াপদেতেই ভাব প্রকাশ পাইবে।" তিনি দাঁড়াইয়া কোমর কিঞ্চিৎ সামনের দিকে বক্র করিয়া ডান হাতের তর্জনী সম্মুখে চালিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কেন, ইংরাজীতে হয়, বাংলায় হবে না কেন? এক-কথায় ক্রিয়াপদ করিতে হইবে।" একজন কৌতুক করিয়া বলিল, "মহাপুরুষ, আলুর দম করতে হবে। এটা এক কথায় কি করে হবে?" তিনি মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন, বলবে, আলুটা—দমিয়ে দাও। দাঁড়াও দাঁড়াও লুচি ভাজ্‌বে কথাটা এক কথায় করতে হবে। আচ্ছা, লুচিটা লুচ্চাইয়া দাও।" এই বলে নিজে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন—"আরে, ছি ছি—এযে বেখাপ্পা হয়ে গেল, এক আধটা চলবে না।" আর সকলেই বিদ্রূপ করিয়া আরম্ভ করিল—"মহাপুরুষ তামাকটা তাম্‌কাইয়া দিবেন।" সম্মুখে গুপ্ত বসিয়াছিল, "ওরে গুপ্ত, তামাকটা তাম্‌কাইয়া দে না।" (অর্থাৎ

তামাকটা সেজে খাওয়া না একটু) এই সকলের হাস্য কৌতুক সুরু হইল।

একটি সামান্য কথা বা কার্য যদি প্রাণের ভিতর থেকে হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা চিরকাল স্মরণ থাকে; এই নিমিত্ত একটি সামান্য ঘটনা এখানে বিবৃত করিলাম।

নরেন্দ্রনাথের পেটের অসুখে গুরু-ভাইদের সেবা—বরাহনগর মঠের প্রথম সময়েতে নরেন্দ্রনাথের এক সময় বড় পেটের অসুখ করে, কিছুই পেটে হজম হয় না, অনবরত পেট নামাইতেছে। শরৎ মহারাজের পিতার একটি ডাক্তারখানা ছিল। বৌবাজারের "Imperial Druggists' Hall" উহারই পিতার ছিল। তখন নূতন ঔষধ বলিয়া শরৎ মহারাজ 'Fellow's syrup' এক শিশি আনিয়া নরেন্দ্রনাথকে রামতনু বসুর বাটিতে দিয়া গেলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন বাটিতে ছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল মহাশয় তখন Government Stationary Office-এ সামান্য কেরাণী ছিলেন। অবস্থা টানাটানি কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আফিসের ফেরত সন্ধ্যার সময় একটি হাঁড়ি করিয়া নূতনবাজার হইতে মাগুর মাছ লইয়া গেলেন। জিনিসটা অতি সামান্য হইলেও এত প্রগাঢ় ভালবাসা হইতে সান্যাল মহাশয় দিয়া গিয়াছিলেন যে বর্তমান লেখকের অদ্যাপি তাহা স্মরণ আছে।

নরেন্দ্রনাথের নিকট বলরাম বাবুর আক্ষেপ ও নরেন্দ্রনাথের সান্ত্বনা দান—একদিন বলরামবাবু বোস-পাড়ার বাটিতে সিঁড়িতে উঠিয়া ডানদিকের ছোট ঘরটিতে বসিয়া আছেন। মাঝে একটা টেবিল, পশ্চিমদিকে একখানা তক্তপোষ পাতা, তাহাতে নরেন্দ্রনাথ একটি ছোট হুকাতে তামাক খাচ্ছেন। যোগেন মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ, বর্তমান লেখক ও কালীবেদান্তী এদিক্ ওদিকে রয়েছে। গরমি কাল, বেলা নয়টা সাড়ে-নয়টা হবে; বলরামবাবু আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, "এই যে তোমরা স্বামী মহারাজ রয়েছ, তোমরা পরমহংস মহাশয়ের কাছে গেলে, আমিও গেলুম, তোমরা তখন অনায়াসে গৃহত্যাগ করলে,

সন্ন্যাসী হলে, জপধ্যান নানা প্রকার কচ্ছ, আর অল্প দিনের ভিতর কত উন্নত হয়ে যাচ্ছ, আর আমি যে বদ্ধ জীব ছিলাম, তাহাই রহিয়াছি, আমার কিছুই হল না।" এইরূপ অনেক খেদ করিতেছেন ও নরেন্দ্রনাথের কাছে মনের কষ্ট জানাইতেছেন। নরেন্দ্রনাথ ছোট হুকাটি ডানহাতে লইয়া তামাক টানিতে টানিতে বাম পায়ের উপর ডান পা রাখিয়া ঝুঁকিয়া বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বড় বড় চক্ষু গম্ভীরভাবে বলরামবাবুর দিকে ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ বলরাম, তোমরা তিন পুরুষ ধরে যে, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, বৈষ্ণবসেবা করে আসছ, সেই পুণ্যের ফল কি ক্ষয় হবার? এই পুণ্যের ফলে তুমি এত বড় মহাপুরুষের, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের, সেবা করিবার অধিকার পাইলে। ইহাই তোমার পূর্বপুরুষদিগের পুণ্যের ফলে হইয়াছে, ইহাই তোমার বংশের গৌরব থাকিবে। তোমার ত্যাগ-বৈরাগ্যের কোন আবশ্যক নাই। কঠোর তপস্যারও কোন আবশ্যক নাই। এই পুণ্যের ফলেতে এত বড় মহাপুরুষের সেবা কচ্ছ, এত বড় মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছ। জানত তিনি তোমার বাড়ি এসে থাকতে ভালবাসতেন এবং তোমার জিনিস আদর করিতেন। তুমি আর কি স্বর্গ, মুক্তি চাও? ইহাই ত পর্যাপ্ত হয়েছে!" কথাগুলি গম্ভীর ও তেজে কহিতে লাগিলেন এবং নূতনদিক্ দিয়া শেষে দেখাইলেন যে, জপধ্যান তপস্যা করাও যা, আর বলরামবাবু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যে সেবা করেছিলেন তা' দুইই এক। নূতনভাব দেখিয়া সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইল ও বলরামবাবুর লোকেরা গিয়া মহা আনন্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে আর আনন্দ ও হাসি ধরে না। তিনি নানারকম অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা না হলে, হে নরেন, তোমায় চাই কেন!" সেইদিন উপস্থিত সকলের ভিতর একটা মহা আনন্দস্রোত উঠিল এবং কথাটা মুখে মুখে অনেক দূর চলিয়া গেল।

রাখাল মহারাজের সহিত নরেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ করা—রাখাল মহারাজ এই সময় বলরামবাবুর সহিত কোঠার, ভদ্রক ও ৺পুরী গমন করেন।

এইটি তাঁর প্রথম ৺পুরী যাত্রা। ফিরিয়া আসিবার সময় আবলুস কাঠের একটা গাট্টিদার নলচে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক রকম কাজ করা ছিল। রাখাল মহারাজ এই নলটি লইয়া রামতনু বসুর গলির বাটিতে নরেন্দ্রনাথকে দিয়া তামাক খাওয়াইলেন। নরেন্দ্রনাথ পাইয়া খুব খুসী। তারপর বলরামবাবুর বাড়িতে রাখাল মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "কি রে! তুই পুরী গেছলি, জগন্নাথ দেখলি?" রাখাল মাহারাজের বয়স তখন অল্প, জগন্নাথ দর্শন করিয়া ভাবাবেশ হওয়ায় তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ রাখাল মহারাজকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য উল্‌টো দিকে কথা কহিতে লাগিলেন,—"কি রে শ্যালা, জগন্নাথের বড় বড় খত্তালের মত চোখ দেখে তুই নাকি ভয়ে কেঁদে ফেলেছিলি? দ্যাখ্ এ রকম চোখ না?" এই বলিয়া নিজে মুখভঙ্গি করিয়া দেখাইতে লাগিলেন এবং "তুই ভয়তরাসে কি না তাইতো কেঁদে ফেললি" ইত্যাদি বলিয়া আমোদ ও কৌতুক করিতে লাগিলেন। গুড়গুড়ির কথা উল্লেখ করিবার এই প্রয়োজন যে, রাখাল মহারাজের তখন তীব্র বৈরাগ্য,, কোন জিনিস চাওয়া বা গ্রহণ করিতেন না। অধিকাংশ সময় মৌনাবলম্বন করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া জপ করিতেন। বিশেষ আবশ্যক না হইলে বড় কথা কহিতেন না। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের প্রতি এত ভালবাসা ছিল যে তিনি নিজে কোন জিনিস গ্রহণ না করিলেও নরেন্দ্রনাথের জন্য আবলুস কাঠের একটি গুড়গুড়ি তৈয়ারি করাইয়া নিজে উপহারস্বরূপ অনিয়াছিলেন।

বাবুরাম মহারাজের রাত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্বপ্ন দেখা— বাবুরাম মহারাজ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন। তখন অর্থাৎ ১৮৮৬ বা ১৮৮৭ সালে তাঁহার বয়স অল্প, পাতলা দেখতে, ফ্যাকাসে ফরসা, বড় ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে 'রাধা-রাণী' 'রাধারাণী' বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। আর একটু ভাবাবেশ হইলে তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন। এইজন্য নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'ভেপু' বলিয়া

ডাকিতেন অর্থাৎ সব সময় যেন বেজেই আছেন। বাবুরাম মহারাজ মাছ মাংস খাওয়ার বড় বিরোধী ছিলেন এবং যাঁহারা খাইতেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করিতেন। একদিন বাবুরাম মহারাজ বড় ঘরটিতে একপাশে শুয়ে আছেন। রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে ভৎ‍র্সনা করিয়া বলিতেছেন,—'হ্যাঁরে শ্যালা! তুই মাছ খাস্‌নি বলে বড় সাধু হয়েছিস্‌, আর ওরা মাছ খায় বলে ওদের ঘেন্না করিস্‌? দাঁড়া আজ তোর চোখ গেলে দেবো।' ভয়েতে বাবুরাম মহারাজের ঘুম ভেঙে গেল, তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং পরনিন্দা করিয়াছেন, অপরাধ করিয়াছেন তাই সকলের কাছে মনে মনে ক্ষমা চাইলেন। সকলে তখন নিদ্রিত ছিলেন, পাছে নিদ্রা ভঙ্গ হয়—কাহাকেও জাগ্রত করিলেন না। অবশেষে পায়খানার দিকে যাইতে যে ছোট ঘরটি (সেখানে নর্দমার দিকে কখন কখন মাছ কোটা হইত) অন্ধকারে সেখানে হাত বুলাইয়া মাছের আঁস বা তৎস্পৃষ্ট মৃত্তিকা বা যাহাই হউক তিনি তুলিয়া জিহ্বায় দিলেন আর স্থির করিলেন যে মাছ খাওয়ার বিরুদ্ধে আর কখন কিছু বলিবেন না। তারপর পুনরায় তিনি গিয়া শুইয়া রহিলেন এবং পরদিবস ও তাহার কয় দিবস পর পর্যন্ত তিনি এই ব্যাপারটা সকলকে বলিয়া নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবটিতে নরেন্দ্রনাথের ও শরৎ মহারাজের ধ্যান (শরৎ মহারাজ কথিত)—নরেন্দ্রনাথ ও আমি একবার দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটিতে ধুনি জ্বালাইয়া বসিয়া জপধ্যান করিতেছিলাম। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব পূর্বেই রাত্রিকালে ওখানে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে কথায় তখন বিশেষ মনোযোগ করি নাই। নরেন্দ্রনাথ ও আমি আগুন জ্বালিয়া বসিয়া ধ্যান করছি, রাত্রি একটা কি দেড়টা হয়েছে, আমাদেরও ধ্যানটা বেশ জমিয়া গিয়াছে, হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া দেখি যে, নরেন্দ্রনাথ একদৃষ্টিতে কটমট করে চেয়ে রয়েছে। আমার মনে একটু সন্দেহ হল। একি, নরেন্দ্রনাথ এমন বিকট দৃষ্টি করে চেয়ে

রয়েছে কেন ? মাথাটা কিছু খারাপ হল নাকি ? আমি একটু উদ্বিগ্ন হইলাম, কিন্তু স্থির হইয়া রহিলাম। তারপর দেখি নরেন্দ্রনাথ যেন কার উপর রেগেছে ও সুমুখে যেন কাকে দেখেছে, আর তার উপর রেগে খিঁচিয়ে চোখ মুখ লাল করে উঠেছে। তখন বুঝলুম যে, অনাহার, অনিদ্রা ও সারা দিনরাত জপধ্যান করে নরেন্দ্রনাথের মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। একটু পরেই দেখি না নরেন্দ্রনাথ একখানা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে "তবে রে শ্যালা" বলে অন্ধকারে যেন কাকে মারতে উঠলো। আমার তখন ঠিক ধরণা হল যে, নরেন্দ্রনাথ ক্ষেপে গেছে। আমি ত তখন একটানে দৌড় দিয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরের দিকে পালালুম। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের তখন এরকম অবস্থা দেখে আবার পালাতেও ইচ্ছা হচ্ছিল না। নরেন্দ্রনাথের এরকম অবস্থাতে আমি কি করেই বা তাকে একা রেখে চলে যাই। একটু পরে দেখলুম যে, নরেন্দ্রনাথ কাঠটা ধুনিতে রেখে আবার স্থির হয়ে বসলো। আমাকে কাছে না দেখে ডাকিল, "ও শরৎ, কোথায় গেলি, আয় না।" আমি অপ্রতিভ হয়ে ধুনির কাছে গিয়ে আবার বসলুম। নরেন্দ্রনাথ বললে, "ভয় করতে হবে না, সে শ্যালাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, শ্যালা আর ভয় দেখাতে আসবে না।" আমি বললুম, "সে আবার কি ?" নরেন্দ্রনাথ বললে, "আরে সেই যে, যে শ্যালার কথা উনি বলতেন, শ্যালা উৎপাত করতে এসেছিল।" তারপর আমরা দুজনায় আবার জপধ্যান করতে বসলুম।

বরাহনগর মঠে নরেন্দ্রনাথকে জনৈক কর্তৃক গুণ্ডার দ্বারা মার খাওয়াইবার চেষ্টা ও নিরঞ্জন মহারাজ কর্তৃক তাহার নিরাকরণ— ১৮৮৭ সালে মে বা জুন মাসেতে নরেন্দ্রনাথের টাইফয়েড ব্যামো হয়। রবিবার বেলা দশটা বা সাড়ে দশটার সময় একটি লোক দু'টি ভাড়াকরা হিন্দুস্থানী দারোয়ান বা গুণ্ডা লইয়া বরাহনগর মঠে ঢুকিল। দারোয়ান দু'টি নীচে রহিল, লোকটি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। ব্যাপারটা ছিল যে, তাহার এক আত্মীয় বাড়ি ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে ও

নরেন দত্ত সেই লোকটাকে এক ছাড়পত্র দিয়েছে। সেইজন্য সেই গৃহত্যাগী লোকটি যেখানে যাচ্ছে, পুলিশ আর তাকে ধরছে না। অতএব নরেন্দ্র দত্তকে গুণ্ডা দিয়া মারবে, আর তার আত্মীয়কে ফিরাইয়া আনিয়া দিতে হইবে। এই ব্যাপার কহিয়া সেই লোকটি চীৎকার ও গোলমাল আরম্ভ করিল। অদূরে বড় ঘরটিতে নরেন্দ্রনাথের অসুখ খুব বাড়িয়াছে। সকলেই বড় উদ্বিগ্ন ও শোকার্ত। সকলেই নিস্তব্ধ। দুপুরবেলা আহার করিতে হয় সেই জন্য যাহার যখন সুবিধা হইতেছে সে একবার করিয়া খাইয়া আসিতেছে। আগন্তুক ব্যক্তিটি বাহিরের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া গালমন্দ ও চীৎকার করিতেছে, এমন সময় নিরঞ্জন মহারাজ বাহিরে আসিলেন। তিনিও খুব হৃষ্টপুষ্ট এবং লাঠিখেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; দুটো কি চারটে দারোয়ানকে তিনি সহজেই আয়ত্ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সর্বত্যাগী; বাহিরে আসিয়া তিনি আগন্তুক ক্রুদ্ধ লোকটির সহিত হাসিয়া হাসিয়া এমনি মিষ্টি কথা কহিতে লাগিলেন যে, পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে লোকটি ঠাণ্ডা হইয়া গেল, অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল ও লজ্জায় অধোমুখ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং শেষে নিরঞ্জন মহারাজের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল। নিরঞ্জন মহারাজ তখন অসুখের কথা তাহাকে বলিলেন; আগন্তুক ব্যক্তিটি তখন আর বিলম্ব না করিয়া সত্বর বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। সাধুর কথায় ও অমায়িক ব্যবহারে ক্রুদ্ধ ব্যক্তি কিরূপে শান্ত হয় ইহাই তাহার একটি উদাহরণ।

হরিশের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অনুকরণ করিবার শক্তি— দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুরে হরিশ নামে জনৈক ব্যক্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা করিত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর তাহার মাথাটা কেমন বিগড়ে গিয়েছিল। তখন সে এরূপ ভাব প্রকাশ করিত যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাহার ভিতর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। একটি তাহার বড় আশ্চর্য অনুকরণ করিবার ক্ষমতা হইয়াছিল। সে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত চোখটা একটু মিটমিট করিয়া ঈষৎ তোতলাভাবে কথা কহিতে এবং

বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনী ও অপর তিনটি অঙ্গুলি পৃথক্ রাখিয়া হাতটি বক্র করিয়া কিঞ্চিৎ কাঁপাইয়া হুবহু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতন অনুকরণ করিতে পারিত। তখন এটা যেন তার স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল। বরাহনগরের মঠের প্রথম অধিষ্ঠানের সময় হরিশ আসিয়া কিছু উৎপাত করিয়া ছিল। শিবানন্দ স্বামী তাহার থাকা অপ্রীতিকর বিবেচনা করিয়া তাহাকে অপসারিত করেন। তাহার পর সে চা খাবার জন্য বড় উৎপাত করে। শিবানন্দ স্বামী একটা কাগজে চা মুড়িয়া বড় ঘরের জানালা দিয়া নীচেকার আমবাগানে মোড়কটা ফেলে দিলেন। তাহার পর হরিশ বহু বৎসর বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিয়াছিল।

যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য—বাবুরাম মহারাজের গুরুপুত্র যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য বলরামবাবুর বাড়িতে থাকিয়া পড়াশুনা করিত এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যাইত। ছেলেটি খুব ভক্তিমান্ ছিল; চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ও কৃশ, অল্প দাড়ি ও মাথায় শিখা ছিল। অনেকটা পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানের চেহারা। তাহার বাড়িতে ডাক নাম ছিল ফকিরচন্দ্র। এইজন্য নরেন্দ্রনাথ আহ্লাদ করিয়া তাহাকে ফকিরুদ্দিন হায়দার বলিয়া ডাকিতেন। ফকির নরেন্দ্রনাথের ও অপর সকলের বিশেষ অনুগত ছিল ও সেবা করিয়াছিল। অবশেষে যক্ষা রোগে তাহার মৃত্যু হইল। পীড়ার সময় শরৎ মহারাজ ও তুলসী মহারাজ বিশেষভাবে শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ফকির শেষ অবস্থায় শয্যায় শুইয়া সর্বদা মনের আবেগে এই স্তবটি পাঠ করিত—

কোথায় দুর্গে দুখহরা।
দেখা দাও গো, ও মা তারা॥

যুবকটি নরেন্দ্রনাথের ও সকলের বিশেষ প্রিয় ছিল, এইজন্য তাহার নাম এখানে উল্লেখ করা হইল। নকল করিতে ও হাসাইতে তাহার বিশেষ নিপুণতা ছিল। ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য লোক—পূজাপাঠ খুব করিত।

বুড়োগোপালের আফিম খাওয়া—অদ্বৈতানন্দ (বুড়োগোপাল) অল্প পরিমাণে আফিম খাইতেন এবং আফিম খাইলে একটু দুধ খাইতে

হয় সেইজন্য তিনি একটু দুধও খাইতেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ বাগবাজারের ছেলে অল্প বয়স, বড় চঞ্চল ও বড় কূট-বুদ্ধি ছিল। একদিন অখণ্ডানন্দ স্বামীর খেয়াল হইল, সকলে রুক্ষ চা খায়, একটু দুধ মেলে না আর বুড়ো দুধও খাবে আর আফিম খাবে! বুড়োকে নিয়ে একটু রগড় করতে হবে! নরেন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া বুড়োগোপালের আফিমের টিনের কৌটাটি সরাইয়া লইলেন। আফিমের গুলিসকল বাহির করিয়া লইয়া খয়ের ওকুইনাইনের গুলি করিয়া একটু আফিমের জলে ভিজাইয়া তারপর শুকাইয়া আবার কৌটায় পুরিয়া ঠিক স্থানে রাখিয়া দিলেন। আর আফিমগুলি অন্য জায়গায় রাখিয়া দিলেন। বুড়ো মানুষ গোপালদাদা প্রকৃত আফিমের গুলি মনে করিয়া ঠিক খাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাহাতে কোনও গ্লানি মনে করিলেন না। আর অখণ্ডানন্দ স্বামী দুধের কড়াতে দুধের সরে পেঁপের ডাল দিয়া ফুটো করিয়া সব দুধটা খাইয়া লইত, তারপর পেঁপের ডাল দিয়া জল ভরিয়ে সরটাকে ভাসাইয়া রাখিত। বুড়ো মানুষ ঠিক দুধও খায় আর আফিমও খায়। তিন দিনের পর গঙ্গাধর মহারাজ আফিমের প্রকৃত কথা তাহাকে জানাইয়া দিলেন। শুনিবামাত্র বুড়োগোপালদাদার অমনি হাই উঠিতে লাগিল, গা কামড়াইতে লাগিল এবং শরীরের নানাপ্রকার গ্লানি উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন প্রকৃত আফিম এক মাত্রার স্থানে দুই মাত্রা খাইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন।

বুড়োগোপাল ও গঙ্গাধর মহারাজ—বুড়ো মানুষ সামান্য একটু খিটখিটে ছিলেন। একদিন রাত্রে গোপালদা নিজের যাহা আছে তাহা বিছাইয়া শয্যাটি করিয়া, মশারি ফেলিয়া, মাথার একটি বালিস রাখিয়া বাহিরে শৌচক্রিয়া করিতে গেলেন, আসিয়া শুইবেন। গঙ্গাধর মহারাজ মিটকি মেরে পাশে এক জায়গায় যেন কত ঘুমাইতেছেন এইরূপ ভান করিয়া শুইয়া রহিলেন। বুড়োগোপালদাদা যেমন সরিয়া গিয়াছেন অমনি গঙ্গাধর মহারাজ তার মশারির ভিতর থেকে বালিসটা ফেলিয়া দিয়া খ্যাংরা, জুতা ও ইট রাখিয়া দিয়া নিজের

স্থানেতে শুইয়া নাক ডাকাইতে লাগিলেন—যেন নিদ্রায় অচেতন হইয়া রহিয়াছেন। বুড়োগোপালদাদা আসিয়া মশারি তুলিয়া শয়ন করিতে গিয়া দেখিল খ্যাংরা, জুতা, ইট ইত্যাদি। তখন বুড়োগোপালদাদা হাসিয়া আমোদ করিয়া বলিল, "গঙ্গা এ তোর কাজ, তুই যখন এ সব জিনিস রেখেছিস্ তখন এই আমার অমূল্য রতন! আমি তোর দেওয়া জুতা, খ্যাংরা মাথায় দিয়ে শোবো, এ আমার পরম প্রীতিকর জিনিস", এই বলিয়া গোপালদাদা জুতা, ইট মাথায় দিয়া শুইলেন। গঙ্গাধর মহারাজের প্রাণে তখন বড় ব্যথা লাগিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া খ্যাংরা জুতা, ইট ইত্যাদি সব সরাইয়া লইলেন এবং গোপালদাদার কাছে ঢের অনুনয় করিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, "বুড়ো এখন ঠিক সাধু হইয়াছে বটে; রাগ অভিমান সব ত্যাগ করিয়াছে।" কৌতুকের ভিতর সাধু জীবনে কি মহত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায় এবং কি ভালবাসা, প্রেম ও পবিত্রতা স্ফুরণ হয়, ইহাই তাহার উদাহরণ।

শশী মহারাজের ঠাকুর ঘরের কাজ করা—বরাহনগরের মঠে প্রথম প্রথম তীব্র বৈরাগ্যভাব থাকায় সকলে মুষ্টিভিক্ষা করিত ও কঠোর সাধনা করিত। একখানা কাপড়ের উপর ভিক্ষার পাঁচমিশুলি চালের ভাত ঢালিয়া সকলে চারিদিকে বসিয়া ভাত ও লঙ্কার ঝোল খাইত; কিন্তু মাস পাঁচ-ছয় পরে সে ভাবটা কাটিয়া গেল। তখন সুরেশ চন্দ্র মিত্র, মাষ্টার মহাশয়, বলরাম বসু এবং অপর কয়েকজন ব্যক্তি অলক্ষিত-ভাবে ঠাকুরের সেবা ও মঠের খরচের জন্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তখন মঠ বলিয়া একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে এবং একটি ঠাকুর ঘরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শশী মহারাজ ফুল তুলিতেন ও ভোগ দিতেন এবং সন্ধ্যার সময় আরতি করিতেন। আরতির পর ধুনার পাত্রটি ও একটি বাতির আলো লইয়া বড় ঘরের দেওয়ালেতে যে সব ছবি ছিল, তাহাতে আলো দেখাইতেন ও ধুনা দিতেন ও দেওয়ালে প্রণাম করিতেন। ছবিগুলো সারদা মহারাজ কিছু কিছু ক্রয় করিয়া দেওয়ালে লাগাইয়াছিলেন। ছবির ভেতর অনেকগুলি খৃষ্টীয় সিদ্ধ-

মহাপুরুষদিগের প্রতিরূপ ছিল। তখন Oleograph-এর দাম অতি অল্প ছিল। সাধু পল ও যীশুর নানাভাবের ছবি ছিল। সেইসব ছবির ভিতর কয়েকটি এখন পর্যন্ত বেলুড়মঠে আছে। একখানি বড় কালী-মূর্তির ছবি ছিল, সেখানি এখন পর্যন্ত বেলুড়মঠে আছে। শশী মহারাজ 'জয় গুরুদেব শ্রীগুরুদেব' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিতেন। এই সময় পরামাণিক ঘাটের গলির ভিতর বড়াল বলিয়া ব্রাহ্মণদের একটি ছেলে শশী মহারাজের নিকট জুটিল। ছেলেটি সকালবেলা আসিয়া শশী মহারাজের সহিত ঠাকুর ঘরের অনেক কাজ করিত, তারপর খাইয়া স্কুলে যাইত এবং পুনরায় স্কুল থেকে আসিয়া শশী মহারাজের সহিত ফুলের মালা গাঁথা ও সন্ধ্যারতির বন্দোবস্ত করিত এবং সমস্ত প্রতিমূর্তিতে ধুনা দিয়া প্রণাম করিত। ছেলেটির বাপ মা এজন্য তখন কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে তখন কোন রকমে নিবারণ করিতে পারিত না।

বরাহনগর মঠে রাত্রের আহার—প্রথম প্রথম রন্ধনের জন্য কোন পাচক ছিল না। সাধু হইয়া অপরকে ভৃত্য রাখা অসঙ্গত মনে করিয়া পাচক রাখা হয় নাই। কিন্তু কয়েকমাস পরে বুঝিলেন যে, ভদ্রলোকের ছেলেদের অগ্নির সহিত যুদ্ধ করা কি দুরূহ ব্যাপার। সেইজন্য রামচন্দ্র নামক জনৈক ব্যক্তিকে রন্ধনের জন্য রাখা হইল, কিন্তু অনেক সময় আবার পাচক থাকিতও না। রাত্রে উনান জ্বালিয়া একটা কেরোসিন তৈলের বাক্সের উপর বসিয়া একজন রুটি সেঁকিত, একজন ময়দা মাখিত ও আর একজন রুটি বেলিয়া দিত এবং সেই সঙ্গে মুখে নানা বিষয়ের আলোচনা হইত। তুলসী মহারাজ তখন যুবক ও বলিষ্ঠ তিনি কখন রুটি বেলিতেন বা কখন রুটি সেঁকিতেন। নরেন্দ্রনাথ এবং অন্য সকলে ঐ কাজে থাকিতেন। তরকারি একটু লইয়া বসিয়াছে, আর একখানি করিয়া গরম রুটি সেঁকিয়া দিতেছে, আর সকলে খাইতেছে। ইহাতে সকলে বড় আনন্দ পাইত। ঠাকুরের জন্য তখন লুচির বন্দোবস্ত ছিল না, রুটি ও একটু সুজির পায়েস মাত্র বন্দোবস্ত

ছিল। ইহা হইতেছে প্রথম ছয় মাস, এক বৎসরের কথা। মাষ্টার মহাশয় তখন অনেক সময় স্কুলের ফেরত মঠে থাকিতেন। দমদম মাষ্টার (যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র) ইনিও তখন অনেক সময় মঠে থাকিতেন।

শিবানন্দ ও শশী মহারাজের শশা চুরি—তরকারির অভাবে নীচের বাগানটিতে কেলো মালী নামক জনৈক উড়ে মালী নিজের জন্য শশা গাছ পুঁতিয়াছিল। তার কতকগুলি শশা হইয়াছিল। শিবানন্দ মহারাজ ও শশী মহারাজ কেলো মালীর শশা মাঝে মাঝে লইয়া আসিতেন। কেলো মালী তখন ইচ্ছা করিয়া একটু সরিয়া যাইত। শশা আনিবার পর কেলো মালী আসিয়া মৌখিক অভিযোগ করিত। সকলেই তাহাতে হাসিতেন। তাহাকে মাঝে মাঝে রুটি ও তরকারি দেওয়া হইত এবং সময় সময় কোন কোন ভক্তর কাছ থেকে কাপড় ও কিছু কিছু পয়সাও দেওয়া হইত।

শিবানন্দ মহারাজের পশুপ্রীতি—শিবানন্দ মহারাজ যদিও খুব ধ্যানী ও মহাকঠোরী ছিলেন কিন্তু বরাবরই কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। শেয়াল কুকুরের উপর তাঁহার একটা বিশেষ ভালবাসা ছিল। তিনি রান্নাঘর থেকে কতকগুলি রুটি লইয়া বাগানের দিকে জলের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া 'ভোঁদা' ভোঁদা' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতেন আর একটা শেয়ালের ছানা ঘোঁ-ঘোঁ করে নীচে থেকে আওয়াজ করিত আর শিবানন্দ স্বামী দু'একখানা উচ্ছিষ্ট রুটি সেই ভোঁদাকে ফেলিয়া দিতেন। শেয়াল কুকুরকে খাওয়ানো তাঁহার একটা বড় আমোদ ছিল। সেই সময় তিনি বালকের মতন হইয়া হাত মুখ নাড়িয়া বড় আনন্দ করিতেন। এমন একটা সরল বালকভাবে তিনি হর্ষ প্রকাশ করিতেন যে, তাহাতেই কত মাধুর্য মাখানো থাকিত।

রাখাল মহারাজের পিতার বরাহনগর মঠে আগমন—১৮৮৮ সালে রাখাল মহারাজের পিতা হারাণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বরাহনগর মঠে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে সকলেই, বিশেষ করিয়া গুপ্ত মহারাজ খুব যত্ন করিলেন। গুপ্ত মহারাজের পরিচর্যায় তিনি বড়

সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। গুপ্ত মহারাজ তাঁহাকে খুব সম্মান করিয়া বলিলেন, "আপনার ছেলে ত সাধু হয়েছেন, আপনি কেন সাধু হয়ে যান না?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "ও গুপ্ত, আমি কি করে তোমাদের মতন হবো গো! আমি যে বিভবশালী ব্যক্তি। আমাকে তেল মাখিয়ে দেবে কে, তামাক সেজে দেবে কে, আমি কি তোমাদের মত এ সব জিনিস খেতে পারবো?" ইত্যাদি কথা কহিয়া তিনি বৈকালবেলা তিনটা চারটার সময় হাঁটিয়া চলিয়া যাইলেন।

বরাহনগর মঠে কালীপূজা ও পাঁঠা বলি লইয়া মতান্তর—সম্ভবতঃ ১৮৮৭ সালে বরাহনগর মঠের প্রথম কালী পূজা বা অপর কিছু পূজা হইয়াছিল, তাহাতে পাঁঠা বলি দেবার কথা হয়। তাহাতে রাখাল মহারাজ মনঃক্ষুন্ন হইয়া রহিলেন; তাঁহার মত ছিল না। জনকতকের সেইরূপই মত—বলি হইবে না; কিন্তু নরেন্দ্রনাথের ইচ্ছা, বলি দেওয়া হইবে। তিনি জোর করিয়া বলিলেন, "আরে একটা পাঁঠা কি, যদি মানুষ বলি দিলে ভগবান পাওয়া যায় তাই করতে আমি রাজী আছি।" যাহা হউক, নরেন্দ্রনাথের মতে অনেকে মত দিলেন ও পাঁঠা বলি হইল। বাবুরাম মহারাজ তাড়াতাড়ি ঠাকুর ঘরে গিয়া খোল বাহির করিয়া আনিয়া বাজাইতে লাগিলেন। বলি হইয়া গেল, সব চুকেমুকে গেল। তার কয়েকদিন পরে সকলে বাবুরাম মহারাজকে ঠাট্টা সুরু করিল,—"শ্যালা বৈরিগীর মত সব বিট্‌কিল্‌মি, খোল বাজিয়ে বলি করা!" এই বলিয়া নানারকম ব্যঙ্গ করিয়া সকলেই বাবুরাম মহারাজের সহিত ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। বাবুরাম মহারাজ তখন অতি ভালমানুষ, অল্প বয়স ও বালক, কি উত্তর করিতে হইবে স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। নিরঞ্জন মহারাজ, যোগেন মহারাজ ও নরেন্দ্রনাথ অবসর পাইলেই খোল বাজিয়ে বলির কথা উল্লেখ করিয়া অনেক কৌতুক করিতেন।

বলরাম বসুকে লইয়া সুরেশবাবুর কৌতুক করা—এই সঙ্গে আর একটি কথা মনে হইতেছে—সুরেশচন্দ্র মিত্র শাক্ত ও শক্তিমন্ত্রের

উপাসক। বলরাম বসু বৈষ্ণব, অতি ধীর, নম্র। উভয়েই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত, সমবয়সী ও পরমবন্ধু। বরাহনগরের মঠে দুইজনেরই একসঙ্গে সমাবেশ হইয়াছে—সুরেশবাবু আরম্ভ করিলেন, "বলরাম শ্যালা বোষ্টম! তোর রাধাকেষ্ট একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে পীঁ পীঁ আওয়াজ কচ্ছে; সাত জন্মের শুকনো উপোসী, পাপী, চীঁ চীঁ করছে আর একটা বাঁশীতে ফুঁ পাড়ছে। আর আমার মা কেমন জানিস্? লাক্চড়াচড় আওয়াজ কচ্ছে, শ্যালা তোর বোষ্টমকে ধরছে আর আমার মার খাঁড়া দিয়ে বলি কচ্ছে।" এইরূপ ভক্তিপূর্বক ব্যঙ্গচ্ছলে উভয়ে নানাপ্রকার পরিহাস ও কৌতুক করিতে লাগিলেন, উভয়ে যেন শ্রদ্ধা-ভক্তিতে বহুগুণ বাড়িতে লাগিলেন। মুখে শব্দ যাহা হউক একটা বলিতেছেন, কিন্তু অন্তরে কি একটা প্রগাঢ় ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও পরস্পরের প্রতি স্নেহমমতা যেন শতগুণ পরিবর্ধিত হইতে লাগিল।

দর্শনশাস্ত্রে নরেন্দ্রনাথের ব্যুৎপত্তি ও হরমোহন মিত্রের বিস্ময়—১৮৮৬ বা ১৮৮৭ সালের গ্রীষ্মকালে একদিন নরেন্দ্রনাথ হরমোহন মিত্রের দোরের চৌকাটের উপর বসিয়া আছেন। হরমোহন মিত্র মহাশয় তখন ২নং নয়নচাঁদ দত্তের গলিতে বাস করিতেন। গ্রীষ্মকাল, সন্ধ্যার পরে উভয়ে বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও দর্শনশাস্ত্রের কথা হইতেছে। সামান্য কথা হইতে হইতে নরেন্দ্রনাথ ক্রমে গভীর দিকে চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ তিনি হরমোহনকে গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ত্যাখ্ হরমোহন, দর্শনশাস্ত্রগুলো যেন আমার হাতের মুঠোর ভিতর রয়েছে; পাশ্চাত্য দর্শনগুলোও আমার ওষ্ঠের অগ্রে রয়েছে। আমরা কোন্ থাক জানিস্? আমরা হচ্ছি Teacher class; জগৎকে নূতন ভাব দেবার জন্য আমরা আসি।" এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথ স্থির হইয়া রহিলেন। নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন অল্প ও হরমোহন মিত্রের সহপাঠী বা এক-আধ ক্লাস উপরে অধ্যয়ন করিতেন। যাহা হউক, বাল্যবন্ধু, এবং তখন পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ-জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই

জন্য হরমোহন মিত্র এইরূপ দাম্ভিক বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,"আচ্ছা, পরমহংস মশাই কি প্রকার ?" নরেন্দ্রনাথ আরও গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "কিরে হরমোহন, তুই পরমহংস মশাইকে কি যে সে মনে করলি ? আমি বাজিয়ে নানিয়ে কখন কি মাথা নীচু করেছি ? ভ্যাখ্, পরমহংস মশাইয়ের এক একটা কথার উপর আমি তিনদিন ধরে lecture (বক্তৃতা) করতে পারি, তবুও তাতে পর্যাপ্ত হবে না।" হরমোহন মিত্র সাধারণ ভক্তলোক, সে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল, "বল দেখিনি একটা !" নরেন্দ্রনাথ তখন 'হাতী নারায়ণ ও মাহুত নারায়ণ, এই গল্পটি তুলিয়া এবং একটি উপলক্ষ করিয়া, Free will, Predestinarism, Doctrine of Election, Doctrine of Grace, Subjection, Primal Cause and Effect, ইত্যাদি নানাপ্রকার দার্শনিক মত তুলিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং ঐ গল্পের ভিতরের দার্শনিক তথ্যটি তাহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন হরমোহন মিত্র ভক্তলোক, পরমহংস মশাইকে ভক্তি করিত, দর্শনশাস্ত্রের 'দ'টি পর্যন্ত জানিত না। তাহার পক্ষে ইহা ভীষণ জিনিস, সেইজন্য সে মাথা গুলাইয়া যাওয়ায় হতভম্ব হইয়া রহিল। নরেন্দ্রনাথের তর্কযুক্তি তাহার বোধগম্য হইল না, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ যে একটি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন এইটি সে বলরাম বসুর বাড়ি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ি ও মাষ্টার মহাশয়ের বাড়িতে চাউর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরিচিত যেখানে যাহাকে দেখিতে পায়, হাটে-বাজারে কেবল ঐ কথাই সে গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নরেন্দ্রনাথের দর্শন শিক্ষা দান ও তৎবিষয়ে তাহার পাণ্ডিত্য অবলোকনে কালী বেদান্তীর বিস্ময়—১৮৮৯ সালে গ্রীষ্মকালে বর্তমান লেখক প্লেটোর দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন অল্প বয়স, গ্রন্থের এক জায়গা ভালরকম বুঝিতে পারিতেছিলেন না বিষয়টি হচ্ছে, 'Contrary produces contrary'। কালী বেদান্তীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "আমিও ঐ জায়গাটি ভালরকম বুঝতে পারছি না, তুমি

নরেনকে জিজ্ঞাসা করগে যাও না।” গরমকাল, বেলা সাড়ে-তিনটা বা চারটার সময় নরেন্দ্রনাথ বলরামবাবুর বাড়ির সিঁড়ি থেকে উঠিয়া ছোট ঘরটিতে পশ্চিমদিকের তক্তার উপর বসে আছেন। নিরঞ্জন মহারাজ সম্মুখের টেবিলের উত্তরদিকে, অর্থাৎ বামদিকের বেঞ্চের উপর বসে আছেন এবং কালী বেদান্তী টেবিলের ডানদিকের একটা চেয়ারে বসে আছেন। কালী বেদান্তী কথা তুললেন, “নরেন, মহিন প্লেটোর Phaedo বইটার এক জায়গাটা বুঝতে পারছে না, তুমি একটু বলে দাও না!” জিজ্ঞাসু ব্যক্তি সেই স্থানটি খুলিয়া পুস্তক হইতে পড়িতে লাগিলেন। বিষয়টি অল্পবয়স্ক বালকের পক্ষে দুরূহ, কারণ ইহা Metaphysics-এর ব্যাপার, contrary produces contrary, ইত্যাদি। নরেন্দ্রনাথ শুনিবামাত্র তৎসংক্রান্ত গ্রীক দর্শনশাস্ত্রে, জার্মান দর্শনশাস্ত্রে কে কোথায় কি বলিয়াছেন, তাহা অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। কালী বেদান্তী ও অন্যান্য সকলে অতি আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কালী বেদান্তী তখন অহোরাত্র দর্শনশাস্ত্র পড়িতেছিলেন ও উবেরওয়েগ-এর (Friedrich Uberweg) History of philosophy-টা খুব দেখিতেছিলেন। কালী বেদান্তী সুবিধা পাইয়া তখন নানাবিধ দার্শনিক প্রশ্ন উঠাইতে লাগিল এবং তাহার পঠিত বিষয়ের বহু অস্পষ্ট স্থানগুলি প্রতিভাসিত হইতে লাগিল। কালী বেদান্তী ত খুব আহ্লাদ করিতে লাগিল। ভারতবর্ষীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রটা তখন নরেন্দ্রনাথের ওষ্ঠাগ্রে যেন রহিয়াছিল। এইদিন নরেন্দ্রনাথ কথাপ্রসঙ্গে দেখাইলেন যে দর্শনশাস্ত্রে তিনি একজন অদ্ভুত পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের উপর তাঁহার আধিপত্য আছে এবং নিজেও একজন অদ্ভুত দার্শনিক, তাহাই তিনি আভাসে বুঝাইয়া দিলেন। অধ্যয়ন ও বিদ্যাচর্চার ভিতর দিয়াও যে ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহাই তিনি অতি তেজস্বী ও গভীর বাক্যে বুঝাইয়াছিলেন এবং সেই স্থলেই ভবিষ্যতে তিনি যে একজন বিশেষ বাগ্মী হইবেন, তাহারই পূর্বাভাস সকলে দেখিতে পাইলেন। সম্ভবতঃ পরবর্তী অনেক প্রসিদ্ধ বক্তৃতা

অপেক্ষা সেইদিনকার বক্তৃতাটি বিশেষ তেজঃপূর্ণ ও মহা উচ্চভাব-পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং কিরূপে দর্শনশাস্ত্রের ভিতর দিয়া ব্রহ্মে মিলিত হওয়া যায় সেইটিই তিনি সেইদিনকার আলোচনায় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু অনবরত ভাবের উপর ভাব এত ফেলিতে লাগিলেন যে, সেই সমস্ত বিষয় কাহারও স্মরণ নাই, কেবল আনন্দের স্মৃতি আছে মাত্র। ইতিহাস, পুরাণ, কাব্য, নেপোলিয়ানের বিষয়ে গ্রন্থাদি ও স্যার উইলিয়াম হাণ্টারের Statistics-ও নরেন্দ্রনাথের খুব আয়ত্ব হইয়াছিল। হাণ্টারের Statistics আনাইয়া, বর্তমান বৈরাগীদের উৎপত্তি পাঠ করিয়া নরেন্দ্রনাথ বলরামবাবুকে ব্যঙ্গ করিতেন আর বলিতেন—"ও বলরাম, হাণ্টার বৈরাগীদের উৎপত্তির কথা কি বলছে শুনেছ? আরে ছি ছি, এই তোমাদের বৈরাগীদের উৎপত্তি!"

গিরিশবাবুর "বিল্বমঙ্গল" প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ—গিরিশবাবু এই সময়ে "বিল্বমঙ্গল" নাটক লেখেন। "বিল্বমঙ্গল" নাটকখানি ভাল হইল কি মন্দ হইল, এ মতামত পাইতেছিলেন না। সাধারণ লোক নাচগান দেখেশুনে আসে, তাহাতে কাব্যের কোন গুণাগুণ পরিচয় হয় না। তিনি নরেন্দ্রনাথকে বইখানা পড়িতে অনুরোধ করেন। নরেন্দ্রনাথ চোরের পালাটা, অর্থাৎ ভিক্ষুকের পালাটা পড়িয়া বলিলেন,"জি সি, (নরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে 'জি সি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন) চোর ঠিক এই কাজ করে, চোরের স্বভাব ঠিক এই প্রকার" এবং আরও বলিলেন, "ছাখ, আমি সংস্কৃত এবং ইংরাজীতে বহু কাব্য পড়েছি, মিল্টন, সেক্সপীয়র, কালিদাস আমার কণ্ঠস্থ রয়েছে, কিন্তু বিল্বমঙ্গল-খানা কেমন আমার সবচেয়ে ভাল লাগছে, অন্য বইগুলি তত ভাল লাগছে না। বিল্বমঙ্গল-খানা আমার বড় ভাল লাগছে!"

কালীবেদান্তীর অধ্যয়ন—এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের প্রভাবে কালী বেদান্তী দিবারাত্র পড়িতে লাগিল। তাহার সামনে যেন এম. এ. পরীক্ষা রয়েছে এইরকম ভাবে দোর বন্ধ করিয়া অনবরত পড়িতে লাগিল। এখান-ওখান থেকে বই চাহিয়া সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রটা রীতিমত

পড়িয়া লইল। নানারকম পড়াশুনা, উচ্চ চর্চা, জপধ্যান ও নানাপ্রকার সংপ্রসঙ্গের যেন তখন একটা আগুন ছুটতে লাগল। নরেন্দ্রনাথের শান্তি নাই, বিরাম নাই। সমস্ত লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া কি যেন শুনিতেছে; কোন্‌টা জপধ্যান, কোন্‌টি পড়াশুনা ইহার কোন পার্থক্য রহিল না। কানে শুনা আর মনে জপধ্যান করা, এক হইয়া গেল। মাষ্টার মহাশয় (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রণেতা, শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) অনেক সময় উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না, পরদিন আসিয়া একে-ওকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "হাঁ হে, নরেন্দ্র কি বলেছিল? কি সব কথাবার্তা হইল?" অল্পমাত্র যাহা শুনিতে পাইতেন তাইতেই তিনি পরম আনন্দ পাইতেন।

নরেন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্রের ছদ্ম দ্বন্দ্ব—নরেন্দ্রনাথের সহিত সম্মুখে কেহ তর্ক করিতে পারিত না বা সাহস করিত না, তবে কেবলমাত্র গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সাহস করিতেন। গিরিশবাবুর ইংরাজী সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য, অদ্ভুত স্মরণশক্তি ও উপস্থিতবুদ্ধি ছিল। শুধু তিনিই কেবল নরেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে সাহস করিতেন। ঘেঁটিয়ে ঘেঁটিয়ে কথা বার করবার জন্য অনেক সময় ব্যঙ্গচ্ছলে গালি দিয়া একটু উত্তেজিত করিয়া দিতেন। গিরিশবাবু একটু হাসিয়া বলিতেন, "থাম শ্যালা, সন্ন্যাসী ভিখারী!" নরেন্দ্রনাথ অমনি হাসিয়া প্রত্যুত্তর করিতেন, "যা শ্যালা ভাঁড়, তুই শ্যালা থিয়েটারে মাগী নাচাবি, তোর শ্যালা কি brain আছে?" আবার দুজনে তুমুলভাবে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন।

সারদানন্দ স্বামী, তুলসী মহারাজ ও শশী মহারাজের অধ্যয়ন—স্বামী সারদানন্দও সেই সময় খুব পড়াশুনা সুরু করিলেন। তিনি বাইবেল, যীশু-জীবনী ইত্যাদি বহু পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। সেণ্ট পলের জীবনীটা খুব পড়িতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'পাল সাহেব' বলিত। তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্মলানন্দ), শশী মহারাজ এঁরাও পড়াশুনায় তখন খুব মন দিলেন। সেই সময়টা সকলে যেন

প্রাণ বিসর্জন করিয়া উন্মত্ত হইয়া কি অদৃষ্টপূর্ব স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। জগৎটা আছে কি নাই, ইহার হুঁস ছিল না।

নরেন্দ্রনাথ ও দক্ষ মহারাজ—এক একদিন বলরামবাবুর বড় ঘরের উপরকার ছাতে গ্রীষ্মকালে নরেন্দ্রনাথ গিয়া বসিতেন আর সেই সময় দক্ষ মহারাজ ও আর কয়েকজন মিলিয়া নরেন্দ্রনাথের চারিদিকে ঘেরিয়া বসিতেন। দক্ষ মহারাজ তখন পাগল হন নাই। তখন অবস্থা খুব ভাল ছিল এবং বেদান্ত-শাস্ত্রটা খুব আলোচনা করিতেন। দক্ষ মহারাজ এবং অপরের যাঁহার যত রকম মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাঁহারা সকলেই তাহা নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এক একটি প্রশ্ন করিতেছেন আর নরেন্দ্রনাথ দ্বিগুণ শক্তিমান হইয়া উঠিতেছেন। নূতন মূর্তি, নূতন ভাব, নূতন তর্ক হইত। এইরূপভাবে কত রাত্রি কাটিয়া যাইত। নরেন্দ্রনাথের ক্লান্তি নাই এবং তর্কযুক্তিরও সীমা নাই। পরে দক্ষ মহারাজ বলিতেন,—"নরেন্দ্রনাথ বলিতেন 'আমার ভিতরটা যেন থোলে, একটা বোরা; বোরা ঝেড়ে তোরা সমস্ত বা'র করে লে, যত চাবি তত পাবি। আমি নিজেই এ ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না'।" আমেরিকাতে যখন তিনি নানাবিষয়ে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন তিনি নিজে আশ্চর্যান্বিত হইয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "ওরে আমি তো সেই পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম, একটা vagabond, এখন দেখছি যে আর একটা জিনিস। বলি মগজ-বাবাজী, তোর পেটে এত ছিল রে, যে আমি নিজেই অবাক হচ্ছি," ইত্যাদি।

বরাহনগর মঠে শক্তি সঞ্চার ও পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা—বরাহনগরের মঠে এই সময়টা যা শক্তিসঞ্চার হইয়াছিল তাহাতেই ভবিষ্যতে নরেন্দ্রনাথ, কালী বেদান্তী, শরৎ মহারাজ, তুলসী মহারাজ প্রভৃতি জগৎ-জয়ী হইয়াছিলেন। কোথায় বা দিন, কোথায় বা রাত্র, যথার্থই সকলে এই সময়ে ভগবান লাভের জন্য, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ জীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য এবং মহান্ আদর্শ প্রকাশ

করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উচ্চ চিন্তায় ও তপস্থায় নিমগ্ন ছিলেন। আর সকলের ভিতর, অর্থাৎ সমস্ত ভক্তমণ্ডলীর ভিতর এমন একটা প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল যেন এক শরীর, এক মন হইয়া গিয়াছিল। একজনের গায়ে চিমটি কাটিলে অপরে যেন উহু করিয়া উঠে। এরূপ জমাট ভালবাসা কখন দেখি নাই। যীশুর শিষ্যদিগের ভিতর, বুদ্ধদেবের শিষ্যদিগের ভিতর থাকিতে পারে বা হইয়াছিল, যাহার কিছু কিছু পুস্তকে সামান্য অভাসমাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা যে একটা জীবন্ত ভালবাসা, মুঠো করা যাইতে পারে, ছোঁয়া যাইতে পারে, গায়ে মাখা যাইতে পারে ইহা বরাহনগরের মঠেতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইত। এখন দু'একজন যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহারাই কেবল এ বিষয় অনুভব করিতে পারিবেন। তাঁহাদের পূর্বস্মৃতি এখনও পুনরায় ফিরিয়া আসিবে।

নরেন্দ্রনাথের নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও যজ্ঞেশ্বরকে সংস্কৃত কাব্য পড়ান —এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ Physiology, Pathology প্রভৃতি নানাশাস্ত্র ও নানাগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান সকলপ্রকার ধর্মগ্রন্থ, দর্শনশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি অতি অল্পদিনের ভিতর পাঠ করিয়া লইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষাও বিশেষ আয়ত্ত করিলেন। যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য, যাঁহাকে নরেন্দ্রনাথ 'ফকিরুদ্দীন হায়দার' বলিতেন, এই সময় তিনি মেঘদূত ও শকুন্তলা পড়িতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, নরেন্দ্রনাথ ইংরাজী কলেজে পড়া ছাত্র, ইংরাজী ও সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রটা ভালরকম জানেন কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে তেমন অধিকার নাই। ফকির প্রথমতঃ এখানে ওখানে পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। অবশেষে একটু বিষণ্ণভাবে মৌন হইয়া রহিল। নরেন্দ্রনাথ কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করায় তাহার বিমনা হইবার কারণ বুঝিতে পারিলেন, এবং সহাস্যবদনে বলিলেন, "তার আর কি, মেঘদূত ও শকুন্তলা-টা নিয়ে এস না।" তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয়-ভাব সংযোগ করিয়া শকুন্তলা ও মেঘদূত এমন

সুন্দরভাবে এবং সহজে পড়াইয়া দিলেন যে; ফকির অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল। কারণ উভয়-ভাবের সংমিশ্রণে এরকম সুন্দরভাবে সংস্কৃত কাব্য পড়ান, পূর্বে সে কখন শোনে নাই।

নরেন্দ্রনাথের নর্তকাগারে ভজন গাওয়া—এই সময় গিরিশবাবুর "বিল্বমঙ্গল" অভিনয় হয়। সম্ভবতঃ গিরিশবাবু নরেন্দ্রনাথকে "বিল্বমঙ্গল" অভিনয় দেখাইবার জন্য লইয়া যান। অভিনয় সমাপ্ত হইলে পর দর্শকবৃন্দ সকলে চলিয়া গেলে, গিরিশবাবু নরেন্দ্রনাথকে লইয়া রঙ্গমঞ্চে ঢুকিলেন। তখন ভিড় নাই—সকলেই একটু নিরিবিলি কথাবার্তা কহিতেছেন, নর্তক-নর্তকীগণ চারিদিকে দণ্ডায়মান আছে, এমন সময় নরেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইলেন। নর্তক ও নর্তকীগণ মৌখিক সম্মান প্রদর্শন করিয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিল, এবং আপনা-আপনি কথা কহিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চেতে বসিয়া একটি তানপুরা লইয়া স্থিরভাবে ভজন গাহিতে আরম্ভ করিলেন। স্বভাবসিদ্ধ একাগ্রতায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ায় তাঁহার শক্তি জাগিয়া উঠিল। চক্ষু নিমীলিত; কণ্ঠ হইতে ভক্তিপূর্ণ স্বর উঠিতেছে এবং দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। ঠিক যেন নরেন্দ্রনাথ নিজের ইষ্টকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া সুস্বরে আহ্বান করিতেছেন। স্থানটি নর্তকাগার হইতে দেবমন্দিরে পরিণত হইল, ভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ চতুর্দিকে যেন প্রবাহিত হইতে লাগিল। বায়ু যেন ধর্ম, পবিত্রতা ও ঈশ্বরানুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। চপলস্বভাব নর্তকীবৃন্দ তখন ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এবং কাহার সম্মুখে পূর্বে তাহারা চাপল্যভাব প্রকাশ করিয়াছিল, এই চিন্তায় তাহারা কম্পিত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল, এবং ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া করজোড়ে অতি বিনীতভাবে দূরে দণ্ডায়মান রহিল। গিরিশবাবু তখন নরেন্দ্রনাথের ধ্যান ও গভীর চিন্তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া একটু চিন্তিত ও উন্মনা হইলেন, এবং ঐরূপ ভাব আর যাহাতে পরিবর্ধিত না হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি নরেন্দ্রনাথের হাত হইতে তানপুরা উঠাইয়া লইলেন, এবং নরেন্দ্রনাথের হস্তধারণ করিয়া মঞ্চ হইতে

বাহির হইয়া নিজের গাড়িতে বসাইলেন এবং বাগবাজারে আনিলেন। নরেন্দ্রনাথের ইহাতে বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নাই বা তিনি এই ব্যাপারকে কিছু অস্বাভাবিক মনে করেন নাই। স্বভাবসিদ্ধ কাজই করিয়াছেন; ধ্যান ভজন করিয়াছেন—তাহা কোন্ স্থানে তাঁহার অত স্মরণ নাই।

নর্ত্তকীবৃন্দের ভয় ও শ্রদ্ধা—কিন্তু পরদিবস নর্তকীবৃন্দ গিরিশবাবুকে অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি করিয়াছিলেন কি! আমরা চঞ্চলমতি নর্তকী, এরূপ শক্তিমান মহাপুরুষকে হঠাৎ আমাদের সম্মুখে আনা আপনার ঠিক হয় নাই। যদি কোন বিষয়ে আমাদের চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে সেই পাপে আমরা একেবারেই ধ্বংস হইতাম। আমাদের ইহকাল তো গিয়াছেই, পরকালও ঐ সঙ্গে যাইত।" গিরিশবাবু তাহাদের এই কথা শুনিয়া মনে মনে খুব হর্ষিত হইলেন, এবং নরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা-ভক্তি আরও বাড়িয়া গেল।

নরেন্দ্রনাথ ও সংগীত বিদ্যা—নরেন্দ্রনাথ যদিও কৌতুক-রহস্য ভালবাসিতেন এবং সময়ে সময়ে বিশেষ স্ফূর্তি করিতেন, কিন্তু আবশ্যক হইলে এত গম্ভীর হইতে পারিতেন যে, অনভ্যস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা বড়ই ভীতিপ্রদ হইত। বলরামবাবুর বাড়িতে কখন কখন নরেন্দ্রনাথ সন্ধ্যার সময় ভজন গাহিতেন—তানপুরায় সুর বাঁধিতেন, তার টং টং করিয়া বাজাইতেন, আবার কানটা একটু টিপিতেন, বাঁয়াতবলায় টোকা দিতেন, সব সুর-কয়টা ঠিক হইল কি না দেখিতেন। সেইসময় তিনি এত গম্ভীর হইতেন ও এত নিবিষ্টমনে সুরের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন যে, আগন্তুক ব্যক্তিদিগের মধ্যে যদি কেহ একটু ফুস-ফাঁস আওয়াজ করিত তাহা হইলে তিনি একেবারে সক্রোধে তাহাকে গালি দিতেন ও ভৎর্সনা করিতেন; এমন কি তাহাকে তথা হইতে উঠিয়া যাইতে আদেশ করিতেন। সঙ্গীতবিদ্যা তাঁহার নিকট চাপল্য বা বালকের খেলা ছিল না। ইহা অতি গম্ভীর, ঋষিবিদ্যা। শুদ্ধ পবিত্র জিনিস, ঈশ্বর আরাধনার ও

ঈশ্বর উপলব্ধির একটি বিশেষ পবিত্র অঙ্গ মাত্র। সঙ্গীতকলায় অপবিত্র ভাব ঢুকলে তাহা নাশ হইয়া যায়। এই বিদ্যাকে অতি শুদ্ধ পবিত্র ভাবে রাখিতে হয়, তাহা হইলে ইহা পরিবর্ধিত হয়। নরেন্দ্রনাথ সুর বাঁধিয়া তানপুরায় তান দিয়া যখন ধ্রুপদগান ধরিতেন তখন তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে পরিণত হইতেন। চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত ও উজ্জ্বল, দৃষ্টি স্থির, এবং অলক্ষিতভাবে লক্ষ্য করিতেছেন এরূপ গভীর তেজঃপুঞ্জ, পরিমিতস্পন্দনযুক্ত শব্দ তাঁহার কণ্ঠ হইতে বহির্গত হইত; তাঁহার মুখ তখন মহাতেজোদীপ্ত হইয়া উঠিত এবং অবয়ব অতি গম্ভীর ও স্থির হইয়া যাইত। নিজের মুখে কোন চাপল্যের ভাব নাই এবং উপস্থিত ব্যক্তিদেরও চাপল্য করিবার কোন সামর্থ্য থাকিত না। ঈশ্বর-উপাসনা সঙ্গীতের উদ্দেশ্য,—শব্দ থেকেই নাদে যাওয়া সঙ্গীতের উদ্দেশ্য, নাদই ব্রহ্ম এবং নাদ বা স্পন্দন হইতে সৃষ্টি হইয়াছে—এই সত্য প্রকাশ করাই সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেইজন্য নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতকালে এত গম্ভীর ও তেজঃপূর্ণ হইয়া উঠিতেন। সেই সময়টা গৃহাভ্যন্তরে বায়ু দোদুল্যমান হইত। শক্তি যেন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইত এবং উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মনও যেন ঐ শক্তির সঙ্গে মিলিত হইয়া কোথায় উর্ধ্বে চলিয়া যাইত। ধ্যান আপনা-আপনিই যেন সকলের মধ্যে আসিতে থাকিত—ইহাই হইতেছে সঙ্গীতের তাৎপর্য।

নরেন্দ্রনাথ ও গোপাল কবিরাজ—গোপাল কবিরাজ নামক জনৈক কবিরাজ বলরামবাবুর বাটির অনতিদূরে থাকিতেন। তিনি পূর্বে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইতেন; খুব ভক্তিমান, সংস্কৃতে পণ্ডিত এবং চিকিৎসাবিদ্যায় খুব পারদর্শী ছিলেন। সমস্ত গুণ সত্ত্বেও তাঁহার এক বিশেষ রোগ ছিল, দাবাবোড়ে খেলিতে বসিলে দিন রাত্র তাঁহার কিছু হুঁস থাকিত না, রোগীর চিকিৎসা করা ত দূরের কথা। এজন্য তিনি এমন সুপণ্ডিত ও সৎলোক হইয়াও এবং চিকিৎসা-কার্যে বিশেষ পারদর্শী হইলেও তাঁহার ব্যবসা সুন্দর ভাবে চলিত না। কিন্তু লোক হিসেবে তিনি অতি সৎলোক এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ ভক্ত

ছিলেন। তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সময়কার লোক বলিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলরামবাবুর বাড়িতে ডাকাইয়া পাঠাইতেন। তিনি কখন বা ঔষধ তৈয়ারি করিতেছেন কখন বা পাকতেল জ্বাল দিতেছেন, সেইজন্য আসিতে পারিতেন না। নরেন্দ্রনাথ লোক মারফত তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইতেন যে, 'নূতন একজোড়া দাবাবোড়ে এসেছে আর একজন খেলবার লোক এসেছে, শীঘ্র আসুন, না হলে সে চলে যাবে'। কবিরাজ মহাশয় তখনই হন্তদন্ত হয়ে দাবাবোড়ে খেলিবার জন্য উপস্থিত হইতেন। আসিয়া দেখেন কোথায়ই বা খেলোয়াড় আর কোথায়ই বা দাবাবোড়ে! তখন সকলে তাঁহাকে লইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তিনি অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া পড়িলে তখন তাহাকে লইয়া নানাবিষয়ের কথাবার্তা চলিত। কখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা হইতেছে, কখন বা নানাশাস্ত্রের কথা হইতে লাগিল, কখন বা আয়ুর্বেদে বিশেষ বিশেষ প্রশ্নের কিরূপ মীমাংসা করিয়াছে তদ্বিষয়ে আলোচনা হইতে লাগিল—কোন বিষয়, কোন শাস্ত্র, কোন ভাব পরিত্যজ্য নয়। নরেন্দ্রনাথ সকল ভাব, সকল শাস্ত্রকে শ্রদ্ধাভক্তির চক্ষে দেখিতেন, এবং তাহার ভিতর যে জীবন্ত শক্তি আছে ও মনে উদ্দীপনা হইবার যে বিশেষ উপায় আছে, তাহা তিনি প্রত্যেক ব্যাপারে দেখাইতেন।

জনৈক শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিকে নরেন্দ্রনাথের উপযুক্ত শিক্ষাদান—একদিন এক ব্যক্তি সামান্য শিক্ষিত, কিন্তু মৌখিক দু'চারটি বোল শিখিয়া বড় ফড়্ ফড়্ করিতেছে এবং সকলকেই বিরক্ত করিতেছে। লোকটি একটু চপলস্বভাব। তাহার মুখ খানিকক্ষণ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ সুরু করিলেন "ঠিক বলেছিস—তোর বাপ পড়েছে দাতাকর্ণ, তুই পড়বি বোধোদয়", এই বলিয়া 'সধবার একাদশী' থেকে বোলচাল আরম্ভ করিলেন। লোকটি কাটাকাটা বোল শুনিয়া বড়ই চঞ্চল হইল। যে ভাবেরই কথা তুলিতে চায় অমনি তার কাটাকাটা জবাব; তখন লোকটি বেশ বুঝিল যে, কামারসালের হাতুড়ি কেমন।

নরেন্দ্রনাথের মুখে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় ও রঙবেরঙের বোলচাল শুনিয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। লোকটি তখন অপ্রস্তুত হইয়া পালাইবার জন্য পথ খুঁজিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ তখন পুরামাত্রায় কৌতুক চালাইতেছেন। অর্ধপথে গিয়া নিবৃত্ত হওয়া তাঁহার ধাতস্থ ছিল না। যখন যে ভাবটি অবলম্বন করিতেন তখন তাহার শেষ সীমা পর্যন্ত চলিতেন, ইহাই তাঁহার ওজস্বিতার বিশেষ লক্ষণ ছিল। হাসিতামাসার ভিতর, মহাচাপল্যের ভিতর একটা গম্ভীর ভাব আনিতেন, জীবন্ত শক্তি একটা আনিতেন এবং তাহার ভিতর এমন একটা আকর্ষণ দেখাইতেন যে, কথাটা ভালই হউক বা চাপল্যেরই হউক সকলেই সেই কথা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিত। ইহাকেই বলে মোহিনীশক্তি। সাধারণ লোকের ভিতর ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

বুদ্ধি ও মেধা সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথ ও নিরঞ্জন মহারাজের কৌতুকপূর্ণ উক্তি—একদিন বলরামবাবুর বাটির সিঁড়িতে উঠিয়া প্রথম যে দালানটা পড়ে, নরেন্দ্রনাথ সেইখানে পায়চারি করিতেছেন এবং যোগেন মহারাজও কাছে রহিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ হাস্য করিয়া যোগেন মহারাজকে বলিতে লাগিলেন, "আমাদের এত বুদ্ধি মেধা কেন জানিস? আমরা যে Suicide-এর (আত্মহত্যার) বংশ, আমাদের বংশের অনেকগুলো Suicide-এ (আত্মহত্যায়) আত্মত্যাগ করেছে। আমাদের একটু পাগলামী ছিট আছে কিনা, তাইত আমাদের এত বুদ্ধি মেধা; তোদের মতন কি হিসেবী রে, নিক্তি দাঁড়িপাল্লা নিয়ে কেবল ওজন কচ্চিস তো ওজনই কচ্চিস! অত হিসেব করতে গেলে কি কোন বড় কাজ করতে পারা যায়। আর আমাদের কি জানিস—পাগলাটে মাথা, হিসেব-ফিসেবের ধার ধারে না; যা করবার তা একটা করে দিলুম, লাগে তাক, না লাগে তুক্কো।" নিরঞ্জন মহারাজ বর্তমান লেখককে বলিতেন, "দ্যাখ্, এই নরেনের এত বুদ্ধি কেন জানিস? নরেন খুব গুড়ুক ফুঁকতে পারে। আরে গুড়ুক না টানলে কি বুদ্ধি বেরোয়?

তুই ছোঁড়া চা ছেড়ে দে, চা খাসনি। তামাক খেতে শেখ, তখন দেখবি যে, নরেনের মতন মাথা খুলে যাবে। আর আমি এইজন্য এত করে তামাক খাই।" কথাটা অতি সামান্য হইলেও ইহার ভিতর কি একটা প্রগাঢ় ভালবাসা রহিয়াছে। নরেন্দ্রনাথের দোষটাও তাঁহার সতীর্থদিগের নিকট একটা গুণের পরিচায়ক হইয়াছে—ইহাকেই বলে ভালবাসা।

নেড়ে-উড়েকে লইয়া বলরামবাবু ও নরেন্দ্রনাথের হাসি তামাসা—এই সময়ে দুটি ভক্ত আসিতেন, বাড়ি মানিকতলার রেলের পুলের নিকট। একটির মাথার চুল ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া ও দাড়ি ছিল, অপরটির মাথায় টাক ও দাড়ি কামানো। উভয়েই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইতেন খুব ভক্তিমান ও বিনয়ী এবং যখন আসিতেন তখন দুই বন্ধুই একসঙ্গে আসিতেন এবং দু'জনে মিলিয়া একতারা লইয়া ভজন গাহিতেন। বলরামবাবু ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহাদের নাম দিয়াছিলেন—নেড়ে-উড়ে। এই জন্য তাঁহারা ভক্তবৃন্দের ভিতর নেড়ে-উড়ে নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের প্রকৃত নাম জানা নাই। ভক্তদ্বয় বাগবাজারে গেলে সকলেই তাঁহাদিগকে লইয়া বিশেষ আনন্দ করিতেন এবং নরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে লইয়া অনেক হাসিতামাসা আনন্দ করিতেন।

ঠাকুরের তিথিপুজায় নরেন্দ্রনাথের পূজার্চনা (শিবানন্দ স্বামী কথিত)—প্রথমে যখন বরাহনগরের মঠ স্থাপিত হয় তখন পূজা-পদ্ধতির তেমন বিধিব্যবস্থা ছিল না। ভক্তি-শ্রদ্ধাই একমাত্র নিয়ম ছিল। বিশেষ কোন প্রথা চলিত হয় নাই। একবার ঠাকুরের তিথিপূজা, প্রথম দু'তিন বছরের ভিতরই—নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "শশী, আমি আজ ঠাকুরের পূজা করব।" শশী মহারাজের বড়ই আহ্লাদ। ফুল চাউল গুছাইয়া দিলেন। নরেন্দ্রনাথ আসনে বসিলেন এবং দোরটি ভেজাইয়া দিয়া সকলকে ঠাকুরের ঘর থেকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। তখন সবে পাঁচ-সাত জন লোক। নরেন্দ্রনাথ আসনে বসিয়া

বহুক্ষণব্যাপী ধ্যান করিতে লাগিলেন। নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ—হাত নাড়া, পা নাড়া, ঘণ্টার আওয়াজ কিছুই নাই। অনেকক্ষণ পর ধ্যান সমাপন হইলে তখন দেখিলেন, পুষ্পপাত্রে পুষ্প-চালাদি যেমন ছিল তেমনই সব রহিয়াছে। কেনই বা সেগুলা ব্যর্থ যায়, সেইজন্য সব একসাথে মিলাইয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া চলিয়া আসিলেন। অবশ্য এইরূপ পূজা নরেন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে এরূপ নয়।

বরাহনগর মঠে খৃষ্টীয় উৎসব প্রচলনের উপলক্ষ—একবার শীতকালে সকলে মিলিয়া বাবুরাম মহারাজের দেশে গিয়াছিলেন। গঙ্গাধর মহারাজকে লইয়া সকলে খুব আনন্দ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে সকলের খেয়াল উঠিল যে, ধুনি জ্বালিয়া রাত্রিতে বসিয়া বাইবেল পড়িতে হইবে। একটা স্থানে ধুনি জ্বালিয়া সকলে মণ্ডলাকারে বসিয়া রাত্রে বাইবেল পড়িতে লাগিলেন। সকলের অতি আনন্দে রাত্রিটা কাটিল। দু'এক দিন পরে খবর হইল যে, সেটা খৃষ্টমাসের পূর্বাহ্ণ ছিল। সকলেই বলিলেন তা বেশ হইয়াছে। এই উপলক্ষ থেকেই মঠে খৃষ্টমাস উৎসবের উৎপত্তি হয়। বরাহনগর মঠের প্রথম অবস্থাতে সারদা মহারাজ কিছু ভোগ-উপকরণ সংগ্রহ করিয়া যীশুর চিত্রকে ভক্তি করিয়া পূজা করিতেন এবং পরেও তিনি দু'এক বৎসর এইরূপ পূজা করিয়াছিলেন।

স্যালভেশন্ আর্মি—বরাহনগর মঠ যখন প্রথম স্থাপিত হয় তখন কলিকাতা সহরে খৃষ্টানদিগের বড় প্রাদুর্ভাব। চৌমাথায়, গলির মোড়ে, হাটে-বাজারে খৃষ্টান পাদরীরা দাঁড়াইয়া লেকচার করিত এবং হিন্দুধর্মের নিন্দা গ্লানি করিত। পুরুষ ছাড়া, মেয়ে একদল তাহারা সৃষ্টি করিল—দেশী স্ত্রীলোক, দশটার সময় বাহির হইত, একহাতে একখানি বাইবেল, মাথায় একটি ছাতি দিয়া সব লোকের বাড়িতে যাইয়া বাইবেল শোনাইত—সেলাই করা শিখাইবে ও খৃষ্টান করিবে এইজন্য তাহারা সমস্ত বাঙ্গালী পাড়াটি ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহাদের সংখ্যা

অনেক ছিল ; সাধারণ লোকে তাহাদের 'ছাতিওয়ালী' বলিত। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে স্যালভেশন আর্মি বা (মুক্তি ফৌজ) প্রথম কলিকাতায় আসে। বিডন ষ্ট্রীটে বেঙ্গল থিয়েটারটি ভাড়া লইয়া তাহারা বক্তৃতা আরম্ভ করিল অপরাহ্ণবেলা। তাহারা থিয়েটার বাড়িটিকে স্যালভেশন আর্মি-র আড্ডা করিত, এবং রাত্রে যেমন নাচঘর তেমনি হইত। ইংরাজী কাপড় ছাড়িয়া তাঁহারা দেশী কাপড় পরিলেন এবং গৈরিকবসন পরিতে আরম্ভ করিলেন। তারপর তাঁহারা ইংরাজ রমণী আনিয়া দেশী কাপড় পরাইয়া বিডনস্কোয়ারে বক্তৃতা দেওয়াইতে লইয়া যাইতেন। বরাহনগরের বাজরের নিকট যে তে-মাথাটি আছে সেই রাস্তার উপর তাঁহারা একটি আড্ডা বা যীশুখানা খুলিলেন। তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানগুলিকে লোকে 'যীশুখানা' বলিত।

বরাহনগর মঠে খৃষ্টানদের আগমন ও বিতাড়ন—আহিরীটোলা নিবাসী দীননাথ সেন নামক জনৈক ব্যক্তি খৃষ্টান হইয়া স্যালভেশন আর্মিতে মিশিলেন। লোকটি সরল, ভক্তিমান ও নিরীহ প্রকৃতির ছিলেন। ভাবাবেশে কখন তিনি উল্লাসে নৃত্য করিতেন ; স্যালভেশন আর্মির লোকেরা এইজন্য তাঁহাকে 'Sen the Jumper,' অর্থাৎ লম্ফনকারী সেন বলিত। যাহা হউক, তাহারা খবর পাইল যে বরাহনগরে কতকগুলি যুবক একটি বাড়িতে থাকে, বিবাহ করে নাই এবং বেশ ঈশ্বরানুরাগী। এই সব ছোঁড়াদের যদি একবার জালে ফেলিয়া খৃষ্টান করানো যায় তবে ব্যবসাটা বেশ জবর চলিতে পারে। প্রথম তাহারা দুটি দেশী লোককে পাঠাইল, কিন্তু নাম ইংরাজী। এখন আর তাহাদের নাম স্মরণ নাই। এমন কি 'Sen the Jumper' ও মাঝে মাঝে যাইতে লাগিলেন। সেনবুড়ো সাদাসিদে লোক, মারপ্যাঁচের লোক নয়। অপর দুটি খৃষ্টান প্রথমে অতি ভক্তি দেখাইয়া বাইবেল খুলিয়া যীশুর কথা শুনাইতে লাগিল। কিছুদিন যাতায়াত করিয়া বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিল। খুব ভক্তি দেখাইত ; এবং যীশুর প্রতি যেন কতই ভক্তি। ক্রমে ক্রমে

তাহাদের স্বরূপ ফুটিতে লাগিল। তখন তাহারা একদিন শশী মহারাজ প্রভৃতিকে খৃষ্টান হইবার জন্য প্রস্তাবনা করিল এবং বলিল, যীশু ভিন্ন অপরে কেহ মুক্তি দিতে পারে না এবং আলোক প্রদান করিতে পারে না। যাহা হউক, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্মের বাদানুবাদ চলিতেছিল। যখন বুঝিল যে, যুবক সন্ন্যাসীবৃন্দ বেশ ভালরকম বাইবেল জানেন এবং বাইবেলের ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ঈশ্বরনিষ্ঠা তাঁহারা সকলেই আচরণ করিতেছেন এবং সেই মহান্ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, অপরপক্ষে কেবল কিছু কিছু বৃত্তির লোভে খৃষ্টীয় ধর্মমত বলিতেছে, কিন্তু অন্তরে কিছুই নাই, তখন তাহারা যুবক সন্ন্যাসীদিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিল। তখন তাহারা স্পষ্টাস্পষ্টি বলিতে লাগিল, "অনেক যুবতী বিলাতী মেম এসেছে, তাহাদের সহিত বিবাহ করাইয়া দিব, তোমরা খৃষ্টান হও।" শশী মহারাজ এই কদর্য কথা শুনিয়া একেবারে রাগে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন এবং তাহাদিগকে ভৎ‌সনা করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন এবং আর কখন তাহাদের আসিতে দিতেন না। বরাহনগরের বাজারের কাছে যে আড্ডাটি খুলিয়াছিল সেটিও বন্ধ হইয়া গেল। তাহার পর তাহাদের বিষয় বিশেষ কিছু আর জানা যায় নাই।

নরেন্দ্রনাথের প্রতি বলরামবাবুর ভালবাসা—বলরামবাবুর বৈঠকখানাঘরটি খুব সুন্দর করিয়া রঙ করা হইয়াছে। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বড় মানুষদের বৈঠকখানা যেমন নানাপ্রকারের রঙ করা হয়, বলরামবাবুরও বৈঠকখানা ঘরটি সেইরকম ভাবে রঙ করা হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথের সর্বদা থুথু ফেলা অভ্যাস ছিল। এই থুথু ফেলা অভ্যাসটি তাহাদের বংশের একটি দোষ ছিল। নরেন্দ্রনাথের প্রপিতামহের পাড়ায় নাম ছিল, 'থুথু ফেলা রামমোহন দত্ত'। নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্তেরও এই দোষটি ছিল এবং নরেন্দ্রনাথের অপর দুই ভাই মহেন্দ্র, ভূপেন্দ্রেরও এই অভ্যাসটি আছে। কিন্তু বংশের অপর

কাহারও এ দোষ দেখা যায় নাই। এইজন্যে নরেন্দ্রনাথ যেখানে সেখানে থুথু ফেলিতেন।

বলরামবাবুর ঘর নূতন রঙ করা হইয়াছে, সাবধানে থাকিলেও অনেক সময় দেওয়ালে থুথু পড়িয়া যাইত। কিন্তু বলরামবাবুর নরেন্দ্রনাথের প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। তিনি সদাসর্বদা একটি থুথু ফেলিবার ডাবর হাতে লইয়া নরেন্দ্রনাথের নিকট থাকিতেন। নরেন্দ্রনাথ নানাপ্রকার আলোচনা করিতেছেন এবং সময় সময় খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ যখন থুথু ফেলিবার জন্য উপক্রম করিতেছেন তখন বলরামবাবু এমনি সতর্ক হইয়া থাকিতেন যে, ডাবরটি হাতে লইয়া কখন বা সুমুখ থেকে কখন বা পেছন থেকে বলিতেন, "নরেনবাবু, দয়া করে এই ডাবরটির ভেতর থুথু ফেলুন, দেওয়ালের গায়ে ফেলবেন না।" নরেন্দ্রনাথ ডাবরে থুথু ফেলিয়া বলিতেন, "কি বলরাম, তোমার দেওয়ালের পেন্টিং-এর (Painting) উপর পাকা পেন্টিং হত, আচ্ছা না হয় ডাবরে ফেলছি।" এই প্রকারে নরেন্দ্রনাথ যে ঘরটিতে বসিতেন সেই ঘরে বলরামবাবু ডাবরটা হাতে করে অনুগত ভৃত্যের ন্যায় বেড়াইতেন। ইহাকেই বলে ভালবাসা। বলরামবাবু স্বহস্তে সেই ডাবর পরিষ্কার করিতেন, একটুও ঘৃণা করিতেন না।

বলরামবাবুর বংশ পরিচয়—বাগবাজারের সুবিখ্যাত ৺কৃষ্ণ বসুর বংশে ইঁহার জন্ম হয়; কটক, বৃন্দাবন প্রভৃতি বহুস্থানে ইঁহাদের জমিদারি আছে। মাহেশের রথ ইঁহাদের হইয়া থাকে। বলরামবাবু ধনাঢ্য ও বড় জমিদার হইলেও এমন বিনয়ী ও নম্রলোক জগতে খুব কমই দেখা যায়। তাঁহার গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিল, মুখে দাড়ি এবং মাথায় টাক ছিল। কথাবার্তায় অতি নম্র ও মধুরভাষী এবং সকলের কাছে অতি বিনীতভাবে থাকিতেন। সদাসর্বদা মাথায় পাগড়ি ব্যবাহার করিতেন। উদরাময় রোগে পীড়িত এইজন্য তাঁহার আহার বড় অনিশ্চিত ছিল।

বলরামবাবুর নরেন্দ্রনাথের বাড়িতে প্রথম আগমন—১৮৮৩ সালের শীতকাল, প্রাতঃকালে তিনি গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীটের বাড়িতে নরেন্দ্রনাথের সহিত প্রথম দেখা করিতে আসেন। তখন নরেন্দ্রনাথের পিতা জীবিত ছিলেন। প্রকাণ্ড বড় বাড়ি, বহু লোকজন। নরেন্দ্রনাথের পিতা বলরামবাবুর পরিচয় পাইয়া বড়ই খুসী হইলেন ; এবং সর্বদা বলিতেন,—"বলরামটি কি বিনয়ী—কৃষ্ণ বোসের বাড়ির ছেলে তো !" তখন বলরামবাবুর বয়স তিরিশ-বত্রিশ বৎসর হইবে। শীতকাল, এইজন্য তাঁহার পরিধান অন্য প্রকার ছিল। সাদা ক্যাম্বিসের জুতা সাদা মোজা, তুলোভরা পায়জামা, হাঁটু পর্যন্ত তুলোভরা কোট, গায়ে ঘেরফের করিয়া চাদর—বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণস্কন্ধের নিম্ন দিয়া পুনরায় বামস্কন্ধে আসিয়াছে, এবং মাথায় এক উষ্ণীষ। বর্তমান লেখককে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নরেনবাবু এখন আছেন কি ?" বর্তমান লেখক উত্তর করিলেন,—"হাঁ।" কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, একজন হিন্দুস্থানী এত স্পষ্ট বাংলা বলিতে পারেন। তাহার পর বলরামবাবুকে সঙ্গে লইয়া নরেন্দ্রনাথের পাঠাগারে গেলেন এবং পরে উভয়ের নানা বিষয়ের কথাবার্তা হইতে লাগিল।

বলরামবাবুর গাড়ি না চড়ার কারণ ও ভক্তদিগের প্রতি ভালবাসা—বলরামবাবু কখনও গাড়ি চড়িতেন না এবং লোকে অনুরোধ করিলেও তিনি বাড়িতে নিজের গাড়ি রাখিতেন না। তিনি বলিতেন,—"একদিন গাড়ি আর একদিন পায়ে হাঁটা, যদি ভবিষ্যতে গাড়ি রাখিবার সামর্থ্য না হয় তাহা হইলে লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, তাহার চেয়ে হেঁটে বেড়ানই ভাল।" অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাওয়ায় তিনি সকালবেলা সাদা ঘেরা-টোপ দেওয়া ছাতাটি হাতে করিয়া সমস্ত ভক্তদের বাড়ি একবার করিয়া যাইতেন এবং নরেন্দ্রনাথের বাড়িতে তাঁহার আত্মীয়দিগের খবর লইবার জন্য তিনি প্রায় নিত্যই আসিতেন। ঝড়বৃষ্টির জন্য যদি সকালবেলা না আসিতে পারিতেন তাহা হইলে অপরাহ্নে তিনি আসিতেন। বেলুড় মঠে ঠাকুর ঘরে তামার কৌটাতে

যে অস্থি আছে সেই কৌটা তিনি রামচন্দ্র দত্তের বাড়ির সম্মুখে তিনু কাঁসারীর কাছ থেকে তৈয়ারি করাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

বলরামবাবু ও বর্তমান লেখক—অবসর পাইলে তিনি বর্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া গঙ্গার ধার দিয়া পদব্রজে বরাহনগরের মঠে যাইতেন এবং বর্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া তিনি হরমোহন মিত্রের বাড়ি, রামচন্দ্র দত্তের বাড়ি প্রভৃতি অনেকের বাড়ি দেখা করিয়া আসিতেন এবং পথে চলিবার সময় নানা বিষয়ের কথাবার্তা হইত। একদিন বোসপাড়ার বাড়ি হইতে বলরামবাবু বর্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া কম্বুলেটোলার বিপিন ডাক্তারের বাড়ি যাইতেছিলেন। গোয়ালাদের ঘরের পার্শ্ব দিয়া পগার বুজানো গলি দিয়া যাইলে শীঘ্র যাওয়া যায় কিন্তু রাস্তাটি বড় নোংরা, সড়ক দিয়া যাইলে পথটি ভাল কিন্তু একটু দেরী হয়। বলরামবাবু বলিলেন,—"চলনা হে, এই গলি দিয়া গেলে শীঘ্র হয়।" বর্তমান লেখক উত্তর করিলেন—"শীঘ্র হয় বলিয়া খারাপ, নোংরা পথ অবলম্বন করা ভাল নয়, একটু দেরী হলেও ভাল পথ দিয়ে যাওয়াই শ্রেয়।" বলরামবাবু কথাটি শুনিয়া বর্তমান লেখকের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন এবং অপ্রতিভ, হর্ষিত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলেন,—"ঠিক বলেছ, জীবনের ব্যাপারটা এই রকম। একটু দেরী করে ঘুরে যাওয়া ভাল তবু নোংরা পথে যাওয়া ভাল নয়, সমস্ত জীবনটা এই কথাটা মনে রেখ।"

দুরারোগ্য ব্যাধিতেও বলরামবাবুর শান্ত ভাব ও ভালবাসা—১৮৮৯ বা ৯০ সালে যখন প্রথম ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় এবং বহু লোক মারা যায় সেই সময় বলরামবাবুও ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যান। ফুস্‌ফুস্ দুটি ফুটা হইয়া গিয়াছে, মুখে পচাগন্ধ বাহির হইতেছে, ডাক্তার বলিয়াছেন শুলেই শ্বাসরোধ হইয়া মারা যাবে, অতএব বসে থাকাই আবশ্যক। চারিদিকে তাকিয়ার উপর তাকিয়া দিয়া তাঁহাকে রাখা হইয়াছে এবং তিনি বসিয়া বসিয়া বালিসের এদিক ওদিক্ করিতেছেন। শিবানন্দ স্বামী, নিরঞ্জন মহারাজ ও গুপ্ত মহারাজ তিন জনে খুব শুশ্রূষা

করিতেছেন। বর্তমান লেখক বিকালবেলা উপস্থিত হইয়া বলরামবাবুর কাছে বসিলেন। তিনি তখন ক্ষীণ হইয়া গিয়াছেন, শব্দ অস্পষ্ট, অন্তিমসময় আসন্ন, যন্ত্রণা অতীব ভীষণ! স্ত্রী, পুত্র কাহাকেও নিকটে আসিতে দেন নাই, কেবল সাধুমহোদয়েরা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকিবেন ও মুখে জল, ঔষধাদি দিবেন। এইরূপ অবস্থাতেও বলরামবাবুর কি আশ্চর্য ভালবাসা! বর্তমান লেখক উপস্থিত হইয়া অতি বিষণ্ণভাবে তাঁহার কাছে বসিলেন এবং কোন কথাই বলিতে পারিতেছিলেন না। বলরামবাবু এমন অবস্থাতেও বর্তমান লেখকের নাম করিয়া ডাকিয়া তাহার বাড়ির প্রত্যেকের নাম করিয়া সকলে কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অতি সস্নেহে বলিলেন, "পাশের ঘরে তুলসীরাম চা করিতেছে, তুমি যাইয়া চা খাইও।" নিজের প্রাণ যাইতেছে, যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছেন, জমিদারি ও স্ত্রীপুত্রের কোন নাম পর্যন্ত করিতেছেন না, কিন্তু বর্তমান লেখক চা ভালবাসেন, তাহাকে চা খাওয়াইয়া তিনি যে প্রীত হইবেন ইহাই তখন তাঁহার বিশেষ চিন্তা হইল। মৃত্যুকালেও তাঁহার সেই অসীম ভালবাসা! এইরূপ ভালবাসা জগতে খুব কম দেখা গিয়াছে। বলরামবাবু, সম্পর্কে বাবুরাম মহারাজের ভগ্নীপতি ছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল রায়—পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গৈরিকবসন ধারণ করিয়া বরাহনগরের মঠে আসিয়াছিলেন। ১৮৮৭ সালের পরে বর্ষাকালে রামতনু বসুর গলির বাটিতে পুনরায় তিনি আসিয়াছিলেন; তখন তাঁহার সাদা ধুতি, গায়ে পিরান-পরা ইত্যাদি বেশ ছিল। অমৃতলাল রায় তখন সবেমাত্র আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উভয়ে মিলিয়া অপরাহ্ণে অমৃতলাল রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সেদিন অমৃতলাল রায়ের আমেরিকার জীবনের বিষয় অনেক কথাবার্তা হইয়াছিল। কষ্টতে পড়িয়া মানুষ কি করিয়া উন্নতিলাভ করিতে পারে তাহাই সেইদিন তথায় প্রধান বক্তব্য

হইয়াছিল, এবং তাঁহার "Reminiscences, English and American" নামক পুস্তকখানি অমৃতলাল রায় নরেন্দ্রনাথকে উপহার দিলেন। কিছুদিন পরে সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত অমৃতলাল রায় আসিয়া রামতনু বসুর গলির বাটিতে নরেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিয়াছিলেন এবং ইহার কিছুদিন বাদে তিনি 'Hope' নামক কাগজখানি বাহির করেন। অমৃতলাল রায় তারকেশ্বরের রেলের লাইন করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং বন্ধু হিসাবে অনেক বিষয় নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

পূজনীয় শিবনাথ শাস্ত্রী ও নরেন্দ্রনাথ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পূজনীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইংলণ্ড হইতে ফিরিলে যোগেন মহারাজ ও নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সুমুখের বাটিতে দেখা করিতে যান। শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত নরেন্দ্রনাথের ইংলণ্ডের বিষয় এবং তাহাদের আচার-পদ্ধিত, সমাজ, বাণিজ্য প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচনা হইল। শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনে ইংলণ্ডে কি ঘটিয়াছিল সে বিষয়েরও অনেক কথাবার্তা হইল। শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত নরেন্দ্রনাথের পূর্বে বিশেষ জানাশুনা ছিল, সেই পূর্ব পরিচয়ের জন্য সাম্যভাবে অনেক কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ অকপট-ভাবে শাস্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শাস্ত্রী মশাই, আপনি নাকি বিলাত থেকে এসে সাহেব ব'নে গেছেন? বড় নাকি সাহেবী ঢং ধরেছেন? Card-এ নাম না লিখে দিলে দেখা করেন না? এ দেশে ও সব বিলাতী ঢং কচ্ছেন কেন?" শাস্ত্রী মহাশয় ইহা শুনিয়া কিছু অপ্রতিভ হইয়াছিলেন।

রাখাল মহারাজের প্রতি নরেন্দ্রনাথের বিশেষ দৃষ্টি—বরাহনগরের মঠ যখন মাস পাঁচ-ছয় হইয়াছে, রাখাল মহারাজ তখন বাহিরের দিকে ছোট ঘরটিতে বসিয়া অনবরত জপ করিতেন, কাহারও সহিত কথাবার্তা বিশেষ বলিতেন না। বয়স অল্প, বড় ভাল মানুষ। সকলেই কাজকর্ম করিতেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ সকলকে বলিতেন, "রাখালকে কেউ খাটাইও

না।” শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে বলিয়া গিয়াছিলেন, রাখাল বালক ও দুর্বল, নরেন্দ্রনাথ যেন ওকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই জন্য রাখাল মহারাজকে সকলেই বিশেষ যত্ন করিতেন ও নরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। মনোমোহন মিত্র রাখাল মহারাজের পূর্বাশ্রমের সম্বন্ধে শ্যালক ছিলেন। একদিন নরেন্দ্রনাথের সহিত মনোমোহন মিত্রের দেখা হইলে মনোমোহন মিত্র রাখাল মহারজের খবর জিজ্ঞাসা করেন। নরেন্দ্রনাথ ঈষৎ ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, “তোমাদের রাখাল মরে গেছে, আমাদের রাখাল বেঁচে আছে অর্থাৎ রাখাল মহারাজ এখন সাধু হইয়াছে, তাহার নূতন জীবন হইয়াছে, পূর্বাশ্রমের কথা কওয়া আর ঠিক নয়। যাহা হউক, এই কথাতে মনোমোহন মিত্র ও তাঁহার আত্মীয়েরা বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন ও নানা বিষয়ে দিনকতক গণ্ডগোল করিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধেয় গিরিশ চন্দ্র ঘোষ কথিত—নাগ মহাশয়ের বৈরাগ্য— নাগমহাশয় কুমারটুলির গঙ্গার ধারের ছোট ঘরটিতে থাকিতেন। তিনি ঈশ্বর লাভের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং দিবারাত্র জপধ্যান করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন যে, আহার ত্যাগ করাই শ্রেয়; তিনি দ্বিপ্রহরের সময় হাঁড়িতে জল দিয়া চাল দিতেন, ভাত একটু ফুটিলে যখন নাবাইবার সময় হইত তখন তাঁহার বৈরাগ্য-ভাবও অতীব প্রবল হইয়া উঠিত, “সারাদিন গেল, ভগবান পাইলাম না, এই মুখে ভাত দিব? এই মুখে ছাই দিব!” এই বলিয়া তিনি উনুনের কাঠ লইয়া হাঁড়িতে মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন এবং সারাদিন ও রাত্রে উপবাসী থাকিতেন; দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিনও এইরকম করিলেন। অবশেষে কথাটি নরেন্দ্রনাথের কানে গেল এবং নরেন্দ্রনাথ ত্বরিতপদে নাগমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ যদিও আহার করিয়াছিলেন তথাপি নাগ মহাশয়কে সান্ত্বনা দিবার জন্য পুনরায় আহার করিবেন এবং নাগ মহাশয় তাঁহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইবেন এরূপ আদেশ করিলেন। নাগ মহাশয় তখনই আনন্দে

রাঁধিতে লাগিলেন এবং উপস্থিত মত যাহা হউক কিছু রাঁধিলেন। নরেন্দ্রনাথ আহার করিতে লাগিলেন এবং কিছু খাইয়াই অবশিষ্টাংশ নাগ মহাশয়কে খাইতে আদেশ করিলেন। নাগ মহাশয় প্রথম আপত্তি করিতে লাগিলেন; তিনি আহার ত্যাগ করিয়া দেহত্যাগ করিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ যখন বলিলেন যে, "সাধুর প্রসাদ খাও, খাইলে মঙ্গল হইবে" তখন অগত্যা তিনি খাইতে লাগিলেন। নাগ মহাশয়কে তাহার পর অনেক কথা কহিয়া, শান্ত সুস্থির করিয়া নরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলেন।

নাগ মহাশয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি—১৮৯১ সালে গরমকালে নাগ মহাশয় আসিয়া দিনকতক গিরিশবাবুর বাড়িতে ছিলেন। যোগেন মহারাজ, শরৎ মহারাজ, কালী বেদান্তী ও বর্তমান লেখক একদিন বেলা সাড়ে চারটা কি পাঁচটার সময় বলরামবাবুর বাড়ি হইতে গিরিশবাবুর বাড়িতে তাঁহাকে দেখিতে যান। সদর দরজার উপরে যে ঘরটি সেইখানে তিনি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন, অপর সকলে ঘরের পশ্চিমদিকের অংশে বসিলেন। গিরিশবাবু নাগ মহাশয়ের কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—নাগ মহাশয় শুধু দুধ আর ভাত খান, আর কিছু খান না; তাহার পর যোগেন মহারাজের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ছাখ্ যোগেন, আমি কাল করলুম কি জানিস? নাগ মহাশয় মাছ খান না—আমি মাছ খাচ্ছিলাম। আমি করলুম কি, পাত থেকে ডিম তুলে নাগ মহাশয়ের পাতে ফেলে দিলুম। নাগ মহাশয় বললেন, 'আপনি দিচ্ছ্যান প্র-সাদ—প্র-সাদ খাইলাম।' আমি খুব আহ্লাদ করতে লাগলুম। আর ছাখ্, নাগ মহাশয়কে ওই সামান্য একখানা কম্বল দিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছি", এই বলিয়া পাশে একখানা কম্বল দেখাইলেন। "কি শীত কি গ্রীষ্ম, নাগ মহাশয় এই কম্বলখানি গায়ে না দিয়ে পুঁটুলি বেঁধে মাথায় করে নিয়ে বেড়ান। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'গিরিশবাবু দিয়েছেন, এ কম্বল কি গায়ে দিতে পারি! তাই মাথায় করে রাখি'।

নাগ মহাশয়ের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের রোগ নিজ দেহে লইবার সঙ্কল্প—কাশীপুরের বাগানে যখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বড় অসুখ তখন একদিন হাঁটু পেতে জোড়হাত করে নাগ মহাশয় বলতে লাগলেন, 'আজ্ঞা দ্যান্, আজ্ঞা দ্যান্'। আমরা ত কিছুই প্রথমে বুঝতে পারিনি, এ আবার কি চায়? তিনি সেটা বুঝতে পেরেছিলেন তাই সকলকে বললেন, 'ওরে একে ঠাণ্ডা কর্, ওরে একে ঠাণ্ডা কর'। তারপরে আমরা বুঝতে পারলুম যে, নাগ মহাশয় তাঁহার গলার ঘা'টা নিজের দেহে নেবার সঙ্কল্প করেছিলেন; তাই করুণস্বরে দৃঢ়ভাবে যাচ্না করছিলেন; তাহলে নাগ মহাশয়ের দেহটা নাশ হয়ে যাবে এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সুস্থ হয়ে উঠবেন।" যখন এইসব কথা হইতেছিল তখন নাগ মহাশয় পা দুটি সঙ্কোচ করিয়া নীচের দিকে রাখিয়া, অর্থাৎ হাঁটুর উপর হাঁটু মুড়িয়া তাহার উপর বসিয়া মৃদুস্বরে কি বলিতেছিলেন—চক্ষু জলে পরিপূর্ণ এবং কোমার ও বুক দোলাইতেছিলেন।

হাঁটু দুটি সঙ্কোচ করিবার কারণ পরে বুঝা যাইল। জাজিমখানার উপর তাঁহার পা ছিল এবং শরৎ মহারাজ, যোগেন মহারাজ ও কালী বেদান্তী সেইখানে বসিয়াছিলেন। পাছে তাঁহার পাদস্পৃষ্ট জাজিম সাধুদের গা স্পর্শ করে সেইজন্য তিনি পদদ্বয় সঙ্কোচ করিয়া লইলেন। শরৎ মহারাজ যোগেন মহারাজ ও কালী বেদান্তী কিছু জিজ্ঞাসা করিলে নাগ মহাশয় "আমি সামান্য লোক, আমি কি বলিব", অতি বিনীতভাবে করজোড়ে এই কথাটি বলিতে লাগিলেন। কিন্তু বর্তমান লেখকের সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় সস্নেহে অনেক কথা কহিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার দেহ কৃশ, মুখে দাড়ি ছিল, কিন্তু চক্ষুদ্বয় প্রদীপ্ত ও তেজঃপূর্ণ।

রাখাল মহারাজ—রাখাল মহারাজ কখন বরাহনগর মঠে, কখন বা বলরামবাবুর বাটির বড় ঘরটিতে থাকিতেন। এই সময় তাঁহার মনের আবেগ অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বলরামবাবুর বড় ঘরটির পূর্বদিকের দেওয়ালে একখানি যীশুর তৈলচিত্র ছিল। রাখাল মহারাজ

পূর্বদিক থেকে দরজার কাছে মেঝেটিতে বসিয়া অনবরত জপ করিতেন। চক্ষুদ্বয়ে অন্তর্দৃষ্টি, কাহারও সাথে কথাবার্তা কহিতেন না; অতি স্থির, কথাগুলি যেন মধু মাখানো, সততই শঙ্কিত, পাছে কেহ কিছু তাঁহাকে বলে বা নিজে জ্ঞানতঃ কাহাকেও কিছু অপ্রিয় কথা বলে ফেলেন। তাঁহার পক্ষে তখন জগৎ যেন শূন্য হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। জগৎ বলে আর কোন জিনিস নাই, যদি কিছু থাকে তাহা কেবল এক ভগবান। একেবারে শিশুর মতন স্বভাব, চেঁচিয়ে কথা বলবার ক্ষমতা নাই, সর্বদা বিভোর আর ঠোঁট দুটি একটু একটু নড়ছে—ইহাই ছিল তাঁহার জপের চিহ্ন; তিনি সদাসর্বদা জপ করিতেন। বারাণ্ডাতে পায়চারি কচ্ছেন, তখনও চুপ করে জপ কচ্ছেন। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কাহারও সাথে কথাবার্তা কহিতেন না।

নরেন্দ্রনাথের মা ও বাবুরাম মহারাজ—ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৮৮৭ সালে একদিন সকালবেলা এগারটার সময় বাবুরাম মহারাজ ৭নং রামতনু বসুর গলির বাটিতে গেলেন। শুধু পা, কোঁচার কাপড়টি গায়ে দেওয়া, দেখিতে—বয়স কুড়ি-বাইশ বৎসর হইবে, কৃশ এবং ফ্যাকাসে সাদা রং। নরেন্দ্রনাথের মাতা তখন উপরে দোতলায় দরমার বেড়া দেওয়া একটি খোলার ঘরে বসিয়া রাঁধিতেছিলেন। বাবুরাম মহারাজ উপরে উঠিয়া দোরের চৌকাটে গিয়া বসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, কি হচ্ছে?" নরেন্দ্রনাথের মাতা বলিলেন, "এস বাবা, বস—এই রাঁধছি, পেটে ত দুটো দিতে হবে।" বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "তা মা আমিও এখানে দুটি খাবো। কি রাঁধছেন?" নরেন্দ্রনাথের মাতা বলিলেন, "ভাত ডাল আর একটা চচ্চড়ি—আর কি রাঁধব বল?" বাবুরাম মহারাজ অতি সরল এবং দীন ভাবে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। শেষে তিনি দম্ করে ঘরের ভিতর গিয়ে বসলেন এবং বঁটিখানা নিয়ে কুটনো কুটতে লাগলেন। কুটনোগুলি কুটে কাল পাথরের থালাখানিতে দিয়ে আবার শিলেতে বাটনা বাটতে লাগলেন। বাটনা বেটে পাথরের ভাঙা আধখানা থালাতে বাটনাগুলি ভিন্ন ভিন্ন করে

রাখলেন, পরে হাত দুটি ধুয়ে নরেন্দ্রনাথের মায়ের কাছে চুপটি করে বসে রইলেন। নরেন্দ্রনাথের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ বাবুরাম, বলরামবাবুরা এত বড়মানুষ, তোমার মা এত বড়মানুষ, তাদের পাঁচ-ব্যঞ্জন ভাত! তা না খেয়ে তুমি এই শুকনো আলোচালের ভাত, একটু চচ্চড়ি খেতে চাচ্ছ কেন গা? এতে যে তোমার কষ্ট হবে। তোমার পাঁচটা তরকারি, ঘি-দুধ খাওয়া অভ্যাস। বিধবার রান্না আলোচাল, একটু তরকারি দিয়ে খাওয়া—তোমার যে কষ্ট হবে গো!" নরেন্দ্রনাথের মাতা পাছে বাবুরাম মহারাজের কষ্ট হয় এইজন্য এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন এবং পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ বাবুরাম, তোমার মা কোথায়?" বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "আমার মা আঁটপুরে গেছেন। মা থাকলে আমি মার কাছে যাই, কিন্তু মা চলে গেলে বৌদের বা অপর কাহার কাছে যেতে আমার ইচ্ছা হয় না; পাছে কেউ কিছু মনে করে তাই আমি ওদিক্ থেকে সরে আসি। আপনার হাতের রান্না বড় পবিত্র তাই আমি আপনার কাছে আসি।" নরেন্দ্রনাথের মাতা খুব আহ্লাদিত হলেন এবং বাবুরাম মহারাজকে খুব যত্ন করে খাওয়ালেন। বাবুরাম মহারাজ ঐরূপ মাঝে মাঝে নরেন্দ্রনাথের মাতার হাতে খাইবার জন্য যাইতেন এবং নরেন্দ্রনাথের মাতাও বাবুরাম মহারাজকে বড় স্নেহ করিতেন। বাবুরাম মহারাজের মনের ভাব তখন অতি দীন হীন, একেবারে যেন নিরাশ্রয় হয়েছেন। সকলের কাছে বিনীত, যেন জোড়হাত করে রয়েছেন। কেহ গাল দিলে প্রতিবাদ করতেন না; এবং এত অমায়িক যে তাহার কথা কিছু বলা যায় না; কাদার মতন নরম হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যে কথাগুলি মুখ দিয়া বলিতেন বা যেটুকু কাজকর্ম করিতেন সেগুলি কি ভালবাসা মাখা, স্নেহপূর্ণ ও ভাবে পরিপূর্ণ ছিল! সারা দিন-রাত জপ করা তাঁহার একমাত্র সহায় ও সম্বল হয়েছিল! নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সংক্রান্ত যা কিছু বস্তু, সমস্তই বাবুরাম মহারাজের নিকট মহা পবিত্র বলিয়া বোধ হইত।

দক্ষিণেশ্বরের উৎসব—১৮৮৬ সালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহ-ত্যাগের পর তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষ করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে একটি করিয়া উৎসব হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপস্থিত কালে এটি প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। তখন অতি সামান্যভাবে হইত, জনকয়েকমাত্র ভক্ত উপস্থিত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। যাহা হউক, তাঁহার তিরোভাবের পর ইহা বাৎসরিক উৎসবরূপে পরিগণিত হইল। বরাহনগরের মঠে নিত্যনৈমিত্তিক পূজা হইত। সংক্ষেপে ঘট স্থাপনা করিয়া ৺দুর্গা পূজাও হইত এবং তিথি-পূজা সামান্যভাবে হইত। তখন বাৎসরিক উৎসবটা মঠের হাতে ছিল না; মনোমোহন মিত্র, হরমোহন মিত্র, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, বৈকুণ্ঠ সান্ন্যাল, হরমোহন চক্রবর্তী ও অপর সকলে থাকিয়া বলরামবাবুর বাড়িতে সমস্ত ফর্দ করিতেন এবং হরমোহন মিত্র চাঁদা সংগ্রহের জন্য বহির্গত হইয়া যথাসম্ভব চাঁদা আনিতেন। প্রথম কয়েক বৎসর উৎসবে একশত হইতে পাঁচশত পর্যন্ত লোক হইয়াছিল। এখনকার হিসাবে উহা অতি সামান্য বলিয়া পরিগণিত হইবে, কিন্তু তখনকার দিনে ঐ ভক্ত মণ্ডলীর সমাবেশ অতি আনন্দপ্রদ ছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শয্যা ও ঘরটি নানাপ্রকার পুষ্প ও পত্রাদি পরিশোভিত হইত; উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ধর্মদাস সুর ইঁহারা বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং তাঁহাদের সাথে আরও অনেকেই থাকিতেন। বড় কুঠির পশ্চিম দিকের আমতলার নীচে বাণ কাটিয়া ভোগ রান্না হইত। মুগের ডালের ভুনিখিচুড়ি, আলুকপির দম, দই, বোঁদে ও একটা চাটনি এইটাই সাধারণতঃ হইত এবং বেসম্ দিয়া বেগুন ভাজাও কয়েকবার হইয়াছিল। প্রাতে আগন্তুক ব্যক্তিদিগেকে লুচি ও হালুয়া অল্প পরিমাণে দেওয়া হইত। অনেকেই নানাপ্রকার ফলমূলাদি ও মিষ্টান্ন লইয়া যাইতেন, তাহাও লোকে কিছু কিছু পাইতেন। পরামাণিক ঘাটের পরামাণিকদের বাড়ির বৈদ্যনাথ পরামাণিক ও কিশোরীমোহন রায়, যাঁহাকে কৌতুকছলে সকলে 'আব্দুল দাদা' বলিয়া ডাকিত,

এই দুইজন ও বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয় রন্ধনশালার তত্ত্বাবধান করিতেন ; অপর সকলেও আবশ্যকমত কার্য করিতেন ; কুঠিবাড়ির বড় ঘরটিতে বৈঠকী গান হইত। নারায়ণ চন্দ্র (নারায়ণ দাদা) নামক জনৈক দীর্ঘাকৃতি গৈরিকবসনধারী ব্যক্তি কয়েক বৎসর গান করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে পাখোয়াজ সঙ্গত হইত। সুবিখ্যাত পাখোয়াজ-বাজিয়ে গোপাল মল্লিকও উপস্থিত থাকিতেন। তখন এত কীর্তন হয় নাই, ধ্রুপদ গানটা অধিক হইত। নরেন্দ্রনাথও এক বৎসর অনবরত ধ্রুপদ গান গাহিয়াছিলেন। ভোগ নিবেদন হইলে সকলে বড় কুঠির বারাণ্ডায় ও ভিতরকার ঘরটিতে প্রসাদ পাইতে বসিতেন; লোক অল্প হইত এবং ঐ স্থানেই সঙ্কুলান হইত। শালপাতা পাতিয়া সারিবন্দী হইয়া লোক প্রসাদ পাইতে বসিতেন ও মহানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। অনেকে আবার তিন-চারিখানি শালপাতা পাশাপাশি করিয়া একটি বড় ঠাঁই করিতেন। প্রসাদ তাহাতে ঢালিয়া দেওয়া হইত এবং সকলে তাহার চারিদিকে গোল হইয়া বসিয়া একত্রে আহার করিতেন। যাহাদের ভোজন শেষ হইত, তাহারা উঠিয়া যাইত এবং তৎপরে লোক আবার তথায় আসিয়া বসিত।

এইরূপ একপাত্রে বহুলোক প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। ইহাতে সকলেই বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। প্রসাদ উচ্ছিষ্ট হয় না, ভক্তের ভিতর জাতিবিচার নাই, সব একজাত এই ভাবটি তখন বিশেষ ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। সকলেই প্রাতে যাইতেন, গঙ্গায় স্নান করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহে প্রণাম করিয়া পঞ্চবটীর তলায় বসিয়া ভগবানের চিন্তা করিতেন এবং নানারূপ সৎকথায় এবং সৎ-চিন্তায় দিনটি অতিবাহিত হইত। সকলেই পরিচিত লোক, সকলেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ভক্ত এইজন্যই ঘনিষ্ঠ ভাবটি অতি দৃঢ় ও মধুর বোধ হইত। পরে ক্রমে ক্রমে উৎসবের ব্যাপার বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

নৃত্যগোপাল মহারাজের পীড়া—১৮৮৬ সালের শেষ সময় বা ১৮৮৭ সালের প্রথমে রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে নৃত্যগোপাল মহারাজ বা

জ্ঞানানন্দ অবধূতের সঙ্কটাপন্ন পীড়া হয়। তখন তাঁহার জীবনের কোন আশা ছিল না। নরেন্দ্রনাথ, রাখাল মহারাজ প্রভৃতি সকলেই থাকিয়া তাঁহার বিশেষ শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন এবং আরোগ্যলাভ করিলে বরাহনগর মঠে লইয়া রাখিবেন এইরূপ স্থির করিলেন তিনি শিবানন্দ স্বামীর সহিত কঠোর তপ-জপ করিয়াছিলেন এবং উভয়েই সমবয়স্ক হওয়ায় তখন বেশ দুজনার হৃদ্যতা ছিল। আরোগ্যলাভ করিয়া তিনি ৺কাশীধামে চলিয়া যান ; তাহার পর একবার মাত্র তিনি দক্ষিণেশ্বরের উৎসবে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর আর তিনি কোন সম্পর্ক রাখেন নাই। তিনি ভাবানীপুরের মনোহরপুকুরে "মহানির্বাণ মঠ" স্থাপন করেন।

১৮৮৭ সালে শীতকালে রামচন্দ্র দত্তের একটি ছোট মেয়ে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায়। খবর পাইবামাত্র নরেন্দ্রনাথ, রাখাল মহারাজ, শিবানন্দ স্বামী প্রভৃতি অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং খুব শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মেয়েটি বাঁচিল না।

যোগোদ্যান ও বরাহনগর মঠ—নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেই রামচন্দ্র দত্তের সহিত মাঝে মাঝে দেখা করিয়া আসিতেন এবং যে রকম সম্মান করা উচিত সেইরূপ সম্মান করিতেন। সদ্ভাব খুবই ছিল তবে আশ্রম দুটি ভিন্ন হইয়াছিল—কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান ও বরাহনগর মঠ—এবং দুজনাদের সাধনপ্রণালীও বিভিন্ন ছিল।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অস্থির ঘড়াটি মাথায় লইয়া শশী মহারাজ রামচন্দ্র দত্তের বাড়ি হইতে সংকীর্তনের দল সঙ্গে লইয়া কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে চলিলেন। প্রথমপথটা শশী মহারাজ ঘড়াটি মাথায় করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পথ অনেক দূর হওয়ায় শেষপথে গোপাল দাদা ঘড়াটি মাথায় লইয়াছিলেন। নূতন গান কিছু তৈরি না হওয়ায় গিরিশ বাবুর চৈতন্য-লীলার শেষ গানটি সকলে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিলেন :—

"হরি, মন মজায়ে লুকালে কোথায় ?

আমি ভবে একা, দাও হে দেখা,
প্রাণসখা রাখ পায়।
কালশশী বাজালে বাঁশী,
ছিলাম গৃহবাসী, করলে উদাসী,
কুল ত্যজে হে, অকূলে ভাসি ;
হৃদ্‌বিহারী, কোথায় হরি,
পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়।"

কিন্তু যখন রামচন্দ্র দত্ত কাশীপুরের বাগানে বলিলেন যে, অস্থি কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে রাখা হইবে, তখন নিজস্ব কোন স্থান না থাকায় সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া শশী মহারাজ ঘড়া হইতে অস্থি ও ভস্ম অনেক পরিমাণে বাহির করিয়া লইলেন এবং স্বতন্ত্র অন্য একটি পাত্রে রাখিয়া শ্রদ্ধাসহকারে ধূপধূনাদি দিতে লাগিলেন। শশী মহারাজের এই সংগৃহীত অস্থি ও ভস্ম বেলুড় মঠে অদ্যাপি সংরক্ষিত রহিয়াছে।

হারু কাওরা নামক জনৈক রাজমিস্ত্রী বেদটি অস্থির কলস রাখিয়া নির্মাণ করিয়াছিল। গৃহী ভক্তেরা যথা—গিরিশবাবু, কালীপদ (এমরেম্) প্রভৃতি কাঁকুড়গাছিতেই বেশী সংলগ্ন হইলেন। সুরেশ চন্দ্র মিত্র, বলরাম বসু, মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত (মাষ্টার মহাশয়) ইঁহারা বরাহনগর মঠের পক্ষাবলম্বী রহিলেন। যাহাই হউক, সর্বদা পরস্পরে দেখাশুনা হইত এবং খুব সদ্ভাবও ছিল। কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানের পূজা পাঠ চালাইবার জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাগিনেয় হৃদয় মুখোপাধ্যায় কিছুদিন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হওয়ায় উহার পরিবর্তন করা হয় এবং রামচন্দ্র দত্ত স্বয়ংই পূজা করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি কাঁকুড়গাছির উদ্যানে বাস করিতেন। প্রাতে পূজা ও সেবাদি করিয়া ও প্রসাদ পাইয়া একেবারে মেডিকেল কলেজে চলিয়া যাইতেন, কারণ তিনি Chemistry-র Assistant Professor ছিলেন এবং রসায়ন শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন।

তাহার পর কলেজ হইতে মধু রায়ের গলির বাড়িতে যাইতেন এবং তথায় সকলের সহিত দেখাশুনা করিয়া ও সব খবর লইয়া বেলা পাঁচটার সময় কাঁকুড়গাছির উদ্যানে চলিয়া যাইতেন ও তথায় রাত্রির পূজাদি করিয়া প্রসাদ পাইয়া অবস্থান করিতেন।

অপূর্ব ও শিবরাম—অপূর্ব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তখন কাঁকুড়-গাছির উদ্যানে বাস করিতেন। তিনি দুপুর বেলা অফিসে চাকরি করিতেন, তাহাতে সামান্য কিছু পাইতেন এবং সকাল-সন্ধ্যায় কাঁকুড়গাছির উদ্যানে থাকিয়া সাধন-ভজন করিতেন। তিনি বেশ সাধক ছিলেন এবং অতি ধীর ও বিনয়ী লোক ছিলেন।

এই সময় শিবরাম নামক একটি ব্রাহ্মণকুমার কাঁকুড়গাছির উদ্যানে থাকিতেন ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের খুব সেবা করিতেন। তিনি রামচন্দ্র দত্তের বিশেষ অনুগত ছিলেন। তাহার পর তিনি ঘাটালে গিয়া বাস করেন এবং মাঝে মাঝে আসিয়া দেখাশুনা করিয়া যাইতেন।

ঠাকুরের ভোগ দেওয়া সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথ ও রামচন্দ্র—১৮৮৭ সালে কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান যখন স্থাপিত হয় তখন নরেন্দ্রনাথ একদিন মানিকতলার বাজার হইতে কই মাছ লইয়া গিয়া কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভোগ দিয়াছিলেন। রামচন্দ্র দত্ত বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মানুষ, তিনি ঠাকুরবাড়িতে, বিশেষতঃ দেবতাকে মাছমাংস ভোগ দেওয়া উচিত বিবেচনা করিতেন না। যখন ভোগ দেওয়া হয় তখন রামচন্দ্র দত্ত উদ্যানে ছিলেন না, মেডিকেল কলেজে চলিয়া গিয়াছিলেন। অপরাহ্নে আসিয়া ভোগের কথা শুনিয়া একটু বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সকল কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ অতুলবাবুর কাছে বলিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কি রামচন্দ্র দত্তের নিজস্ব, না তিনি বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন ছিলেন? তিনি সাধারণ অবস্থায় যে সকল জিনিস আহার করিতেন ও যে সকল জিনিস তাঁহার প্রিয় ছিল, তাঁহাকে তাঁহার সেবাতে সেই জিনিস দেওয়া হইবে, ইহার কোন অন্যথা হইবে না।" ইহা কথিত আছে যে, রামচন্দ্র দত্ত কিছুদিন

পরে স্বপ্ন দেখেন যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মাছ দিয়া ভোগ দিবার জন্য যেন তাঁহাকে বলিতেছেন। তাহার পর রামচন্দ্র দত্ত বৎসরে একদিন করিয়া মাছ দিয়া ভোগ দিতেন। সাধারণের নিকট কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোভাবের উৎসবটি প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয় কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব ও অপর অপর সমুদয় উৎসবও যথানিয়মে তথায় হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র দত্ত, সুরেশচন্দ্র মিত্র, বলরাম বসু ও অতুল চন্দ্র ঘোষ ইঁহারা সমবয়সী হওয়ায় পরস্পর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল এবং সদালাপ ও নানাপ্রকার কৌতুকরহস্য করিতেন। সকলেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ ভক্ত এইজন্য সকলের ভিতর অতিশয় প্রণয় ও সদ্ভাব ছিল। গিরিশবাবুর ইঁহাদের চেয়ে বয়স বেশী থাকায় সকলে তাঁহাকে বড় ভাইয়ের মতন সম্মান করিতেন। মাষ্টার মহাশয় যদিও উহাদের সহিত একবয়স কিন্তু নিতান্ত নিরীহ ও ভালমানুষ থাকায় হাস্যকৌতুকে বিশেষ যোগদান করিতে পারিতেন না।

যে সকল মহাপুরুষদিগের নাম এই গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইতেছে এবং যাঁহাদিগের আদর্শ অবলম্বন করিয়া বহুসংখ্যক যুবক ধর্মজীবনে অগ্রসর হইতেছে এবং যাঁহারা সেই সময় উক্ত সঙ্ঘের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া বিবেচনায় মাঝে মাঝে আভাসমাত্র দেওয়া হইল।

সুরেশচন্দ্র মিত্র—নরেন্দ্রনাথের সিমলার বাড়ির নিকট মিত্রদিগের বাড়ি। সম্প্রতি রাস্তা হওয়ায় সে বাড়ির আর কোন চিহ্ন নাই। সুরেশচন্দ্র মিত্রের (সুরেন্দ্র নাথ মিত্র) পিতার নাম ৺পূর্ণচন্দ্র মিত্র এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম যদুনাথ মিত্র। সুরেশবাবু মুচ্ছুদ্দীগিরির কাজ করিতেন এবং প্রভূত অর্থোপার্জন করিতেন। প্রথম যখন বরাহনগর মঠ স্থাপিত হয় তখন সুরেশবাবু একমাত্র পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। তিনি তখন সাহস করিয়া বলিয়াছিলেন যে, একটা মঠ করা আবশ্যক। নিরঞ্জন মহারাজের কাছে তিনি অনেকবার অনুনয়

করিয়াছিলেন যে, "তোমরা সকলে রাজী হও, তা'হলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কাশীপুরে যে বাগানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন সেই বাগানটি ক্রয় করিয়া মঠ স্থাপন করা হইবে।" কিন্তু তখন সকলের প্রচণ্ড বৈরাগ্য, এক গৃহ ত্যাগ করিয়া আবার অন্য গৃহ গ্রহণ করা অবিধেয় বিবেচনা করায় কেহই সম্মত হইলেন না। এইজন্য তিনি অনেকবার দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এমন কি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি পাঁচশত টাকা বলরামবাবুর নিকট জমা রাখিয়া যান, যেন ভবিষ্যতে সেই অর্থ মঠের কোন কার্যে ব্যয় হয়; এইজন্য সেই অর্থে পরে মর্মর প্রস্তর ক্রয় করিয়া মঠের ঠাকুরঘরেতে লাগানো হইয়াছে।

কালীপদ মুখোপাধ্যায় ও প্রতাপচন্দ্র হাজরা—কালীপদ মুখোপাধ্যায় (বুঁটে কালী) নামক জনৈক ভক্ত ছিলেন। তিনি স্থূলকায়, ফ্যাকাসে ফরসা এবং অধিক পরিমাণে আহার করিতে পারিতেন। তিনি অধিক পরিমাণে বুটের (ছোলার) ডাল খাইতেন এইজন্য কৌতুকছলে তাঁহাকে সকলে "বুঁটে", অর্থাৎ বুটের ডাল, বলিয়া ডাকিতেন। তিনি সর্বদা কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে যাইতেন এবং অপরের অনুপস্থিতিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা করিতেন।

প্রতাপচন্দ্র হাজরা যিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইতেন, তিনি মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে অনেক সময় বাস করিতেন এবং নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। নরেন্দ্রনাথ কৌতুকছলে তাঁহাকে "থাউসেণ্ডা" (Thousand-আ) বলিয়া ডাকিতেন। তিনি বর্তমান লেখককে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে লইয়া অনেক ব্যঙ্গকৌতুক করিতেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে যখন খুব সমারোহে উৎসব হইল তখন তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরের বাহিরদিকের পূর্ব-উত্তরদিকের দালানটিতে অর্থাৎ বাগানের সম্মুখে যে দালানটি সেইখানে বসিয়া সারাদিন জপ করিতে লাগিলেন ও সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি খুব জাপক ছিলেন।

কালীপদ ঘোষ (দানাকালী)—কালীপদ ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বড় ভক্ত ছিলেন। তিনি John Dickinson-এর অফিসের কর্তা এবং গিরিশবাবুর পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার প্রাণটা বড় উদার ছিল এবং দু'হাতে দান করিতেন, সঙ্কোচ বা দ্বিধাভাব তাঁহার ভিতর মোটেই ছিল না। তাঁহার নির্ভীকতা ও মুক্ত-হস্তের দান দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দানাদত্যি শ্রেণীর ভিতর ফেলিতেন। তদবধি তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তমণ্ডলীর ভিতর "দানাকালী" বলিয়া অভিহিত হইতেন। অকাতরে দান করিতে এবং লোকজনকে খাওয়াইতে তিনি বড় ভালবাসিতেন।

নরেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় কুমার সেন—অক্ষয়কুমার সেন নামক জনৈক ব্যক্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যাইতেন। নরেন্দ্রনাথ কৌতুকছলে তাঁহাকে শাঁকচুন্নী মাষ্টার বলিতেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, সময় পাইলেই শাঁকচুন্নী মাষ্টার রামতনু বসুর গলির বাটিতে আসিয়া নরেন্দ্রনাথ ও বর্তমান লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন, কে যেন ভিতর হইতে মাঝে মাঝে ঠেলা মারিতেছে ও তাঁহাকে অস্থির করিতেছে; তাঁহাকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় কিছু লিখিবার জন্য কে যেন ভিতর থেকে বড় ব্যস্ত করিতেছে। তিনি বিষাদভাবে বলিলেন, "আমি ত লেখাপড়া জানি না ভাই, তা কি করব ?" তাঁহার কিছুদিন সেইরূপ আগ্রহ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ইংরাজীর আদি কবি Cadmus-এর উপাখ্যানটি বলিয়াছিলেন। Green-এর ইতিহাসের প্রথম অংশে Cadmus নামক জনৈক সহিসের উপাখ্যান আছে। স্বপ্নাবস্থায় Cadmus-এর দেবদূত দর্শন হইয়াছিল এবং তদ্দর্শনে তাহার কবিত্বশক্তি প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু Cadmus অক্ষর জানিত না। মুখে মুখে স্তব রচনা করিয়া সে সেতু ও চৌরাস্তায় দাঁড়াইয়া সকলকে শুনাইত। Cadmus-এর উপাখ্যান শুনিয়া শাঁকচুন্নী মাষ্টারের বুকে এক সাহস আসিল। তাঁহার অদ্ভুত পরিবর্তন হইল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি অনবরত স্মরণ করিতেন ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হইল। তিনি "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

পুঁথি” নামক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিলেন এবং আসিয়া প্রথম অংশটি নরেন্দ্রনাথকে শুনাইয়া যাইতেন। তাহার পর প্রতি বৎসর দক্ষিণেশ্বরের উৎসবকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহের উত্তরদিকের লম্বা দালানে বসিয়া তিনি হস্ত-লিখিত পুঁথিখানি পড়িতেন এবং সকলেই মনোযোগের সহিত তাহা শুনিতেন। এইরূপে “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি” প্রণয়ন হয়।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণকুমার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইতেন। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট ‘আমার অর্থ হউক’ এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কাশীপুর বাগানের শেষ সময় বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর যোগেন মহারাজ চৌদ্দ টাকা দিয়া একটি পুরাতন Hand press (যাহার কাঠ মাত্র অবশেষ ছিল) কিনিয়া উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে দেন। তারপর তিনি চিৎপুর রোডে বটতলায় একখানি ছোট দোকান করেন। যোগেন মহারাজ সেই দোকানের সামনে দিয়া যাইলে উপেন মুখোপাধ্যায় আসিয়া প্রণাম করিতেন ও বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইতেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে উপেন মুখোপাধ্যায় বিডন উদ্যানের পূর্বদিকের রাস্তাটির দক্ষিণ কোণে একখানি বাড়ি ভাড়া লইয়া একটি ছাপাখানা স্থাপন করিলেন এবং সময় পাইলেই নরেন্দ্রনাথ ও যোগেন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ও সর্ব বিষয়ে পরামর্শ লইতেন। তখন তিনি নরেন্দ্রনাথ ও যোগেন মহারাজের নিতান্ত অনুগত, এবং রামতনু বসুর গলির বাড়িতে প্রায় সন্ধ্যার সময় আসিতেন। পুস্তক ছাপিবার বিষয় নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে উপাদান দিয়াছিলেন; নরেন্দ্রনাথের উপদেশ অনুসারে তিনি “রাজভাষা” নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন এবং তাহাতে তাঁহার বিশেষ অর্থাগম হয়। নরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে তাঁহার ছাপাখানার বাড়িতে যাইতেন, আশ্রিত এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত হিসাবে বিশেষ যত্ন করিতেন। ইহার পর হইতে তিনি “বসুমতী” ছাপাখানা ও পুস্তকের ব্যবসা অধিকতর বিস্তৃত করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে বিশেষ অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের

উৎসবের সময় প্রথম কয়েক বৎসর উপেন মুখোপাধ্যায় ও ধর্মদাস সুর নামক জনৈক ব্যক্তি এই দুইজনে মিলিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহ ও শয্যা নানাপ্রকার ফুল দিয়া সাজাইতেন। তাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি ও সংযত ভাবে ঠাকুরঘর সাজাইতেন।

হরমোহন মিত্র ও গীতা প্রচলন—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দেশে গীতার বিশেষ প্রচলন ছিল না। 'আদি' সমাজে গীতা ছাপা হইয়াছিল কিন্তু দাম অত্যন্ত বেশী বলিয়া সাধারণের হস্তে আসিত না; এবং বাজারেও আর ছিল না। সেই সময় বাইবেল ও ব্রাহ্মসমাজের বই খুব প্রচলিত ছিল। হিন্দু শাস্ত্রের প্রচলন তখন বহুলভাবে ছিল না। মহেশচন্দ্র পাল নামক জনৈক ব্যক্তি প্রথমে 'পঞ্চদশী' ছাপান। তাহাতেই লোকের হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি আসে। হরমোহন মিত্র নরেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্র—সরলপ্রাণ এবং হৃদয়ে কোন ঘোরপ্যাঁচ ছিল না। এইজন্য নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে আদর করিয়া পাগলা বলিতেন, কখন বা 'হারমনিয়ম' বলিতেন; এবং তাঁহার স্নেহব্যঞ্জক আরও অনেক নাম ছিল। বরাহনগর মঠের প্রথম অবস্থায় নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সতীর্থগণ গীতা, উপনিষদ, বেদান্ত প্রভৃতি নানা গ্রন্থ অনবরত পাঠ করিতেন। হরমোহন মিত্রের এক ধনাঢ্য আত্মীয় ছিলেন; তিনি Asiatic Society-র Library থেকে "ললিতবিস্তর" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ আনিয়া দিতেন। নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সতীর্থগণ হিন্দু গ্রন্থের এরূপ অপূর্বভাব পাইয়া বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং সাধারণ লোক কি প্রকারে এই সমস্ত অমূল্য গ্রন্থ পড়িতে পায় সেই চিন্তা তাঁহাদের মনে উদয় হইল। নরেন্দ্রনাথ হরমোহন মিত্রকে গীতাখানি ছাপাইতে উৎসাহিত করিলেন এবং স্বয়ং নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া তাঁহাকে কার্যে নিয়োজিত করিলেন। হরমোহন মিত্র ৺কালী প্রসন্ন সিংহের মহাভারত হইতে গীতা-অংশটি আটাশ টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া লইলেন এবং মূল ও বঙ্গানুবাদ দিয়া ছাপাইতে লাগিলেন। প্রথমে দুই আনা দাম করিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণের সময় এক আনা দাম করিলেন, তাহার পর দুই পয়সা দাম

করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। পুস্তকখানি ২নং নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীটস্থ গীতা কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হইত এবং তাহা হইতে বাংলা দেশে গীতার খুব প্রচলন হইল এবং লোকে সাগ্রহে পড়িতে লাগিল।

সুরেশচন্দ্র দত্ত—সুরেশচন্দ্র দত্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট মাঝে মাঝে যাইতেন এবং নাগ মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। পূর্বে তিনি ভাল চাকরি করিতেন, কিন্তু নাগ মহাশয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিলেন দেখিয়া সুরেশচন্দ্র দত্তও তাঁহার চাকরি পরিত্যাগ করিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসবে কয়েক বৎসর দই দিয়াছিলেন ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিগুলি একখানি ছোট পুস্তকাকারে ছাপাইয়া বিনামূল্যে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে বিতরণ করিতেন। ক্রমে ক্রমে প্রথম হইতে ষষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল ও এইরূপে বিতরিত হইত। তৎপরে হরমোহন মিত্রের পুত্র সত্যচরণ মিত্র সুরেশচন্দ্র দত্তের উক্তি অবলম্বন করিয়া এবং আরও অনেক উক্তি সন্নিবেশিত করিয়া বৃহৎ আকারে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথ ও ধীরেন পাল—১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের সহিত তারকেশ্বরের মোহন্তের ঝগড়া চলিতেছিল। সংবাদপত্রে নানাপ্রকার ব্যঙ্গ ও শ্লেষপূর্ণ প্রবন্ধ বাহির হইতেছিল। নরেন্দ্রনাথ একদিন বলরামবাবুর বাড়ির বড় ঘরটিতে বসিয়া আছেন, ধীরেনপাল নামক জনৈক ব্যক্তি মধ্যাহ্নে তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটি নরেন্দ্রনাথের বাল্যকালের পরিচিত, কিন্তু নানা কারণবশতঃ কেহই তাহার সহিত বড় একটা মিশিতেন না। নরেন্দ্রনাথ পূর্বপরিচিত হিসাবে তাহার সাথে সখ্যভাবে কথা কহিতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে 'বঙ্গবাসী' ও মোহন্তের কথা উঠিল। নরেন্দ্রনাথ সরলপ্রাণ, বলিয়া ফেলিলেন "দেখ, আমি যদি মোহন্তের উকীল হইতাম এইরূপ করিয়া মোহন্তের পক্ষ সমর্থন করিতাম", এই বলিয়া তিনি কৌতুকছলে হাসিতে হাসিতে মোহন্তের ওকালতি করিতে আরম্ভ করিলেন।

কথাচ্ছলে নানাপ্রকার সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ও শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়া মোহন্তের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া স্বাভাবিক ওজস্বী ভাব ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার অসাধারণ, তর্কবুক্তির ক্ষমতা তিনি তখন দেখাইলেন। খারাপ পক্ষকেও তিনি তর্কযুক্তি দ্বারা অন্যপ্রকার দেখাইতে পারিতেন। এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া উপস্থিত সকলে আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কিন্তু ইহা কৌতুকছলে হইয়াছিল, কাহারও মনে কিছু রহিল না। ধীরেন পাল অন্য প্রকৃতির লোক; তাড়াতাড়ি সেই কথাগুলি সে লিখিয়া লইল এবং তখনই ট্রেনযোগে মোহন্তের কাছে গিয়ে, সাউখুরি করে কিছু টাকা যোগাড় করিয়া আনিল। তাহার পরদিন নরেন্দ্রনাথের কাছে গিয়া বলিল, "দ্যাখ্ ভাই নরেন, তোর কথাগুলি লিখে নিয়ে মোহন্তের কাছে গেলুম এবং তাকে নানাপ্রকার বোলচাল দিয়ে ঐ সমস্ত কথা বলে আড়াইশ' টাকা পেয়েছি। তা ভাই তোর কথা দুটো পেয়ে আমরা সামান্য লোক পেটের ভাত করে খাই, এতে ভাই কিছু মনে করিসনি"। নরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন —কাহাকেও ত একমুটো অন্ন দিতে পারিনে, তা যা হোক এ লোকটা গরীব, একমুঠো অন্ন পেলো তবুও ভাল। শরৎ মহারাজ এই কার্যে একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "এ রকম লোককে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়, বদনাম হবে।" নরেন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "দেখ শরৎ, লোকটির প্রাণটি সরল আছে তাই একটু দয়া করি। তা যদি অভাগাগুলোকে তোমরা আশ্রয় না দাও, তবে কোথায় তারা আশ্রয় পাবে?" শরৎ মহারাজ নরেন্দ্রনাথের তখন এরূপ দয়ার ভাব দেখিয়া আর কোন কথা কহিলেন না। নরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ধীরেন পালের ছাপাখানায় গিয়া সখ্যভাবে কথা কহিতেন, কোন উচ্চ নীচ ভাব রাখিতেন না। সাধু ও উন্নত অবস্থার লোক বলিয়া সাধারণের সহিত কোন পার্থক্য রাখিতেন না এইজন্য অতি অপকৃষ্ট লোকেও নরেন্দ্রনাথকে নিজেদের পরম বন্ধু বলিয়া এত ভালবাসিত।

নরেন্দ্রনাথের উদরাময় রোগ ও ভাবিনী কর্তৃক প্রস্তুত রুটি ও

কুমড়ার ছক্কা আহার—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গরমকালে নরেন্দ্রনাথের বড় উদরাময় রোগ হয়, কারণ, তাঁহার মাংস খাওয়া অভ্যাস ছিল, কিন্তু পরে সাধু হইয়া মুষ্টিভিক্ষার অন্ন বা অনিশ্চিত অন্ন আহারে শরীর একেবারে কৃশ হইয়া যায় ও উদরাময় রোগ হইয়া পড়ে। বলরামবাবু নরেন্দ্রনাথকে বরাহনগর মঠ হইতে আনাইয়া আপনার বাড়িতে রাখিলেন এবং সাগু, বার্লি প্রভৃতি আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। নরেন্দ্রনাথ দুই একদিন বলরামবাবুর বাড়িতে থাকিয়াই রামতনু বসুর গলির বাড়িতে চলিয়া আসিলেন এবং মাছের ঝোল ভাত খাইতে লাগিলেন। কিন্তু পাছে খাইবার কোন অনিয়ম হয় এইজন্য একদিন পরেই বলরাম বাবু প্রাতে রামতনু বসুর গলির বাটিতে আসিলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইয়া পথ্যের বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু বলরামবাবুর রোগীর উপযুক্ত পথ্যের বন্দোবস্ত নরেন্দ্রনাথের আদৌ পছন্দ হইল না। বলরামবাবুর বাড়িতে ভাবিনী নামে একটি বিধবা স্ত্রীলোক থাকিতেন, তাঁহার মা তখন জীবিতা ছিলেন। অতি কষ্টে দিনপাত করেন কিন্তু ভাবিনী ও ভাবিনীর মাতা বিশেষ ভক্তিমতি শুদ্ধ-আত্মা ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ গোপনে ভাবিনীকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তাঁহার রুটি ও কুমড়ার ছক্কা খাইতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে; ভাবিনী যেন কাহাকেও না বলিয়া শীঘ্র রুটি ও কুমড়ার ছক্কা করিয়া দেয়। ভাবিনী অসুখের কথা বিশেষ জানিতেন না, তিনি অতি ভক্তিসহকারে রুটি ও কুমড়ার ছক্কা করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের তখন খুব ক্ষুধা হইয়াছিল, পেট ভরিয়া খাইয়া লইলেন। আহার সমাপ্ত হইলে তিনি বলরামবাবুকে বলিলেন যে, ভাবিনীর প্রদত্ত রুটি ও ছক্কা তিনি খাইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া বলরামবাবু ভয় পাইলেন ও নরেন্দ্রনাথকে বকিতে সুরু করিলেন এবং ভাবিনীকেও বকিলেন। নরেন্দ্রনাথ ত বকুনি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলরামবাবুকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন যে, বলরামবাবু তাঁহাকে শুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভক্তিমতী ভাবিনীর রুটি খাইয়া তাঁহার উদরাময় রোগ তখনকার মত ভাল হইয়াছিল।

ভাবিনীর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্য পিঠা তৈয়ারির কথা— ভাবিনী কিরূপ শ্রদ্ধাবতী ছিল তাহা একটু বলা আবশ্যক, সেইজন্য তাঁহার বিষয় উল্লেখ করা হইল। একবার বলরামবাবুর বাড়ি হইতে মেয়েরা দু'তিনখানা গাড়ি করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইবার কথা তোলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্য বড়বাজার হইতে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন লইলেন। ভাবিনী গরীব, তাঁহার কিছু দিতে ইচ্ছা—কিন্তু অসমর্থ, তাঁহার যৎসামান্য যাহা সঞ্চিত ছিল তাহা দিয়াই তিনি কিছু পিঠা তৈয়ারি করিয়া লইয়া বলরামবাবুর বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু নিজের হীন অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তিনি যখন পিঠা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, নিদারুণ মনোকষ্টে অমনি চোখে জল আসিল; মনটা চঞ্চল হওয়ায় পিঠাগুলি চুঁইয়া গিয়াছিল। ভাবিনীর প্রস্তুত চোঁয়া পিঠাগুলি হাঁড়ির নীচুতে রাখিয়া অপর উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন উপরে রাখিয়া হাঁড়ি বন্ধ করিয়া সকলে দক্ষিণেশ্বরে যান। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বৈকাল চারটার সময় মিষ্টান্ন আহার করিতে দেওয়া হইলে তিনি বালকের ন্যায় আবদার ধরিলেন, হাঁড়ির তলাতে কি আছে তিনি তাই খাইবেন। এইরূপে সমস্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্য ত্যাগ করিয়া তিনি নীচেকার ভাবিনী-প্রদত্ত চোঁয়া পিঠা খাইতে লাগিলেন ও আনন্দ করিতে লাগিলেন। এইকথা ভাবিনীকে যখন বলা হইল, ভাবিনী তখন আনন্দে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। মোট কথা ভাবিনী গরীব স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহার ভিতর খুব একটা শ্রদ্ধা ভক্তি ও নিষ্ঠার ভাব ছিল। ১৮৯০ বা ৯১ খৃষ্টাব্দে ভাবিনীর উদারময় রোগ হয় এবং নিরঞ্জন মহারাজ দয়া করিয়া গরীব স্ত্রীলোকটির ঔষধপথ্যের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্প দিনের ভিতর তাঁহার মৃত্যু হয়। ভাবিনী গরীব হইলেও তাঁহার ভিতরটায় ঈশ্বরানুরাগ ছিল এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন, এইজন্য তাঁহার কথা এই স্থানে বলা হইল।

নরেন্দ্রনাথের ভালকুত্তার গল্প বলা—কাহাকেও সাধন-ভজন করিবার

জন্য উপবাস করিতে দেখিলে নরেন্দ্রনাথ কৌতুক করিয়া এক ডালকুত্তার গল্প বলিতেন। তিনি বলিতেন, "বাল্যকালে পাড়ার একজনের বাড়িতে গেছি—ছেলেটা করেছে কি, একটা নেড়ি কুত্তাকে ধরে পেটে কষে নারকেল দড়ি বেঁধেছে আর দিনান্তে এক মুঠো ভাত খেতে দিচ্ছে। কুকুরটার পাঁজরার হাড় বের হয়ে গেছে, দাঁড়াতে পাচ্ছে না। পাগুলো থর থর করে কাঁপছে। গলায় আর আওয়াজ বোরোচ্ছে না। এই দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ওরে, কুকুরটাকে এমন করে মারছিস কেন?' বালকটি গম্ভীরভাবে বলল, 'একে ডালকুত্তো কচ্ছি'। এখন ডালকুত্তা (Hound) পেট-সরু, রোগাপানা, তাই ওর পেট বেঁধে বেঁধে ওকে ডালকুত্তো কচ্ছে। দিনকতক পরেই কুকুরটা মরে গেল।" নরেন্দ্রনাথ তাই কৌতুক করিয়া মাঝে মাঝে বলিতেন "কিরে, ডালকুত্তো কচ্ছিস নাকি?" তিনি এই সঙ্গে আরও একটি কথা বলিতেন, "That which is in the bone must come out of the flesh" অর্থাৎ অস্থি মজ্জায় যেটা আছে সেটা ফুটে বেরুবে, যার যেটা স্বাভাবিক ধাতস্থ, সে সেই পথ দিয়ে চলবে, সেই দিকেই তার উন্নতি হইবে। কষ্টকল্পনা করিয়া অপরের পথে যাইলে বিশেষ উন্নতি হয় না।

নরেন্দ্রনাথের বাংলা কাব্য সাহিত্য আলোচনা—একদিন নরেন্দ্রনাথ বৈকালবেলা বলরাম বাবুর বাড়ির বড় ঘরটিতে বসিয়া বাংলা কাব্যের আলোচনা করিতে লাগিলেন। কোন্ গ্রন্থের কি দোষগুণ তাহা তিনি অনবরত বলিয়া যাইতে লাগিলেন, কারণ তাঁহার কাছে গ্রন্থের বাঁধাধরা ভালমন্দ বলিয়া কিছু ছিল না। বাংলা ভাষার সমস্ত কাব্যগ্রন্থ তিনি পড়িয়াছিলেন। গ্রন্থের দোষগুণ বলিতে বলিতে ভারতচন্দ্রের কথা তুলিলেন। অন্নদামঙ্গল হইতে তিনি—

"দশ দিক অন্ধকার করিল মেঘগণ।
হুনো হয়ে বহে উনপঞ্চাশ পবন॥"

* * *

"ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।

ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হুতাশে ॥"

ইত্যাদি আবৃত্তি করিতে করিতে বলিলেন, "দেখ, প্রথম যেভাবে ভাবটা সুরু হয়েছিল, তাহাতে পাঠকের মনে হয় যে কত কি যুদ্ধের বর্ণনা, কত ভীষণ ব্যাপার বলবে, কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত যেন নিবে গেল। কি এক ঘেসেড়ার কথা তুলে ভাবটা একেবারে ফিকে করে ফেললে—যেন ভাবটা একেবারে ভেঙ্গে গেল। ভারতচন্দ্র যেন ভাবটা আর রাখতে পারলে না।" আবার পরক্ষণেই তিনি গম্ভীর হইয়া ভারতচন্দ্র হইতে—

"যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥"

ইত্যাদি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাহার পর বিদ্যাসুন্দরের কথা উঠিল। হীরামালিনীকে সুন্দর যেখানে বলিতেছে :—

"রাজা রাণী সম্ভাষিয়া বিদ্যারে কুসুম দিয়া
মালিনী ত্বরায় আইল ঘরে।
সুন্দর বলেন মাসী নাহি মোর দাস দাসী
বল হাট-বাজার কে করে ॥
মালিনী বলিছে বাপু, এত কেন ভাব হাপু,
আমি হাট বাজার করিব।
কড়ি কর বিতরণ, যাহে যবে যাবে মন,
কৈও মোরে তখনি আনিব ॥
কড়ি ফট্‌কা চিড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়ি লোভে মরে গিয়া
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে।"

ইত্যাদি বলিতে বলিতে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মাগী যেন সর্দারনী,

সব খবর রাখে, বড্ড বেশী কথা কয়", ইত্যাদি। তাহার পর দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী হইতে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থ হইতে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ হইতে নানা বিষয় উঠাইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ মাইকেল মধুসূদন দত্তর মেঘনাদবধ কাব্যের বড়ই ভক্ত ছিলেন এইজন্য তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের বড়ই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কি করিয়া ছন্দ যতি ঠিক ঠিক রাখিয়া মেঘনাদবধ কাব্য আবৃত্তি করিতে হয় তাহাই তিনি তরঙ্গায়মান-স্বরে সকলকে আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়া দিলেন,—

"ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক তোরে
লক্ষ্মণ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়," ইত্যাদি।

লক্ষ্মণকে তিনি অতিশয় কাপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বিভীষণকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। প্রায় বলিতেন, "ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট"। তিনি একস্থান হইতে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন :—

"এতক্ষণে—অরিন্দম কহিল বিষাদে—
জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায় তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী
সহোদর রক্ষঃ শ্রেষ্ঠ? শূলী শম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?"

এইখানটি তিনি যখন আবৃত্তি করিতেন তখন তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, ঘৃণা খেদ যেন মুখে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। আবৃত্তি করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ সতেজে বলিয়া উঠিলেন "কি ভীষণ একটা নেমকহারাম, traitor—বংশটা ছারখার করল! নিজের একটা বংশমর্যাদা নাই?" ক্রমে ক্রমে আলোচনাটা এত গম্ভীর ও পাণ্ডিত্য-

পর্ণ হইয়া উঠিল যে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিতে লাগিল। ঘরেতে যেন ভাবতরঙ্গ তুলিতে লাগিল। এক গ্রন্থের এক প্রকার ভাব হইতে শ্রোতার মনকে অন্য গ্রন্থের অন্য ভাবে অতর্কিতভাবে লইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রত্যেক গ্রন্থের, প্রত্যেক ব্যক্তির ভাব-ভঙ্গি আচার-পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বাংলা সাহিত্য তিনি কতদূর পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাহার উপর তাঁহার কতদূর দখল ছিল, সেইদিন তিনি সকলকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। নোকা (লক্ষ্মণ) ধোপার যাত্রা (শ্রীমন্তর মশান) হইতে আরম্ভ করিয়া গোবিন্দ অধিকারীর ছন্দ পর্যন্ত সমস্ত বিষয় তিনি সেইদিন বলিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যবিষয়ক এরূপ বক্তৃতা ও উপলব্ধি খুব কম শুনিতে পাওয়া যায়, কারণ সাধারণ লোকের দ্বারা এরূপ উচ্চভাবপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, অনেক দিনের কথা—সমস্ত কথাগুলি ঠিক ঠিক স্মরণ নাই এবং তাহা সম্ভবপর নহে। কেবল আনন্দের একটি স্মৃতি মাত্র আছে।

শরৎ মহারাজের Father Lafont সম্বন্ধে আলোচনা—একদিন বৈকালবেলা গিরিশবাবুর বাড়িতে চা খাইতে খাইতে শরৎ মহারাজ গিরিশবাবুর সহিত ব্রহ্মবিদ্যা ও জড়বিদ্যার (পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা) কথা কহিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু তখন সন্ধ্যার সময় বহুবাজার Science Association-এর ফাদার লাফোঁ এবং মহেন্দ্র সরকারের বিজ্ঞানের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। শরৎ মহারাজ St. Xavier's College-এ পড়া ছাত্র, সেইজন্য Father Lafont-র কাছে বিজ্ঞান শিখিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। ব্রহ্মবিদ্যা ও জড়বিদ্যার পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। শরৎ মহারাজ গিরিশবাবুকে বলিলেন, "যখন কলেজে পড়তুম তখন Father Lafont-কে দেখতুম যে, ল্যাবরেটরিতে সে একটা যন্ত্রপাতি নিয়ে পায়চারি কচ্ছে। আবার মাঝে মাঝে শিস দিচ্ছে, গান কচ্ছে। বিকেল হল, সন্ধ্যা হল তবুও তার কোন হুঁস নাই। একেবারে লোকটা যেন কিসে মেতে রয়েছে। জগৎ আছে কি নাই বা সময় বলে যে একটা

জিনিস আছে তাও তার কিছু খবর নাই। আচ্ছা, এটা কি একপ্রকার সাধনা নয়?" অনেকদিনের কথা; ঠিক ঠিক কথাগুলা লিখিতে পারিলাম না। তবে ভাবটা ছিল যে, ব্রহ্মকে এত সীমাবদ্ধ কর কেন? অনেক পথ দিয়া সেই উচ্চ অবস্থায় যাইতে পারা যায়। Father Lafont যে বিজ্ঞান নিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে মেতে থাকে, সেটা কি তাহার সাধনা নয়? শরৎ মহারাজের তখন খুব উদার ভাব সেইজন্য তিনি এত উচ্চ ভাবের কথা কহিতেছিলেন। এই কথা শুনিয়া গিরিশ বাবু থেলো হুঁকাতে নল দিয়া তামাক খাইতে খাইতে স্থির হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

মূর্তিপূজা সম্বন্ধে শরৎ মহারাজের আলোচনা—একদিন অপরাহ্ণে বর্তমান লেখক বরাহনগর মঠে যান। শরৎ মহারাজ বড় ঘরটিতে একটি বালিশে ঠেস দিয়া অর্ধ-শায়িতভাবে রহিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি পাহাড় হইতে অল্পদিন ফিরিয়া আসিয়াছেন। কথাগুলা অতি মধুর বৈরাগ্যপূর্ণ এবং সর্ব বিষয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তিতে পরিপূর্ণ। তিনি সদাসর্বদা স্থিরভাবে মৌন হইয়া থাকিতেন; যাহা কিছু বলিতেন তাহা সারগর্ভ এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভরে পরিপূর্ণ। তিনি পূর্বে ব্রাহ্মসমাজে খুবই যাতায়াত করিতেন, এজন্য ব্রাহ্মসমাজের ভাবটা তাঁহার ভিতর খুব প্রবল ছিল। কথাপ্রসঙ্গে সাধনপ্রণালীর কথা উঠিল। তিনি বলিলেন যে, "বেদান্ত যে নিরাকার বা নির্গুণের কথা বলিতেছে সে ত ঠিক কথা, কিন্তু তা বলে বিগ্রহ পূজা করে হবে না কেন? পথ কি একটা গণ্ডীর ভিতর? পথের ঝগড়া করতে গেলে আসল জিনিস হারিয়ে যায়। এই ত চোখের সামনে তাঁকে দেখলুম, মূর্তি পূজা করে এত উচ্চ অবস্থায় তিনি উঠেছিলেন। মূর্তিপূজায় হবে না কেন? সকলের পক্ষে সুবিধা না হতে পারে, কিন্তু একেবারেই যে এটা কিছু নয় একথা বলা যেতে পারে না।" এইরূপ সাধনবিষয়ের অনেক কথা সেদিন তিনি বলিয়াছিলেন। এই সময় তিনি সর্বদা এই গানটি গাইতেন :—

প্রভু, ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম তেরা।

তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা ॥
দো রোটি এক লেঙ্গটি তেরে পাস্ ম্যায় পায়া।
ভকতি ভাও দে আরোগ নাম তেরা গাওয়াঁ ॥
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা বারেয়া।
দাস কবীরা শরণে আয়া চরণ লাগে, তারেয়া ॥

বাবুরাম মহারাজের ফুল তুলিতে গিয়া গাছ হইতে পড়িয়া যাওয়া—বাবুরাম মহারাজ বরাহনগর মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্য একদিন ফুল তুলিতে যান। সম্ভবতঃ তিনি ফুল তুলিতে চাঁপাগাছে উঠিয়াছিলেন; গাছ হইতে তিনি পড়িয়া যান এবং তাহাতে তাঁহার ডান হাতের কবজি মচকাইয়া যায়। অনেকদিন তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন। শেষে যদিও হাতটা ভাল হইয়া যায় কিন্তু একটু বাঁকাভাব থাকে। সেইজন্য অতুলবাবু বাবুরাম মহারাজকে হাতভাঙ্গা সাধু বলিতেন।

অতুলবাবু ও গেরুয়া কাপড়—অতুলবাবু যদিও সকলের সহিত খুব মেলামেশা ও আমোদ-আহ্লাদ করিতেন কিন্তু তাঁহার একটি বিশেষ বালকের ভাব ছিল। তাঁহাদের বাড়িতে কেহ গেরুয়া কাপড় শুকুতে দিলে রাগিয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন যে, যে বাড়িতে গেরুয়া কাপড় শুকুতে দেওয়া হয় সে বাড়িটা নির্বংশ হয়ে যায়। এইজন্য যদি কেহ অনবধানবশতঃ গিরিশবাবুর দালানে গেরুয়া কাপড় শুকুতে দিত, অতুলবাবুর গলার আওয়াজ পাইলেই তাড়াতাড়ি করিয়া কাপড়গুলি তুলিয়া লইত। অতুলবাবু একদিন বর্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন, "ছাখ্, তোদের বাড়িতে কখন গেরুয়া কাপড় শুকুতে দিস্‌নি। ওগুলো লক্ষ্মীছাড়া লোক, ওগুলো যেখানে কাপড় শুকুতে দেয়, সেখানকার লোক নির্বংশ হয়ে যায়", বলিয়াই নরেন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তুই আর কি করবি? ও যে মূল সন্ন্যাসীর বাড়ি, তোকে বারণ করা যে মিথ্যে।"

রাখাল মহারাজ—রাখালচন্দ্র ঘোষ বাংলা ১২৬৮ সালে চব্বিশ পরগণার বসিরহাট সাব-ডিভিসনে আরবেলের নিকটস্থ সিকরা কুলীন-

গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হারাণচন্দ্র ঘোষ। ঘোষ মহাশয় বিত্তবশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং জমিদারী কর্মে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। রাখাল মহারাজের অল্প বয়সে মাতৃবিয়োগ হওয়াতে পিতা দ্বিতীয়বার সংসার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রাখাল মহারাজ মনোমোহন মিত্রের কনিষ্ঠা ভগ্নী বিশ্বেশ্বরী—যাহাকে বাড়িতে "বী" বলিয়া ডাকিত, তাহার পাণিগ্রহণ করেন এবং অধ্যয়নের জন্য কলিকাতায় আসিয়া সিমলা ষ্ট্রীটে মনোমোহন মিত্রের বাড়িতে অবস্থান করেন। মনোমোহন মিত্র রামচন্দ্র দত্তের মাসতুতো ভাই, আর নিত্যগোপাল মহারাজও রামচন্দ্র দত্তের মাসতুতো ভাই। এইজন্য নরেন্দ্রনাথের সহিত সম্পর্ক ছিল এবং "বী" সম্পর্কে ভগ্নী হইয়াছিল। "বী" অতি ধীর, বিনয়ী ও ঈশ্বরানুরাগী ছিল।

একাকী অধ্যয়নে অসুবিধা হওয়ায় বালক রাখাল, ৩নং গৌরমোহন মুখার্জির গলির বাটিতে, নরেন্দ্রনাথের পড়িবার গৃহে আসিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। উভয়ে সর্বদাই একসঙ্গে থাকিতেন। সেই সময় তিনি হোগলকুড়ের অম্বিকাচরণ গুহর (অম্বু গুহ) আখড়ায় কুস্তি করিতেন। নরেন্দ্রনাথও সেখানে কুস্তি লড়িতেন। ব্যায়াম করিয়া ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া বালক রাখাল পড়িবার উদ্যোগ করিতেন, কিন্তু টেবিলের পার্শ্বে চেয়ারে বসিয়া পড়িতে তিনি পছন্দ করিতেন না। তখন পাঠগৃহে অল্প-উচ্চ তক্তাপোশ বা কাঠের প্লাটফরম্ দিয়া সমস্ত ঘরটি মোড়া ছিল। তাহার উপর টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চি ও পশ্চিমদিকের দেওয়ালের নিকট একখানি বড় তক্তাপোশ পাতা ছিল। তাহাতে নরেন্দ্রনাথ রাত্রে শয়ন করিতেন। বালক রাখাল নিজে তক্তাপোশের উপর বসিয়া পাঠ আরম্ভ করিতেন। তখন কেরোসিন তেলের প্রচলন ছিল না, রেড়ির তেলের প্রদীপ বা জলের উপর তেল দিয়া কাঁচের গ্লাসে তুলার বাতি দিয়া সেই বাতির আলোয় সকলে রাত্রির কার্য সমাধা করিতেন। রাখালচন্দ্র সম্মুখে গ্লাসের বাতি রাখিয়া অধ্যয়ন শুরু করিতেন, কিন্তু ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত থাকায়

পাঠ আরম্ভের পূর্বে তিনি আহার করিয়া লইতেন। সেই সময় তিনি কচুরি, সিঙ্গাড়া ও দোকানের আলুভাজা লইয়া পেট ভরিয়া খাইয়া শেষে একগ্লাস জল খাইয়া মুখে একটা পান দিতেন। তাঁহার পাঠ একই ছিল এবং তিনি একবৎসর একই পাঠ পড়িতেন। "Survey the warlike horse" এই কবিতাটি তিনি বোধ হয় একবৎসর আবৃত্তি করিয়াছিলেন। প্রথম বসিয়া থাকিয়া পাঠাভ্যাস, তারপর শয়ন করিয়া পাঠাভ্যাস, তারপর নাক ডাকাইয়া পাঠাভ্যাস। পাছে প্রদীপ ও রেড়ির তেল গায়ে পড়ে সেইজন্য প্রজ্বলিত প্রদীপটি সরাইয়া লওয়া হইত ও হাত হইতে পুস্তকখানি মুড়িয়া টেবিলের উপর রাখা হইত। বর্তমান লেখক তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িত; কিছুদিন এইরকম দেখিয়া একদিন রাখালচন্দ্রের মুখের উপর বলিল, "এই ছোঁড়া বই হাতে করলেই ঘুমোয়, এর কখন পড়াশুনা হবে না, তবে যদি বাপের টাকা থাকে তবে চলে যাবে।" বেলুড় মঠে কয়েক বৎসর পূর্বে বালক অবস্থার এই পুরাতন কথাটি উল্লেখ করিয়া উভয়েই পরস্পর হাসি-কৌতুক করিতে লাগিলেন।

অধ্যয়নের সুবিধা না হওয়ায় রাখাল অল্পদিন ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের নিকট হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা করিয়াছিলেন, এইজন্য রাখাল মহারাজ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বেশ ভাল জানিতেন। শৈশবে বালক রাখাল স্থূলকায় ছিল সেইজন্য বোধ হয় খর্বাকৃতি দেখাইত। নরেন্দ্রনাথের পিতা বালক রাখালকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং "গুজরুটি হাতি" বলিয়া ডাকিতেন। কুস্তির আখড়ায় তাহাকে "গজু" (গজ) বলিয়া ডাকিত। বাল্যকালে সকল ছেলে ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া থাকে, কিন্তু রাখাল কখনও কাহারও সহিত ঝগড়া বা বিবাদ করে নাই। অল্পভাষী, লাজুক, বিনয়ী ও সকলের কাছে দীনভাবে থাকিত। এমন মিষ্টভাষী ছিল যে, পাড়ায় সকলেই তাহাকে বিশেষ স্নেহ যত্ন করিত। বালকস্বভাববশতঃ চোখ মিটকাইয়া, মুখ ভেঙচাইয়া, জিভ বাহির করিয়া সকলকে ভূতের ভয় দেখাইত। এইটাই তাহার

বিশেষ কৌতুকের জিনিস ছিল। নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া লোককে সে ভূতের ভয় দেখাইতে পারিত। ভবিষ্যতে তাহার যে প্রখর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অর্থনীতিতে অসীম দক্ষতা, গাম্ভীর্য, প্রধানতা প্রভৃতি সদগুণ দেখা গিয়াছিল, বাল্যকালে তাহার কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই; তবে তাহার ঈশ্বরানুরাগ ও ভক্তির ভাবটা অল্প বয়সেই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সদলবলে তখন পাড়ায় পাড়ায় সভা ও উপাসনা করিতেন। মনোমোহন মিত্রের বাড়িতেও তিনি একবার উপাসনা করিলেন, এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মাঘোৎসব উপলক্ষে কেশববাবু নন্দ চৌধুরীর বাটিতে এক অধিবেশন করিয়াছিলেন। রাখালচন্দ্র এই দুই-স্থলেই যোগ দিয়াছিলেন এবং পার্শ্বের এক নিভৃত স্থানে বসিয়াছিলেন—নীরবে চক্ষু নিমীলিত করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন।

বাল্যকাল হইতেই নিভৃত স্থানে বসিয়া ধ্যান করা তাহার বিশেষ প্রিয় কার্য ছিল। সমবয়স্ক বালকেরা মনে করিল রাখালটি বোকা আহাম্মক, হাসি-তামাসা জানে না সেইজন্য চুপ করে এক কোণে কখন চোখ চেয়ে, কখন চোখ বুজে বসে থাকে। কিন্তু ধ্যান করা যে তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল তখন তাহার সমবয়স্ক বালকেরা এত বুঝিতে পারে নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও রাখাল মহারাজ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন মনোমোহন মিত্রের নিজের বাটি ও রামচন্দ্রদত্তের বাটিতে ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন। রাখালচন্দ্রও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া যাইল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাহার একটি পুত্রসন্তান জন্মে। শ্যামপুকুরের বাটিতে যখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব চিকিৎসার জন্য আনীত হইয়াছিলেন, সেই সময় বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে রবিবারে বালকটির অন্নপ্রাশন উপলক্ষে রাখালচন্দ্র সকলকে খাওয়াইয়াছিল। এইদিন হইতে নরেন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে গৃহত্যাগী হইলেন। বালকটির নাম হইল সত্যচরণ ঘোষ এবং ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হইয়া সে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মারা যায়। রাখাল মহারাজ সন্ন্যাসী হইলেও এই পুত্রশোকটি তাঁহার লাগিয়াছিল। সাধনকালে বরাহনগর মঠের বাহির

দিকের ছোট ঘরটিতে বসিয়া রাখাল মহারাজ তখন অন্তর্দৃষ্টি হইয়া অনবরত জপ করিতেন এবং প্রায়ই মৌনীভাবে থাকিতেন। "বী" অনবরত তাঁহাকে পত্র লিখিত। সেইজন্য তিনি কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না বলিয়া ৺বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন।

বিশ্বেশ্বরী দেবী—স্বামী গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইল বলিয়া অল্পবয়স্কা "বী" শয্যা ত্যাগ করিল, নিরামিষ খাইত এবং আহারাদিও জোর করিয়া কেহ না খাওয়াইয়া দিলে স্বেচ্ছাপূর্বক সে বড় একটা খাইত না—চুল উড়ি-খুড়ি, তেল দিত না এবং বাঁধিতও না। সধবার চিহ্ন-স্বরূপ একটা নোয়া ও দু'গাছি বালা হাতে ছিল। স্নান করিলে গা মুছিত না এবং ভূমিশয্যায় শুইয়া অনবরত জপ করিত। অপর কোন স্ত্রীলোক বা সমবয়স্কা মেয়েদের সহিত বাক্যালাপ করিত না ও দরজা বন্ধ করিয়া থাকিত। সম্পর্কে বয়োজ্যেষ্ঠা ভগ্নীরা জোর করিয়া গা মুছিয়া কেশ বাঁধিয়া দিলে ও মাথায় সিঁদুর দিলে মুখে কাপড় দিয়া অনবরত কাঁদিতে থাকিত কিন্তু মনের কথা কাহাকেও কিছু বলিত না। উপবাস, সারাদিন জপ ও রাত্রিজাগরণ করিয়া "বী" একটু উন্মনা হইয়াছিল। সবসময় যেন একটু সঙ্কুচিত ও ভীত হইয়া থাকিত, পাছে কেহ তাহাকে রুষ্ট কথা বা গলগ্রহ হইয়াছে বলে। অবশেষে "বী" একদিন স্বপ্ন দেখিল যে, রাখাল মহারাজ বৃন্দাবনে মরিয়াগিয়াছে, সেইজন্য অল্পদিন পরেই "বী" আত্মহত্যা করে। 'সত্য' এইজন্য মাতৃহীন পিতৃহীন বালক হইয়া কখন মনোমোহন মিত্রের নিকট, কখনও বা পিতামহের নিকট প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

মহাপুরুষ মহারাজ—শিবানন্দ স্বামীর পূর্ব-আশ্রমের নাম শ্রীতারকনাথ ঘোষাল, জন্মস্থান দমদম বারাসত। ইঁহার পিতার পুত্র-সন্তান না হওয়ায় ৺তারকনাথের উপাসনা করিয়া পুত্র হয়, এইজন্য ইঁহার নাম তারকনাথ রাখা হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে তারকনাথের ধ্যানের দিকে বেশী আসক্তি ছিল এবং অল্পদিন তিনি রেলে চাকরিও করিয়াছিলেন। কথিত আছে, আপিসে চাকরিকালে একটু অবসর

পাইলেই তিনি স্থির হইয়া ধ্যান করিতেন ; এইজন্য চোখ বুজিয়া থাকেন বলিয়া অনেকে উপহাস করিত। সেই সময় ব্রাহ্মসমাজের খুব প্রতিপত্তি। ধর্মলাভ করিবেন এই উদ্দেশ্যে তারকনাথ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার সময় যাইতেন। তাহার পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম শুনিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইলেন। ইঁহার পিতা পূর্বে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিতেন এবং সাধক লোক বলিয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব স্নেহ করিতেন। নবাগত যুবকটির পরিচয় পাইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশেষ স্নেহ ও আদর করিলেন এবং তাহাকে আপনার করিয়া লইলেন। তারকনাথ বিবাহ করিয়াছিলেন এবং গৃহত্যাগের অল্পদিন পরে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। তদবধি তিনি দেশের আর কোন খবর রাখেন নাই।

যোগেন মহারাজ—যোগেন মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ির ছেলে। ইঁহার পিতাকে সকলে চৌধুরী মহাশয় বলিয়া ডাকিত এবং চৌধুরী মহাশয় যোগেন মহারাজের দেহত্যাগের পরও বহুদিন জীবিত ছিলেন। যোগেন মহারাজ দেখিতে কৃশ, সাধারণের চাহিতে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, হস্তদ্বয় ও কর্ণ কিঞ্চিৎ লম্বা। কথাবার্তা অতি ধীর, সর্বদা হাস্যমুখ ও নকল করিতে তিনি অতি পটু ছিলেন। গোপনে তিনি বহু দান করিতেন। কাহারও মুখ শুষ্ক বিবর্ণ দেখিলে তিনি তখনই চঞ্চল হইয়া পড়িতেন এবং গোপনে সন্ধান লইয়া তাহার কষ্ট মোচন করিতেন। তাঁহার দয়া ও ভালবাসা অসীম ছিল তিনি অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ছিলেন। যদিও তিনি কৌতুক ও রহস্যপ্রিয় ছিলেন, আবশ্যক হইলে কিন্তু এত গম্ভীর হইতে পারিতেন যে, ভৎর্সিত ব্যক্তির হৃৎকম্প হইত, এমন কি মহাপ্রতাপান্বিত নরেন্দ্রনাথ ও গিরিশবাবু তাঁহাকে সম্মান ও ভয় করিয়া চলিতেন ; গিরিশবাবু তাঁহার কথা কখন অগ্রাহ্য করিতেন না। বর্তমান বেলুড় মঠের স্থানটি তাঁহার ও রাখাল মহারাজের উদ্যোগেই হইয়াছিল। বিশেষ কোন কার্য উপস্থিত হইলে অনেকেই

গোপনে তাহার পরামর্শ লইতেন এবং তিনি যাহা সিদ্ধান্ত করিতেন তাহাই হইত। জপ, ধ্যান ও সাধন বিষয়ে তাঁহার অতি উচ্চ অবস্থা ছিল। প্রথম অবস্থায় তিনি সমস্ত দিনই জপ করিতেন। এক সময়ে তাঁহার মনে হইল, রাত্রিটা ঘুমিয়ে কাটান হয় সেইজন্য ইহা জপের অন্তরায়-স্বরূপ। এইজন্য তিনি নিদ্রা ত্যাগ করিলেন, তিন দিন অনিদ্রিত হইয়া দিনরাত জপ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ সাধনায় তাঁহার শিরঃপীড়া হইলে এবং সকলের নিষেধ অনুযায়ী তিনি রাত্রে খানিকক্ষণ নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

যোগেন মাহরাজ ও তাঁহার স্ত্রী—পিতামাতা আত্মহত্যা করিবার ভয় দেখাইলে যোগেন মহারাজ তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে বিবাহ করিয়াছিলেন এভাব তাঁহার মনে কখন ছিল না এবং সাধারণেও তাহা জানিত না। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী যখন গঙ্গার ধারে নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগানে থাকিতেন তখন বাগান-বাড়িখানি একতলা ছিল,—কতিপয় কক্ষমাত্র। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পর্যবেক্ষণ ও সেবার জন্য যোগেন মহারাজের স্ত্রী আসিয়া রহিলেন। অন্দরের সমস্ত কার্য তিনি করিতেন এবং যোগেন মহারাজ অভিভাবক হইয়া বাহিরের সর্ববিষয়ে তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার ভাব এত উচ্চ ও গভীর ছিল যে, যদিও স্ত্রীর সহিত কার্যবশতঃ তাঁহার দেখা হইত, কিন্তু তাঁহার মনে চাঞ্চল্য-ভাব কখন হইত না এবং নিজের বিবাহিতা পত্নী বলিয়া কোন স্মরণই ছিল না। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর একটি ভক্ত স্ত্রীলোক সেবা করিতেছে, অন্যসকল ভক্ত মহিলা যেমন সেবা করে এটিও সেইরূপ, এই ভাব ছাড়া তাঁহার মনে অন্য কোনপ্রকার পার্থিব সম্পর্ক স্মরণ ছিল না। তিনি খুব উচ্চ অবস্থার সাধক ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলীর মধ্যে তিনি সকলের প্রণম্য।

গঙ্গাধর মহারাজ—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গরমিকালে একটি ষোলো-সতের বৎসরের বালক গৌরমোহন মুখার্জির গলির বাড়িতে সকাল-

বেলা নরেন্দ্রনাথকে খুঁজিতে আসিল। বালকটির চেহারা কৃশ, রং সাধারণ বাঙ্গালীর রং, নাক বিশেষ লম্বা ও বর্তুলাকার, অর্থাৎ তলোয়ারের ন্যায়। নগ্ন পা, ঝাঁকড়া চুল, পরিধানে খেটে কাপড় (কেটে) হাঁটু পর্যন্ত, গায়ে ময়ূরকণ্ঠী চেলী। বারংবার বসিতে বলায় বর্তমান লেখককে বসা-গলার আওয়াজে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "নরেনবাবু আছেন? নরেনবাবু আছেন? নরেনবাবু আছেন?" একটি টেবিলের পার্শ্বে চেয়ারে বসিয়া বর্তমান লেখক পাঠ করিতেছিলেন,—বেলা ন'টা আন্দাজ হইবে। আগন্তুক বালকটির চঞ্চল স্বভাব দেখিয়া বর্তমান লেখক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গোটাকতক ধমক দিলেন এবং পড়াশুনা না করিয়া ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কেন এইজন্য আরও ধমক দিবার উপক্রম করিলেন আগন্তুক বালকটি একটু ক্ষুণ্ণমনা হইয়া নিকটে একটা তক্তাপোশের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নরেন্দ্রনাথ তখন স্নান করিতেছিলেন; স্নান সমাপন করিয়া বাহিরের ঘরটিতে আসিলে আগন্তুক বালকটি খাবারের দোকান থেকে কিছু কচুরি, সিঙ্গাড়া ও পানতুয়া প্রভৃতি আনিয়া নরেন্দ্রনাথকে খাওয়াইলেন। নরেন্দ্রনাথ মিষ্টি দেখিয়া বলিলেন, "এ আবার কতকগুলো মিষ্টি এনেছিস কেন রে?" তাহার পর বেশ আদর করিয়া হাসিতে হাসিতে সখ্যভাবে নানা বিষয় ও ত্যাগবৈরাগ্যের কথা কহিতে লাগিলেন। এই হইল গঙ্গাধর মহারাজের সহিত বর্তমান লেখকের প্রথম পরিচয়।

গঙ্গাধর মহারাজের তিব্বতে গমন—বরাহনগর মঠ যখন প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল তখন নরেন্দ্রনাথ অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। হরমোহন মিত্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষের মারফৎ Asiatic Society-র Library হইতে বইগুলি আনাইয়া দিতেন। গঙ্গাধর মহারাজ একমন হইয়া সেই সব বৌদ্ধগ্রন্থগুলি শুনিতেন। শুনিতে শুনিতে, বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধদেশ কি ভাবে চলিতেছে সেইটি জানিবার জন্য তিনি তিব্বতে যাইতে মনস্থ করিলেন। তখন তাঁহার আঠার-উনিশ বৎসর বয়স হইবে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মাঘ মাসের শেষে বরাহনগর

মঠ হইতে যাত্রা করিয়া ৺গয়া, কাশী, অযোধ্যা ও নৈমিষারণ্য হইয়া হরিদ্বারে পৌছান; তথা হইতে নানা তীর্থ দর্শন করিয়া শ্রীনগর হইয়া তিব্বতে গমন করেন। তিনি তিব্বতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন তিনি থুলুং মঠে ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার কোন খবর ছিল না, সকলেই স্থির করিল গঙ্গাধর মহারাজ মরিয়া গিয়াছেন। শিবানন্দ স্বামী যখন বদরীনারায়ণ দর্শন করিতে যান তখন দেখিলেন যে তিব্বতী কাপড় পরিয়া একটি লোক বদরী-নারায়ণ দর্শন করিতে আসিয়াছেন এবং অচিরাৎ গঙ্গাধর মহারাজ বলিয়া চিনিতে পারিলেন। শিবানন্দ স্বামী গঙ্গাধর মহারাজকে আনিবার জন্য অনেক অনুনয় করিলেন কিন্তু তিনি কোন কথা না শুনিয়া পুনরায় তিব্বতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার জীবনের ঘটনা অদ্ভুত। সে সব কথা এখানে সন্নিবেশিত করা হইল না, সংক্ষেপে দু'একটি কথা মাত্র বলা হইল।

মাষ্টার মহাশয় বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—মাষ্টার মহাশয় বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর গলির বাটিতে বাস করিতেন। তাঁহার পিতার নাম মধুসূদন গুপ্ত এবং মাতামহ সুপ্রসিদ্ধ রামপ্রসাদ সেনের ভাইয়ের বংশ। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও অশ্বিনীকুমার দত্ত সহপাঠি ছিলেন এবং উভয়েই প্রেসিডেন্সি কলেজের Prof. Tawney-র ছাত্র। তিনি শ্যামপুকুরে, বিদ্যাসাগর স্কুলের ব্রাঞ্চের হেড মাষ্টার থাকাতে ছাত্র সমাজে খুব পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথের পিতৃ-বিয়োগের পর নরেন্দ্রনাথ গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া যখন সংসার চালাইবার মনস্থ করিলেন, সেই সময় তিনি গীতগোবিন্দ গ্রন্থখানির মূল ও বঙ্গানুবাদ দিয়া মতিলাল বসুকে লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহা মতিলাল বসু পরে নিজ প্রেস হইতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে পুস্তকখানি বাজারে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। মতিলাল বসু পরে সার্কাস মহলে Prof. Bose নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই সময় মাষ্টার মহাশয় নরেন্দ্রনাথের গৌরমোহন

মুখার্জির গলির বাটিতে প্রাতে আসিতেন এবং ভাঙ্গা তক্তাপোশ-খানিতে বসিয়া উভয়ে মিলিয়া গীতগোবিন্দের গান গাহিতেন। নরেন্দ্রনাথের গলা খাদে, মাষ্টার মহাশয়ের গলা ক্ষীণ স্বরে, এবং উভয়ে মিলিয়া যখন এক সময়ে গান করিতেন তখন তাহা শুনিয়া সকলের বড় ভাল লাগিত। মাঝে মাঝে তিনি তক্তাপোশ চাপড়াইয়া তাল দিতেন। গানেতে তিনি এমন মজিয়া থাকিতেন যে, তাঁহাকে যে স্নান আহার করিয়া স্কুলে যাইতে হইবে ইহা তিনি ভুলিয়া যাইতেন। বলরামবাবু আসিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া উঠাইয়া দিতেন। বলরামবাবু বলিতেন, "ও মাষ্টার, বেলা হয়ে গেল, স্কুলে যাবে না!" এইরূপে মাষ্টার মহাশয়ের সহিত প্রথম ঘনিষ্ঠতা জন্মায়।

লাটু মহারাজ—ছাপরা জিলার অন্তর্গত কোন এক গণ্ডগ্রামে লাটু মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে লেখাপড়া তাঁহার কিছুই হয় নাই, এমন কি অক্ষর-পরিচয় পর্যন্ত নয়। প্রথম অবস্থায় ১৮৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র দত্তর বাটিতে ভৃত্যরূপে কার্য করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথকে লইয়া তিনি অনেক সময় বেড়াইতেন। পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবাশুশ্রূষার জন্য রামচন্দ্র দত্ত দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপুরুষের এমন অনির্বচনীয় প্রভাব যে, লাটু মহারাজ অল্পদিনেই অর্থের প্রত্যাশা ছাড়িয়া দিয়া পরম ভক্তি-সহকারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা করিতে লাগিলেন। লাটু মহারাজ প্রায় সমস্ত রাত্রি জপ করিতেন এবং এই অভ্যাসটি তাঁহার শেষকাল পর্যন্ত ছিল। পাছে কেহ বিরক্ত করে এইজন্য তিনি একখানি কাপড় মুড়ি দিয়া নিদ্রিত হইয়াছেন এইরূপ ভান করিয়া সর্বদা জপ করিতেন। তৎপরে সাধু-জীবনে খুব উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। পথ মুক্ত করিয়া দিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই যে উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে পারে, লাটু মহারাজের জীবনী তাহার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। মানুষকে চাপিয়া রাখিয়া সমস্ত জাতিটা যে জড়পিণ্ড হইয়া গিয়াছে, এবং মুক্তপথ

পাইলে, সকলের আদর ও সমভাব পাইলে সকলেই যে উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে পারে ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্তস্থল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার ভাব ও মহান্ শক্তির ইহাও একটি উদাহরণ। সাধারণ লোককে কি ভাবে তিনি উচ্চ অবস্থায় লইয়া যাইতে পারিতেন, লাটু মহারাজ তাহার জ্বলন্ত চিহ্ন। লাটু মহারাজ যথার্থই উচ্চ অবস্থার সাধু হইয়াছিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিত। তাঁহার প্রাণ অতি সরল ছিল এবং সকলকে আহার করাইতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। অনেকেরই তিনি আশ্রয়স্থল হইয়াছিলেন।

বুড়ো গোপাল (গোপালদা)—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামী অদ্বৈতানন্দ (বুড়ো গোপাল বা গোপালদা) কাশী যাত্রা করিলেন। তিনি তথায় সোনারপুরার বংশী দত্তের বাড়িতে রহিলেন এবং ছত্র হইতে মাধুকরি করিয়া খাইতেন। তাঁহার বয়স অধিক হইয়াছিল, কিন্তু শরীর খুব সবল ছিল। এই কয়েক বৎসর তিনি কঠোর জপ-ধ্যান ও সাধন-ভজন করিয়াছিলেন। পরিচিত কেহ কাশীতে যাইলেই গোপালদার কাছে আশ্রয় লইতেন এবং তিনি খুব যত্ন-আত্তি ও দেখাশুনা করিতেন। এই সময় সাধনমার্গে তিনি খুব উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি সকলকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনা এইস্থানে বিবৃত করিলাম। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বর্তমান লেখক প্রথম ৺কাশীধামে যান। কোন জায়গায় বাসা ঠিক করিতে না পারিয়া কচুরি গলিতে একটি যাত্রী তোলা বাড়িতে একটা ঘর পাইয়া রহিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে গোপালদার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সময় ভাদ্র মাস। গোপালদা তখন বর্তমান লেখককে লইয়া নানা মন্দির দর্শন করাইতে লাগিলেন। কিন্তু বাসাটির বিষয় বড় কিছু বিশেষ অনুসন্ধান করেন নাই।

বর্তমান লেখকের জন্য গোপালদার উদ্বিগ্নতা—পরে রাত্রে তাঁহার হঠাৎ মনে পড়িল যে, কচুরি গলির বাড়িটি একটা গুণ্ডাদের আড্ডা। তখন তিনি ভয়ে সশঙ্কিত হইলেন এবং গুণ্ডারা বর্তমান লেখককে

মারধর করিয়া সমস্ত দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে কিনা, এই আশঙ্কায় সমস্ত রাত্রি তিনি নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। গোপালদা যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, ঘটনাও সেইরকম ঘটল। রাত্রি অধিক হইলে গুণ্ডারা দরজা ভাঙ্গিয়া দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু দরজা ভাঙ্গিতে না পারায় অবশেষে তাহারা নিরস্ত হইল। রাত্রিকালে অপরিচিত স্থানে গুণ্ডাদের এই হাঙ্গামায় বর্তমান লেখকের মন অতি উদ্বিগ্ন হইয়া রহিল এবং কখন সকাল হইবে, গোপালদার কাছে যাইবে এই প্রতীক্ষায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলেন। গোপালদা শেষরাত্রে তাড়াতাড়ি করিয়া আসিয়া রাস্তা হইতে ডাকিতে লাগিলেন। যখন তিনি বর্তমান লেখকের গলার আওয়াজ পাইলেন তখন তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া রাস্তা থেকে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তুই বেঁচে আছিস ত ভাই?" পরে তিনি তাঁহার উদ্বিগ্নতা ও সমস্ত রাত্রি জাগরণের কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, "ভাই তুই যে রাত্রিটা বেঁচে গেছিস এইটাই যথেষ্ট। চল ভাই, এইখান থেকে পালিয়ে যাই; ভাড়া যা চায় দিয়ে দে। আর ছাখ্ তুই জোয়ান ছেলে, তুই ভাই বেঁচে যা, কাশী থেকে পালিয়ে যা। আমি বুড়ো হয়েছি, আমার মরবার সময় হয়েছে, গুণ্ডারা না হয় আমার পা ভেঙ্গে দিক বা আমায় মেরে ফেলুক তা'হলে তুই ত বেঁচে যাবি।" এই বলিয়া উভয়ে গাঁটরি বিছানা সব লইয়া দ্রুতগতিতে পলায়ন করিয়া সোনারপুরার বংশী দত্তের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন এবং প্রভাত হইলে বর্তমান লেখক একখানি এক্কা ভাড়া করিয়া সারনাথ প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া লইলেন। ইহাই হইতেছে সাধুর মহত্ত্ব। রামকৃষ্ণ-ভক্তের প্রধান লক্ষণ যে, একজন নিজের প্রাণ দিয়া অপরকে বাঁচাইতে চায়। এই উপখ্যানটিতে গোপালদার মহত্ত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

দক্ষ মহারাজ—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বর্ষার প্রারম্ভে বৈকালবেলা একটি লোক বরাহনগর মঠের বড় ঘরের বাগানের দিকের জানালাটিতে আসিয়া বসিলেন। তিনি তখন গ্রাম্যভাবে বসিয়া রহিলেন, যেন কোন

পথিক কোন দূর দেশ থেকে আসিয়াছেন। বয়স চব্বিশ-পঁচিশের কিছু বেশী, দেখিতে কৃশ, কথাগুলি অতি ভদ্রভাবে কহিতে লাগিলেন। প্রত্যেক শব্দই ভাবব্যঞ্জক, এবং হস্ত ও মাথা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। পরে শুনা গেল ইঁহার নাম দক্ষ। তিনি তদবধি বরাহ-নগর মঠে, কখন বা বাগবাজারে থাকিতেন। তখন তাঁহার নরেন্দ্র-নাথের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ এবং সেই ভালবাসার জন্য তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। তিনি অল্পদিনের ভিতর অধ্যবসায়ের গুণে বেদান্ত, পঞ্চদশী, উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র বেশ আয়ত্ত করিয়া লইলেন এবং তর্ক করিতে বিশেষ পটু হইলেন। তর্ককালে দুইহস্ত সঞ্চালন, বক্ষ দোলন ও চক্ষু ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া তর্ক করিতেন। নরেন্দ্রনাথের একান্ত অনুগত হওয়ায় তিনি ভক্তমণ্ডলীর ভিতর একজন বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তীর্থপর্যটন করিতে চলিয়া যান।

হরি মহারাজ—বরাহনগর মঠ স্থাপনের কয়েক মাস পরে হরি মহারাজকে প্রথম দেখা যাইল। নরেন্দ্রনাথ ও বর্তমান লেখক একবার বাগবাজারে চিৎপুর রোড দিয়া আসিতেছিলেন, তখন ডাক্তারখানা থেকে একটি লোক বাহির হইয়া নরেন্দ্রনাথের সহিত অতি সম্ভ্রমে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। সময়টা বোধ হচ্ছে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। তাহার পর তাহাকে গেরুয়া পরা অবস্থায় বরাহনগরের মঠে দেখা গেল। হরি মহারাজ তখন আসাম অঞ্চল ঘুরিয়া আসিয়াছেন, সেইজন্য তিনি আসামের অনেক কথা কহিতে লাগিলেন এবং কোথায় ভাতে ঝোল মাখিয়া খাবার মত চা মাখিয়া ভাত খায়, সেই সমস্ত গল্প করিতে লাগিলেন। বরাহনগর মঠে তিনি কিছুদিন থাকিয়া পশ্চিমে চলিয়া যান।

কালী বেদান্তী (স্বামী অভেদানন্দ)—অভেদানন্দ স্বামীর পূর্ব-আশ্রমের নাম শ্রীকালী চন্দ্র, পিতার নাম ৺রসিকচন্দ্র চন্দ্র তিনি গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। পূজ্যপাদ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, তাঁহার ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ও সুরেশচন্দ্র মিত্র ইঁহারা চন্দ্র

মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। কলিকাতায় আহীরিটোলাতে কালী বেদান্তীর বাড়ি। বিদ্যানুরাগ, কঠোর তপস্যা ও বৈরাগ্যের ভাব কালী বেদান্তীর অল্প বয়সেই লক্ষিত হইয়াছিল। কোন অন্যায় কথা কেহ বলিলে কালী বেদান্তী অকুতোভয়ে তাহার মুখের উপর জবাব দিতেন, কোন সঙ্কোচ করিতেন না। কিন্তু বিদ্যানুশীলনে ও তপস্যায় ইঁহার ষোল আনা মন ছিল।

বাবুরাম মহারাজ—হুগলী জেলার অন্তর্গত চাঁপাডাঙ্গা লাইনের শেষ ভাগে, আঁটপুর গ্রামে ঘোষ বংশে বাবুরাম মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের বাড়ির সম্মুখের মিত্ররা ইঁহার মাতামহকুল। আঁটপুর অবস্থানকালে বর্তমান লেখক বৃদ্ধদিগের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, দেওয়ান কৃষ্ণমোহন মিত্রের স্থাপিত রাধাকৃষ্ণের মন্দির ও অতিথিশালার পর্যবেক্ষণের ভার বাবুরাম মহারাজের মাতামহের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। বাবুরাম মহারাজের মহামহের খুড়তুতো ভাইয়েরা বলিয়াছিলেন যে, বাবুরাম মহারাজের মাতামহ মন্দিরের পূজাদি পর্যবেক্ষণ ও অতিথিশালার কার্যাদি করিয়া সায়ংকালে একবার হবিষ্যান্ন ভোজন করিতেন। আনাজ তরকারি—একটা ভাতে হইত, একটা পোড়া হইত; সেই দিয়াই তিনি ভোজন করিতেন। বাবুরাম মহারাজের মা পিতার নিকট হইতে এই গুণ পাইয়াছিলেন এবং তিনিও লোকজনকে খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি অতি ধীর, ভক্তিমতী ও দয়ালু ছিলেন। বাবুরাম মহারাজের মা একপ্রকার সুজির বরফি তৈয়ারি করিতেন তাহা অতি সুস্বাদু ও উপাদেয় হইত এবং আগন্তুক ব্যক্তি দেখিলে তিনি ভোজন করাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। বাবুরাম মহারাজ যে লোকজনকে খাওয়াইতে এত ভালবাসিতেন, তাহা তিনি তাঁহার মাতামহের সদ্‌গুণ মাতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। বাবুরাম মহারাজের পিতৃকুল শক্তি উপাসক কিন্তু তিনি মাতামহের গুণানুসারে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন।

শরৎ মহারাজ ও শশী মহারাজ—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে বেলা

দুইটা আড়াইটার সময় স্কুলের ফেরৎ বই হাতে করে দুটি যুবক নরেন্দ্রনাথের অনুসন্ধানে ৩নং গৌর মোহন মুখার্জির গলির বাটিতে আসিল। নরেন্দ্রনাথের পিতার তখন মৃত্যু হইয়াছে। অবস্থা অতি অসচ্ছল। বাড়ির পূর্বের অবস্থার চিহ্ন এখন আর কিছুই নাই, কেবল দুইখানা পুরানো ভাঙ্গা তক্তাপোষ, তাহার উপর একখানা ছেঁড়া মাদুর দু'ভাঁজ করা; গৃহের পশ্চিমদিকে তক্তাপোষের উপর একটা ছেঁড়া তুলো বেরোন গদি, দু'একটা বালিশ, আর পশ্চিমদিকের দেওয়ালেতে একটা কাল মশারি পেরেকের উপর গুটান। কড়িকাঠ হইতে একটা টানাপাখার ছেঁড়া ঝালর ঝুলিতেছে। নরেন্দ্রনাথের অবস্থা সহসা বিপর্যস্ত হওয়ায় তিনি বড় বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নানা দুর্ভাবনায় শিরঃপীড়া হইয়াছিল। নাকে কর্পূরের নাস নিতেন এবং দরজা বন্ধ করিয়া নির্জনে বসিয়া থাকিতেন। যুবক দুটি "নরেন বাবু আছেন কোথা?" বারংবার বলায় বর্তমান লেখক দরজায় ধাক্কা দিয়া নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া দিল এবং যুবক দুটি ঘরে প্রবেশ করিল। যুবকদ্বয়ের মধ্যে একটি স্থূলকায়, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, গায়ে লংক্লথের চীনে কোট, জামা কাপড় বেশ ফরসা। কাঁধে একটা চাদর, হাতে বই। অপরটি কৃশ, ফ্যাকাসে ফরসা, একটু একটু দাড়ি হয়েছে এবং সঙ্গীটির চেয়ে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। পরিধেয় বস্ত্রখানি আধ ময়লা, গায়ে একটা কোরা কাপড়ের পিরান অর্থাৎ কণ্ঠ হইতে হৃদয় পর্যন্ত কাটা, তিনটি সুতার বোতাম আর হাতাটি মালাইকপ্ আস্তিন। একখানা চাদর লম্বাভাবে দোভাঁজ করে কাঁধে ফেলা। জামার হাতের বোতাম নাই—আস্তিন দুটো উলটে কনুই পর্যন্ত ঝুলছে। বুকের বোতাম বন্ধ না থাকায় বুকটা ফাঁক, জামাটা কোমর পর্যন্ত। মাথায় চুল উড়িখুড়ি, চেহারা দেখিলে কলিকাতার ছেলে নয় মনে হয়। স্থূলকায় যুবকটিকে দেখিয়া মনে হয় নবাগত কলিকাতাবাসী, কারণ তেমন চটপটে নয়। হাতের আস্তিন খোলা যুবকটি তক্তাপোষের উপর অন্যমনস্কভাবে পাইচারি করিতেছে আর টানাপাখার দড়িটা লইয়া এদিক ওদিক ঘোরাইতেছে, মাথা

নাড়িতেছে ও হাত দোলাইতেছে এবং কি যেন কথা বলিতেছে। নরেন্দ্রনাথ নিজের গদি ও তক্তাপোষের কোণটিতে বসিয়াছে এবং স্থূলকায় যুবকটি দেওয়ালের দিকে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ইহারা দুইজনে খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই—শরৎ ও শশী। এইজন্য প্রথম অবস্থায় দু'জনকার নাম যুক্ত করিয়া ডাকা হইত—শরৎ-শশী।

শরৎচন্দ্রের পিতার নাম গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী। শশী মহারাজের পিতাকে "ভট্টাচার্য মহাশয়" বলিয়া সকলে ডাকিতেন। তিনি অতি সরল প্রকৃতির জপপরায়ণ সাধক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বেলুড় মঠে যখন তিনি থাকিতেন নিদ্রাবস্থাতেও অভ্যাসবশতঃ তাঁহার মালা জপ চলিত এবং মাঝে মাঝে বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। তিনি খুব উচ্চদরের সাধক ও শক্তি উপাসক ছিলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মতিঝিলের সম্মুখে কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্রনাথকে বর্তমান লেখক কার্যবশতঃ ডাকিতে যান, তখন তিনি দেখিলেন যে, শশী মহারাজ অতি আগ্রহসহকারে বরাহনগরে যাইয়া ফাগুর দোকান থেকে গরম লুচি, গুটকে কচুরি ও কিছু মিষ্টি লইয়া আসিয়া নরেন্দ্রনাথ ও বর্তমান লেখককে খাওয়াইয়া দিলেন। হুটকো গোপাল তখন গেরুয়া পরিয়াছিল, শীঘ্র করিয়া এক কেটলি চা করিয়া দিল এবং বালক গঙ্গাধরও অনেক যত্ন করিয়াছিল।

শশী মহারাজ Albert College হইতে F. A. পাস করিয়া Metropolitan Institution-এ B. A. পড়িয়াছিলেন। ফোর্থ ইয়ারে উঠিয়া পরীক্ষা দেওয়ার কিছুদিন পূর্বে বাড়ি ছাড়িয়া দিলেন। শরৎ মহারাজ St. Xavier's College-এ Father Lafont-র কাছে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন।

নিরঞ্জন মহারাজ—নিরঞ্জন মহারাজের পূর্ব আশ্রমের নাম নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালের শেষভাগে বেলা চারটা সাড়ে চারটার সময় একটি যুবক নরেন্দ্রনাথকে ৩নং গৌর মোহন মুখার্জির গলিতে অন্বেষণ করিতে আসিলেন। নরেন্দ্রনাথের পূর্ব পরিচিত

ঘরে রাস্তার জানালার কাছে বসিয়া তিনি তামাক খাইতে লাগিলেন। যুবকটি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ—কোঁকড়ান কোঁকড়ান দাড়ি, হস্ত ও অবয়ব দীর্ঘ যেন কসরৎ-করা শরীর। কথাবার্তায় খুব পটু, মজলিসি ও অনেক বিষয়ের খবর জানিতেন। গম্ভীর স্বভাব ও খুব তেজস্বী। অপরকে হাত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার খুব ছিল। প্রাণটি অতি সরল। কথাবার্তায় বুঝা যাইল যে, যুবকটি কলিকাতা বা তার সন্নিকটস্থ স্থানে থাকেন। এই হইল নিরঞ্জন মহারাজের সহিত বর্তমান লেখকের প্রথম পরিচয়। নবাগত ব্যক্তিটি হাসিকৌতুকে সকলকে বেশ আকৃষ্ট করিতে-ছিলেন। জানালার নিকট কতকগুলা তামাকের ছাই, গুল ও থুথু দেখিয়া বলিলেন, "একি রে, এত নোংরা!" এই বলিয়া তিনি একগাছি ঝাঁটা লইয়া নিজে ঝাঁট দিলেন ও কলকের পর কলকে তামাক টানিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি মাঝে মাঝে আসিতেন এবং পরে কাশীপুরের বাগানে তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক হরিনাথ দে ইঁহার সম্পর্কে ভাগিনেয় ছিল।

তুলসী মহারাজ—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে বর্তমান লেখক নরেন্দ্রনাথকে বরাহনগর মঠে খুঁজিতে যান। সেদিন নরেন্দ্রনাথ কোন্নগরে গঙ্গার ঘাটে নবাই চৈতন্য নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট গিয়াছিলেন। নবাই চৈতন্য সম্পর্কে মনোমোহন মিত্রের জ্ঞাতি ঠাকুরদাদা। বৃদ্ধ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইতেন এবং কোন্নগরে গঙ্গার ঘাটে একটু ঝুপড়ি বাঁধিয়া তথায় সাধনভজন করিতেন। নরেন্দ্রনাথ সেইজন্য বুড়ো নবাই চৈতন্যের কাছে গিয়াছিলেন। বর্তমান লেখক দেখিলেন যে, নূতন একটি যুবক, বয়স কুড়ি বাইশ বৎসর আন্দাজ হইবে, শরীরটি কৃশ কিন্তু কসরৎ-করা সুদৃঢ়, চক্ষু উজ্জ্বল, বাক্য ও স্বর তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট এবং আজ্ঞাবহ। শিবানন্দ স্বামী ও শরৎ মহারাজ তখন উপস্থিত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া আনিবার জন্য যুবকটিকে বলিলে সে কোন দ্বিধা না করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেল এবং নৌকা করিয়া কোন্নগরে গিয়া নরেন্দ্রনাথের কাছে খবর দিল; এবং উভয়ে

সন্ধ্যার সময় প্রত্যাগমন করিলেন। এই হইল তুলসী মহারাজের সহিত বর্তমান লেখকের প্রথম সাক্ষাৎ। ইহার জন্মস্থান বাগবাজার বোসপাড়া।

গোপালের মা—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে বর্তমান লেখক একদিন বেলা তিন-চারটার সময় বরাহনগর মঠে যান। রৌদ্রে হাঁটিয়া দ্রুতপদে আসিয়াছেন, মাথায় ছাতাও নাই, মুখটা কিছু লাল হইয়া উঠিয়াছিল এবং ঘামও হইতেছিল। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক উপরকার সিঁড়ি হইতে সবে নীচেকার পড়ো দালানটিতে আসিয়া নামিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিতে স্থূলকায়, দাঁত অনেক পড়িয়া গিয়াছে, মাথার চুলও অনেক সাদা হইয়া গিয়াছে। বয়স পঞ্চান্ন হইতে ষাটের ভিতর। বৃদ্ধা নামিয়া আসিয়াছেন, বর্তমান লেখক উপরে উঠিবেন এমন সময় বৃদ্ধা বর্তমান লেখককে ধরিয়া কাঁধের উপর হাত দিয়া নিজের আঁচল দিয়া মুখ মুছাইতে মুছাইতে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন। একবার মুখ মোছান, একবার দাড়িতে হাত দিয়া চুমু খান—যেন কত আশীর্বাদ করিতেছেন, অনবরত বলিতে লাগিলেন, "ওরে তুই যে নরেনের ভাই, তোর মুখে রোদ্দুর লেগেছে, তোর মুখে ঘাম বেরিয়েছে, মুখটা লাল হয়ে উঠেছে, আমার দেখে বুকটার ভিতর কেমন কচ্ছে রে।" স্নেহপূর্ণ করুণস্বরে এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলেন এবং আঁচল দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিতে লাগিলেন। এমন একটা স্নেহমাখা, জ্বলন্ত প্রত্যক্ষ ভালবাসা-পরিপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করিতেছিলেন যে, তাহাতে বর্তমান লেখক বিমোহিত ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। প্রণাম বা বাক্-নিষ্পত্তি কিছুই করিতে পারিলেন না। এই নূতন রাজ্যের ভালবাসা দেখিয়া বর্তমান লেখকের চোখে জল আসিল এবং এইভাবে খানিকক্ষণ থাকিয়া দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া যাইল। বৃদ্ধাও পরে ধীরে ধীরে বরাহনগর বাজারের দিকে চলিয়া যাইলেন। ইনিই হচ্ছেন বিখ্যাত গোপালের মা, অর্থাৎ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপাল-ভাবে ইঁহাকে দর্শন দিয়া মা বলিয়াছিলেন।

লেখককে গোপালের মায়ের সন্দেশ খাওয়ান—মাস তিনচার পরে বর্তমান লেখক বলরামবাবুর বাড়িতে বৈকাল বেলা গিয়া দেখিলেন যে,

গোপালের মা অল্পক্ষণ হইল বাহির হইতে আসিয়াছেন, তখনও ক্লান্ত; বর্তমান লেখককে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি নিকটে আসিলেন এবং আঁচলের গাঁট খুলিয়া কি বাহির করিতে লাগিলেন। তাহার পর কলাপাতে মোড়া দুটি আতাসন্দেশ বাহির করিয়া বর্তমান লেখকের মুখে একটু করে খাওয়াতে লাগলেন ও বাঁ হাতটি দিয়া মাথায় কাঁধে ও পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন। তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে, তোর জন্য যে দুটি সন্দেশ নিয়ে সিমলাতে গেছলুম, তা নরেন নেই তাই কেঁদে কেঁদে কাঁসারিপাড়ার রাস্তা দিয়ে চলে এলুম। তোদের বাড়িতে ঢুকতে পারলুম না। নরেন ছাড়া তোদের বাড়িতে কি করে উঠব, আমার বুকটা দপ্ করে উঠল, তাই তুই খা, তোর জন্য ভাবছিলুম, তুই খা।" পরে শুনা গেল তিনি কামারহাটির গোবিন্দ দত্তর ঠাকুরবাড়ি হইতে সকালে আসিয়াছিলেন। বলরামবাবুরা দুটি সন্দেশ জল খেতে দিয়েছিলেন সেই দুটি সন্দেশ কলাপাতে মুড়িয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। তারপর দুপুরবেলা ভাত খেয়ে সেই দুটি সন্দেশ নিয়ে বাগবাজার থেকে সিমলায় গিয়েছিলেন আবার তথা হইতে বাগবাজারে ফিরে এসেছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে এরকম নূতনতর ভালবাসা দেখা গিয়াছিল যাহা জগতে চিরকাল থাকিবে।

গোপালের মাকে প্রশ্ন ও তাহার উত্তর—খানিকক্ষণ পরে বাহিরের দশ-বারটি লোক আসিল। সেদিন যোগেন মহারাজ বারাণ্ডায় পায়চারি করিতে করিতে বর্তমান লেখকের সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন। আগন্তুক ব্যক্তিদিগের ভিতর অনেকেই কলেজে পড়া, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও একটু একটু জপধ্যানও করিয়া থাকেন। সিঁড়িতে উঠিয়া ডানদিকের ছোট ঘরটিতে বারাণ্ডার দিকের দরজাটিতে গোপালের মা বসিয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে সকলে নানা বিষয়ের দুরূহ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। গোপালের মা বলিলেন, "ওগো আমি যে মেয়েমানুষ, বুড়োমানুষ, আমি কি তোমাদের শাস্তোরের কথা জানি,

তোমরা যোগেন, শরৎ, তারককে জিজ্ঞাসা করগে যাও না।" তাহার পর বাহিরের লোকেরা অনবরত গোপালের মাকে জিদ করিতে লাগিল। গোপালের মা বলিলেন, "তবে দাঁড়াও বাপু, গোপালকে জিজ্ঞাসা করি, ও গোপাল ও গোপাল! ওরে, এরা কি বলছে? আমি কি ছাই কিছু বুঝতে পারি, এরা কি শাস্তোরের কথা বলছে, তুই বাপু এদের বলে দে না।" এই কথা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল। এ আবার কি ব্যাপার! কাহার সঙ্গে স্পষ্টভাবে কথা কহিতেছেন! তাহার পর যেন হাওয়ার ভেতর থেকে কে কথা বলিতেছেন সেইরূপ ভাবে দৃষ্টি ও মুখভঙ্গি করিয়া গোপালের মা বলিতে লাগিলেন, "ওগো, গোপাল এই বলছে" বলিয়া দুরূহ প্রশ্নগুলির অদ্ভুত মীমাংসা করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত কথা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং দু'একটি লোক ব্যতিরেকে সকলেই প্রশ্নের উত্তর পাইয়া তৃপ্ত হইলেন। গোপালের মা বলিয়া উঠিলেন, "ও গোপাল, তুই চলে যাচ্ছিস কেন? ওর কথার জবাব দিবিনি? তুই ওদিকে যাচ্ছিস কেন? ফিরে আয়না। তোর বাপু কেবল খেলা আর ছুটোছুটি; আয় না, আমার কাছে আয়না, ওদের কথার উত্তর কর না!" কিন্তু গোপাল তখন খেলিতে চলিয়া গেল। দুই তিনটি লোকের প্রশ্নের উত্তর হইল না, তাহারা বিষণ্নমনে বাড়ি ফিরিয়া গেল।

আর একদিন গোপালের মা বলরামবাবুর বাড়িতে বসিয়া আছেন। বর্তমান লেখক বৈকালবেলা যাইয়া সকলের সহিত দেখাশুনার পর বারাণ্ডায় পায়চারি করিতে লাগিলেন। অনেকগুলি লোক আসিয়াছে তাহারা সকলেই গোপালকে দেখবে বলে পেড়াপীড়ি করিতে লাগিল। গোপালের মা গোপালকে ডাকলেন। গোপাল সেদিন বড় দুরন্ত হয়েছে কিছুতেই আসতে চাচ্ছিল না। উপস্থিত লোকগুলি যতই জেদ করিতেছিল—গোপালকে দেখান না, গোপাল ততই সেদিন দুষ্টপনা আরম্ভ করিল, হুড়াহুড়ি দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল, একবারও গোপালের মায়ের কাছে এল না, কোন প্রশ্নের উত্তর দিল না।

গোপালের পা টেপা—অবশেষে গোপালের মা রেগে বারাণ্ডা দিয়ে, বড়ঘরটি দিয়ে, এ দোর ও দোর দিয়ে ছুটিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুড়ো মানুষ, মোটা থপথপে, দৌড়াইতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে গোপালকে ক্যাঁক্ করে ধরে ফেলে বকৃতে আরম্ভ করলেন। তারপরে যেন গোপালের গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন, গোপাল যেন বড় অপ্রস্তুত হয়েছে। গোপালের মা প্রথম বসে ডান পাটি ছড়িয়ে দিলেন, বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা বাপু তুই এই পাটি টেপ তাহলেই হবে, তুই ছেলেমানুষ আর বেশী করতে হবে না; তা ওঠ, খেলগে যা। আবার এ পাটাও টিপবি? একটা হল, বেশ হয়েছে। তা যাক্, নে বাপু, এ পাটাও টেপ্, তুই ত ছাড়বিনি" এই বলিয়া বাঁ-পাটা ছড়িয়ে দিলেন। তাহার পর যেন কাহার দাড়ি ধরে চুমু খেলেন, এইরকম-ভাবে হাত করিয়া নিজের হাত দিয়া চুমু খাইলেন। কিন্তু সে দিন আর কোন প্রশ্নের উত্তর হইল না। বহুবার এরকম দেখা গিয়াছিল, সেইজন্য নূতন বলিয়া কোন বোধ হইত না।

গোপালের মা ব্রাহ্মণের কন্যা। অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন এবং ভয়ঙ্কর নিষ্ঠাবতী ও শুচিবাইগ্রস্ত ছিলেন। তিনি সারাদিন জপ করিতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার পর থেকে তাঁহার সেই শুচিবাই ভাবটি চলিয়া যাইল, আর নিজের ইষ্টকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেন ও তাহার সহিত কথা কহিতেন। তাঁহার উদারভাবের একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হইল।

গোপালের মা ও নিবেদিতা—সিস্টার নিবেদিতা যখন প্রথম আসিয়াছিলেন, তিনি বাগবাজারে একখানি বাড়ি ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। মাসখানেক বা মাস-দুই হদ্দমদ্দ আসিয়াছেন, বাংলা ভাষা কিছুই জানেন না। একদিন বৈকালবেলা গুপ্ত মহারাজের সহিত নিবেদিতা রাস্তায় যাইতেছেন, এমন সময় গোপালের মা অপর-দিক দিয়া আসিলেন। গোপালের মা গুপ্ত মহারাজকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও গুপ্ত, এটি কে গা? একি নরেনের মেয়ে সেই যিনি

নরেনের সঙ্গে এসেছেন ?" গুপ্ত মহারাজ বলিলেন, "হ্যাঁ, ইনি স্বামীজীর সঙ্গে এসেছেন।" তখন গোপালের মা নিবেদিতাকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমার গোপালের ? তুমি আমার গোপালের ? তুমি আমার গোপালের ?" এই বলিয়া নিবেদিতার দাড়িতে হাত দিয়া চুমু খাইতে লাগিলেন আর নিবেদিতার ডানহাতটি ধরিয়া রাস্তায় পরিচিত লোক-দিগকে বলিতে লাগিলেন, "ওগো, এটি আমার গোপালের, এটি নরেনের মেয়ে।" নিবেদিতা বলিতেন, "গোপালের মা যখন আমার দাড়ি ধরে চুমু খাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন 'তুমি কি আমার গোপালের ?' তখন আমার সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল এবং শরীরের ভিতর কি এক অনির্বচনীয় শক্তি প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি যেন এক নূতন ভালবাসার জগতে যাইতে লাগিলাম, তার যেন কোন কূলকিনারা নাই। তখন যেন আমার প্রাণের ভিতর একটা সাহস, ভালবাসা জেগে উঠল।"

গোপালের মায়ের হাত ভাঙ্গা—গোপালের মা কামার-হাটির বাগানে থাকিতেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ শুনিয়া তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়া যান এবং তাঁর ডান হাতে একটু চোট লাগে হাতটা ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। তাঁহার সেবাশুশ্রূষার জন্য অপর একটি পঞ্চাশবৎসরের স্ত্রীলোক সঙ্গে আছেন। একদিন বাবুরাম মহারাজ বর্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া গোপালের মাকে দেখিতে যান। বেলা দেড়টা হইবে, গোপালের মা ও সেই স্ত্রীলোকটি আহার করিতে বসিয়াছেন। এবং কিছু আহারও করিয়াছেন। বাবুরাম মহারাজ বর্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া সেই ঘরটিতে একেবারে ঢুকিয়া পড়িলেন। স্ত্রীলোকটি আহার করিতেছিলেন কিন্তু অপরিচিত দুটি পুরুষ দেখে আহারের থালাখানি থেকে হাত তুলে নিলেন এবং মুখে ঘোমটা দিলেন। গোপালের মা সেই দেখে বলিয়া উঠিলেন, "ওগো, ওদের দেখে লজ্জা কচ্ছ কেন ? ওরা যে আমার গোপালের!" এমন মধুর ও পবিত্রতাপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি করিলেন যে, স্ত্রীলোকটি আর কোন লজ্জা

করিলেন না মুখের ঘোমটা খুলিয়া আহার করিতে লাগিলেন। বাবুরাম মহারাজ ও বর্তমান লেখকের মনেও আর কোন দ্বিধাভাব রহিল না। তখন গোপালের মা বলিতে লাগিলেন, "ও মহিন, তুই কোথায় ছিলি? (কারণ বর্তমান লেখক তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া বহুদিন পরে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন) তুই কিছু খবর দিস্‌নি কেন? তুই এইখানে আয়, বস্"। এই বলিয়া গোপালের মা সেইখানে আহার করিয়া হাত ধুইয়া লইলেন এবং বাবুরাম মহারাজ ও বর্তমান লেখককে একটি পান সেজে দিতে বলিলেন। গোপালের মার এমন একটি আশ্চর্য প্রভাব যে, বাবুরাম মহারাজ, বর্তমান লেখক ও সেই স্ত্রীলোকটি একসঙ্গে পান সাজিতে বসিলেন এবং খাইতে লাগিলেন কিন্তু সঙ্কোচ বা দ্বিধাভাবের লেশমাত্র কাহারও মনে আসিল না।

১৯০৬ সালের শেষ কয়েক মাস সিস্টার নিবেদিতার গৃহে গোপালের মাকে চিকিৎসার জন্য রাখা হইয়াছিল এবং সিস্টার নিবেদিতা ও গুপ্ত মহারাজ তাঁহার দেখাশুনা করিয়াছিলেন ও একটি ব্রাহ্মণের কন্যাও তাঁহার নিকট থাকিতেন।

নরেন্দ্রনাথ ও ডাঃ Salzar—অতুলবাবুর একটি মাত্র কন্যা, বিবাহ হইয়াছে কিন্তু সর্বদা অসুস্থ। পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় ডাক্তার Salzar-কে আনাইয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইতে লাগিল। যখন ডাক্তার Salzar আসেন তখন নরেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত ছিলেন। চিকিৎসা সমাপন করিয়া ডাক্তার Salzar উপরকার ছাতটিতে একখানি চেয়ারে বসিলেন। নরেন্দ্রনাথের তখন গলার আলজিভ ফুলিয়াছিল এবং এই ব্যাধিটি তাঁহার আত্মীয়দের সকলেরই আছে। নরেন্দ্রনাথের অসুখের কথা শুনিয়া ডাক্তার Salzar বলিলেন, "ঔষধের কোন আবশ্যক নাই, ঠাণ্ডা জল দিয়া কুলকুচি করিবে এবং গলায় ঠাণ্ডা জল লাগাইবে, তাহা হইলে আলজিভটা কুঁচকাইয়া যাইবে ও আপনা আপনি শক্ত হইয়া উঠিবে, এবং আর বৃদ্ধি হইবে না।" তাহার পর

বেদান্তশাস্ত্রের কথা উঠিল। Salzar জাতিতে জার্মান, খুব পণ্ডিতলোক ছিলেন ও থিয়সফিস্ট সম্প্রদায়ের। তিনি অনেকটা বৌদ্ধভাবের লোক ছিলেন। নরেন্দ্রনাথের সহিত শাস্ত্র আলোচনায় ডাক্তার Salzar এত মাতোয়ারা হইয়া গিয়াছিলেন যে, নিজের কাজকর্ম ভুলিয়া তিনচার ঘণ্টা পর্যন্ত তিনি ঐ বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন এবং শেষে খুব খুশী হইয়া ফিরিয়া যান।

নরেন্দ্রনাথের পেটের অসুখের জন্য আফিম খাওয়া—এই সময় নরেন্দ্রনাথের আবার পেটের অসুখ হইতে লাগিল। পূর্বে যেমন পাথুরি রোগে কষ্ট পাইয়াছিলেন এবার আবার তেমনি পেটের অসুখে কষ্ট পাইতে লাগিলেন। অনেকে তাহাকে অল্প পরিমাণে আফিম খাইতে বলিল। একদিন তিনি সকলের কথা অনুসারে একটু আফিম খাইলেন, তাহাতে শরীরে বড় যন্ত্রণা হয়। অতুলবাবু আফিমের কথা শুনিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িলেন এবং কয়েকদিন ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "এরা কি কচ্ছে, নরেন্দ্রনাথকে আফিম খাওয়ান শেখাচ্ছে? এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকটাকে নষ্ট করবে! আফিম খেলে যে মানুষ নিঝঝুম হয়ে যায়। প্রতিভা বা তেজ আর কিছু থাকবে না, আফিম যেন সে আর কিছুতেই না খায়।" যাহা হউক, তদবধি আফিম খাওয়া স্থগিত হইল।

কালী বেদান্তীর পিতা—একদিন বৈকালবেলা কালী বেদান্তী গিরিশবাবুর ঘরে গিয়া বসিলেন। গিরিশবাবু সেদিন বেশ হাস্য-কৌতুকভাবে ছিলেন। কালী বেদান্তীকে দেখিয়া গিরিশবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দ্যাখ্ কেলো, তোর বাপের মার খেয়ে আমি স্কুল ছেড়ে দিয়েছি। আমি দুষ্টছেলে ছিলুম, বেঞ্চিতে কি অতক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে পারতুম? তোর বাবা ক্লাসে ঢুকে প্রথম শুরু করতেন, 'Idle and inattentive boys should go last'." কালী বেদান্তীর বাপের কথাবার্তা খুব হাস্যপূর্ণ ছিল সেইজন্য সকলে তাঁহার কথা লইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন।

একদিন দমদম মাষ্টার নূতন বাজারের দিকে যাইতেছিল, পথে কালী বেদান্তীর বাপের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি দমদম মাষ্টারকে বলিলেন, "কি হে, তোমাদের কালী এখন কি কচ্ছে? তার কি Creator দেখা হল, না Creation দেখে দেখে ঘুরে বেড়ান হচ্ছে?" তিনি আর একবার বলিয়াছিলেন, "আমি ব্যাটা কি ধার্মিক! আমার এক ব্যাটা খৃষ্টান, এক ব্যাটা হল সন্ন্যাসী আর এই ব্যাটাকে (অপর ছেলেটিকে নির্দেশ করিয়া) মুসলমান করে দেবো।" তিনি খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন এবং নিজের মর্যাদা রাখিয়া চলিতেন। তাঁহার কথা লইয়া কিছুদিন বেশ আনন্দ চলিয়াছিল।

আনন্দময় শশী মহারাজ—শশী মহারাজের আনন্দ হইলে তিনি এক নূতন শব্দ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। মাঝে মাঝে তিনি —'চোপ-সা' বলিয়া চীৎকার করিতেন, অর্থাৎ জিনিসটা খুব ভাল হইয়াছে। এই কথাটি তাঁহার স্বরচিত, এইজন্য অনেকেই পিছন থেকে শশী মহারাজকে বলিতেন, চোপ-সা।

শশী মহারাজ যদিও খুব গম্ভীর ছিলেন কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি শিশু বালকের ন্যায় আনন্দ করিতেন ও গল্প করিতেন। এই গল্পটি বলিয়া তিনি বিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিতেন। এক গ্রামে দুটি ভাই ছিল। একটি ভাই এক বাবুর সহিত কলিকাতায় আসিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিল। তাহারা গরীব লোক, গ্রামের একটা কুটিরে থাকে। পূজার সময় বাবুরা বাড়ির ছেলেদের কাপড়জামা কলিকাতা হইতে তৈয়ারি করিয়া দিল এবং সেইসঙ্গে গরীব ছেলেটিকেও একটি পিরান তৈয়ারি করিয়া দিল। ছেলেটি গ্রামে ফিরে গিয়ে তাহার ভাই ও সমবয়সী অনেক ছেলেকে 'কলকাতা থেকে আমি একটা নূতন জিনিস এনেছি তোদের দেখাব' বলিয়া ডাকিল। তাহার পর সে ঘরের ভিতর গিয়া দোরে খিল দিয়া পিরানটি বাহির করিয়া বুকে বেতাম দিয়া পরিয়া বাহিরে আসিল। গ্রামের ছেলেরা দেখে তো অবাক্ যে, এর এতবড় মাথা ছোট্ট গর্তের ভিতর দিয়ে কি করে বেরিয়ে

এলো। তখন তাহারা সেই বালকটির চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দরজা কোথায় দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা দরজা দেখিতে না পাইয়া তখন বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ ভাই, ওর ত দরজা নাই, তুই মাথা গলালি কি করে?" তখন সে, অপর সকল বালকের হার হইয়াছে দেখিয়া নাচিয়া নাচিয়া হাততালি দিয়া বলিতে লাগিল, "আমি ত বোল্‌বুনি, বোল্‌বুনি, বোল্‌বুনি।" শশী মহারাজের কোন কিছু আনন্দ হইলে প্রায় বলিতেন, "আমি ত বোল্‌বুনি, বোল্‌বুনি, বোল্‌বুনি।"

নিরঞ্জন মহারাজের Mesmerism করিবার শক্তি—বরাহনগর মঠের মাঝ বরাবর অবস্থায় কয়েকটি যুবক মঠে যাইত। তাহাদের ভিতর কেহ কেহ Mesmerism জানিত। একদিন তাহাদের ভিতর একজনকে Mesmerism করিল এবং নানালোকে নানারকম প্রশ্ন করিতে লাগিল ও উত্তর পাইল। কিন্তু প্রশ্নোত্তরগুলি ঠিক হইতেছে কিনা জানিবার জন্য শশী মহারাজ বলরাম বাবুর বড় ঘরটির কথা প্রশ্ন তুলিলেন, তখন সে আবিষ্ট অবস্থায় ঠিক ঠিক সমস্ত বলিয়া যাইতে লাগিল। সেই বালকটিকে বারবার 'আধার' করায় কিছুদিন বাদে সে জড় হইয়া যায়, এবং মাথা খারাপ হইয়া পাগলের ন্যায় হইল। সেইজন্য শশী মহারাজ সকলকে Mesmerism করিতে বারণ করিতেন। নিরঞ্জন মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বে এই Mesmerism কার্যে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। কথিত আছে তিনি নাকি ঐ ক্রিয়ার দ্বারা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আবিষ্ট করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য হওয়ায় স্বয়ং অনুগত হইয়া পড়েন।

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আবিষ্ট ক্রিয়ার গল্প,—১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত এটর্নি মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পূজার অবকাশে বেলুড় মঠের পার্শ্বে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটিতে গিয়া বাস করেন এবং সর্বদাই মঠে বসিয়া থাকিতেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি বলেন যে, নিরঞ্জন নামে একটি লোক আবেশ-ক্রিয়াতে

বিশেষ নিপুণ ছিলেন। অনেকদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। শুনিয়াছি তিনি এই মঠেরই একজন সন্ন্যাসী হইয়াছেন। এই বলিয়া তিনি একটি ঘটনা বলিলেন। একদিন তাহারা কোন স্থানে আবিষ্ট-ক্রিয়া করিতেছিলেন। নিরঞ্জন তাহাতে 'আধার' হন। একটা লোক পায়ের হাঁটুর বাতেতে অনেকদিন ভুগিতেছিল, নানান ঔষধ দিয়াছে কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। লোকটি সেই সময় আসিয়া অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া তার বাত সারাইয়া দিবার জন্যে আধারকে অনুরোধ করিতে লাগিল। আধার একটি পিতলের বাটি আনিতে বলিলেন, সেইটি তিনি অনেকক্ষণ হাতে রাখিয়া শেষে বলিলেন, "এই বাটিটা হাঁটুর উপর চাপিয়া দাও।" বাটিটা হাঁটুতে লাগাইতে প্রথমবার তাহা হইতে অসহ্য তেজ বাহির হইতে লাগিল এবং দু' তিনবার দিবার পর বাটিটা হাঁটুর উপর আটকাইয়া গেল। সেইরকম অবস্থায় অনেকক্ষণ থাকিয়া বাটিটা আপনি খুলিয়া গেল এবং তাহার পর থেকে তাহারও বাত সারিয়া যাইল! তারপর মোহিনীবাবু প্রভৃতিরা কালীঘাটের পাঁঠার মুড়া আনিতে বলিলেন; মিনিট চার-পাঁচ পরে পার্শ্বের ঘরেতে দড়াম করে একটা আওয়াজ হইল, সকলে গিয়া দেখে যে, গরদান শুদ্ধ দুটি কালীঘাটের পাঁঠার মুড়া রহিয়াছে। এই কথা বলিয়া চলিয়া যাইবার পরদিন মোহিনীবাবু একখানি পোষ্টকার্ড হাতে করিয়া আসিলেন। পূর্ব উল্লিখিত ব্যক্তিটি মোহিনীবাবুকে লিখিয়াছেন যে, নিরঞ্জন বলে সেই ছোকরাটি কোথায়? সন্ধান করিয়া তাঁহাকে বলিবেন যে, এতদিনের পর আমার বাত আবার জাগিয়াছে। কিন্তু নিরঞ্জন মহারাজ তখন পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছিলেন। মাস দুই পরে নিরঞ্জন মহারাজ বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলে কৌতুকবশতঃ তাঁহাকে সেইসকল কথা বলিলে তিনি বলিলেন যে, "সে বহুকালের কথা, সে সব কিছু মনে নাই, তবে মোহিনী সে সময় সঙ্গে থাকিত, তাহার মনে থাকিতে পারে। কারণ আবিষ্ট-অবস্থায় লোকে নিজে কি করে, পরে তাহার কিছু মনে থাকে না।"

বরাহনগরের মঠে সকলের বিষণ্ণভাব ও নরেন্দ্রনাথের সান্ত্বনা দান—১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাস নাগাত যখন প্রথম মঠ স্থাপন হইল তখন সকলেই মুষ্টিভিক্ষা করিয়া নিজেদের আহার চালাইতে লাগিলেন। কাহারও প্রদত্ত কোন সাহায্য গ্রহণ করিবেন না এবং কোন গৃহাদিও নির্মাণ করিবেন না। তখন সকলেরই মুখে এই রব উঠিল যে, "সাধু ও সাপ পরের গর্তে থাকে নিজেরা কোন গৃহাদি নির্মাণ করে না।" কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে, উচ্চ শিক্ষিত—জোয়ান বয়সে যদিও নূতন বৈরাগ্যে মহাকঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন কিন্তু শরীর তাহা সহ্য করিল না। অনেকেই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন এবং গৃহাদি ও পিতামাতার নানারকম কষ্ট ও অনুনয়বাক্যে অনেকেই তখন বাড়ি ফিরিয়া যাইতে স্থির করিলেন। সম্মুখে কোন প্রত্যক্ষ জিনিস দেখিতে পাইতেছেন না, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, দুঃসহ কষ্ট দিবারাত্র সহ্য করিতেছেন, অনাহারে ও অনিদ্রায় জপধ্যান, এইজন্যই মনটা বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। শশী মহারাজ বলিলেন,—"নরেন, আর ত কষ্ট সহ্য কর্তে পারি না, সকলকে নিয়ে কি করলে?" নরেন্দ্রনাথ তখন অনেক সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধিত করিয়া বলিলেন,—"শশী, একখানা বাইবেল দে।" শশী মহারাজ একখানা বাইবেল দিলে নরেন্দ্রনাথ একান্তমনে ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে চক্ষু নিমীলিত করিয়া বাইবেলটা খুলিয়া এক জায়গায় অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। স্থানটি পড়িয়া দেখিলেন যে, তাহাতে লিখিত আছে—"No man, having put his hand to the plough, and looking back, is fit for the kingdom of God." লাঙ্গলে হাত দিয়া যে পিছন ফিরে চায় তাহার ফসল হয় না। নরেন্দ্রনাথের মনে তখনই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা উদয় হইল, তিনি বলিলেন, "ওরে, তিনি বলতেন খানদানী চাষা একক্ষেপ যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে সে কি দোকানপাট করে? না দ্বিতীয়বার চাষ করে?" এই আশাপূর্ণ বাণীতে সকলেরই মন স্থির হইল। নরেন্দ্রনাথ আরও বলিলেন, "অনেকবার জীবন ত গিয়াছে, অনেকবার জন্মেছি, মরেছি,

আর একবার না হয় ইচ্ছা করে জীবনটা নাশ করি, ব্যর্থ করি। ডুবে দেখা যাক তলা জলের কত নীচেতে।”

নরেন্দ্রনাথের বাউলের গান গাওয়া—এই সময় নরেন্দ্রনাথের মুখে সর্বদা একটি বাউলের গান শুনিতে পাওয়া যাইত :

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেমরত্নধন॥
খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজলে পাবি, হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ॥
ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙায়, ডিঙে চালায় আবার সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

অর্থাৎ তাঁহার নিজের মনের ভাবটা কিয়ৎপরিমাণে এই গানটি দিয়া প্রকাশ করিতেন।

বরাহনগরের মঠে এই ব্যাপারটির দিনকতক পরে, নরেন্দ্রনাথ নিজের রামতনু বসুর গলির বাটিতে আসিলেন এবং বর্তমান লেখককে বলিলেন, “একখানা বাইবেল দে ত!” বাইবেলখানি লইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। পরে বাইবেলখানি খুলিয়া একটি স্থানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বর্তমান লেখককে পড়িতে বলিলেন। তাহাতেও ঐরূপ আশাপূর্ণ ও অভয় বাণী রহিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। তিনি স্থির করিলেন ও বলিতে লাগিলেন, “যদি জগৎ লয় হইয়া যায়, তা'হলেও আমি একা সন্ন্যাসী হইয়া থাকিব।” জ্ঞাতিদিগের সহিত বিবাদ হওয়াতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নিজের মাতামহের বাটি, ৭নং রামতনু বসুর গলির বাটিতে তাঁর আত্মীয়েরা আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, শশী মহারাজের বাইবেল বা গীতা খুলিয়া কোন কোন স্থান পড়িয়া নিজের মনোভাবের সমর্থন লওয়া অভ্যাসটি অনেকদিন পর্যন্ত ছিল। ইহাকে 'Bibliography' বলে; এই অভ্যাসটি তিনি সর্বদা করিতেন।

১৮৮৮ বা ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে শরৎ মহারাজ বরাহনগরের মঠে কয়েক

বৎসর কঠোর জপধ্যান করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই হৃদয়ে শান্তি পাইতেছিলেন না। বড় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরলাভের জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা অতি তীব্র হইয়া উঠিল। তিনি তীর্থ পর্যটনে চলিয়া গেলেন। কোন্ কোন্ স্থানে তিনি গিয়াছিলেন তাহা সমুদয় স্মরণ নাই। তবে দু'চারিটি ঘটনা যাহা তিনি বলিয়াছেন তাহাই এইস্থানে বিবৃত করিলাম।

শরৎ মহারাজের এক সাধুর গল্পবলা—হরিদ্বার হৃষীকেশে অবস্থানকালে তাঁহার সহিত একটি বৃদ্ধ সাধুর দেখা হইয়াছিল। সাধুটি মহা আনন্দময় পুরুষ এবং মহাত্যাগী ছিলেন। শরৎ মহারাজ যুবা, সাধুটির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। সাধু প্রাতে স্নান করিয়া নিজের আসনের উপর বসিয়া একখানি গীতা খুলিয়া খানিকক্ষণ দেখিতেন, মনে মনে ঈশ্বরচিন্তা করিতেন, তাহাতে তাঁহার মনে বেশ শান্তির ভাব উদ্রেক হইত। শেষে পাশ থেকে একটি ছোট লাঠি (গদ্‌কা) লইয়া মাথায় তুলিয়া প্রণাম করিয়া তবে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতেন। শরৎ মহারাজ সাধুটির নিকট বিনীতভাবে গীতার ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। সাধুটি সরল, স্পষ্টভাবে বলিলেন, তিনি মূর্খ, লেখাপড়া কিছুই জানেন না। গীতার সোজাদিক বা উল্টোদিক কিছুই জানেন না বা বোঝেন না; তবে প্রথা অনুযায়ী গীতাটি লইয়া একবার দেখিয়া যান। তখন তিনি আত্মপরিচয় দিতে লাগিলেন; তিনি বলিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করেন, স্ত্রী পুত্র ছিল কিন্তু ভরণপোষণের কোন উপায় না পাইয়া ডাকাতি করিতে সুরু করিলেন। গায়ে খুব জোর ছিল, লোকের কাড়িয়া-কুড়িয়া লইতেন। এইরূপে কিছুদিন যায়। একদিন রাত্রিতে ডাকাতি করিতে বাহির হইলেন, কিন্তু রাস্তায় কোনও লোক দেখিতে পাইলেন না। স্ত্রী পুত্র ক্ষুধার্ত, কিছু লইয়া গেলে তবে তাহাদের আহার হইবে, এইজন্য তিনি বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে মনে করিলেন যে, দূরে একটা শিবের মন্দির আছে, আজ সেখানে গেলে পূজার তৈজসাদি বা অপর কোন দ্রব্য-

পাইতে পারেন। এই আশায় তিনি শিবের মন্দিরে গেলেন ও দরজাটি ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিলেন। অন্ধকার মেঝেতে হাত বুলাইয়া দেখিলেন যে, কিছুই নাই। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া হাতের মোটা লাঠিটি লইয়া শিবকে খুব প্রহার করিতে লাগিলেন। দু'তিন মিনিট পরে হঠাৎ তাঁহার মনে উদয় হইল তিনি করিতেছেন কি! হিন্দুর ছেলে, তাহাতে আবার ব্রাহ্মণ—শিবের জিনিস অপরহণ করতে এসেছেন, আর শিবকেই লাঠি লইয়া মারিতেছেন—কি জন্য তিনি এইসব কাজ করিতেছেন? কার জন্যই বা তিনি এইসব কাজ করিতেছেন? এই সব চিন্তায় তাঁহার মন একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যের ভাব উদয় হইল। তখন তিনি সেই লাঠিটি হাতে লইয়া সিধা চলিয়া যাইলেন এবং একস্থানে গুরু পাইয়া তাঁহার কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা লইলেন। তদবধি তিনি তাঁর বাড়িঘরের কোন বিষয় আর খবর রাখেন না এবং মহানন্দে আছেন। সেই লাঠিকে দেখাইয়া শরৎ মহারাজকে বলিতেন, "এইটিই আমার গুরু এইটিই আমায় পথ দেখাইয়াছে ; এইজন্য লাঠিটাকে আমি নিত্য প্রণাম করি।"

শরৎ মহারাজের হিমালয় পর্যটন ও এক সাধুর কাছে কাপ্.য়া খাওয়া—এই সময় শরৎ মহারাজের বৈরাগ্যের ভাব অতি প্রবল হইয়া উঠিল। তখন তিনি হিমালয় পর্যটন করিতেছিলেন। চলিত পথ ছাড়িয়া দিয়া যে দিকে চক্ষু যায় সেই দিকে চলিতে থাকেন—কিছু হুঁস নাই। প্রথম দিন ও রাত্রি একরূপ পাহাড় ও জঙ্গলে কাটাইলেন ; লোকালয় নাই, আহার হইল না। দ্বিতীয় দিনও এইরূপ চলিল। তৃতীয় দিনও এই ভাবে চলিলেন। তখন দেহটা ত্যাগ করিবেন এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। জঙ্গলে ঘুরিতে ঘুরিতে খুব একটা উচ্চ পাহাড়ে উঠিলেন। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যে, তথায় একখানি কুটির ও একটি বৃদ্ধ সাধু বসিয়া আছেন। সাধুটি অতি যত্ন করিয়া শরৎ মহারাজকে অভ্যর্থনা করিলেন ও তিনি আহার ও বিশ্রাম করিতে বলিলেন। বৃদ্ধ সাধুটি বলিলেন যে, সন্নিকটে কোন লোকালয় নাই, তিনি একাকী

সেইস্থানে থাকেন ; নিকটে একটি ঝরণা আছে, সেইখানে থেকে জল আনেন। নিজের আহারের নিমিত্ত মাটি উসকাইয়া ফাপ্‌রা নামক এক বীজ বপন করেন, তাই পিষিয়া রুটি ও বিচুটি শাক রন্ধন করিয়া তরকারি হয়। শরৎ মহারাজ তিন দিনের ক্ষুধার্ত, বিচুটি শাক আর ফপ্‌রার ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ সাধুটি তাড়াতাড়ি ফাপ্‌রার আটা মাখিয়া খানকয়েক রুটি তৈয়ারি করিয়া বলিলেন, "ফাপ্‌রা অতি তিত জিনিস, খাইবার সময় জলপান করিবেন না, তাহা হইলে আর খাইতে পারিবেন না।" শরৎ মহারাজ ব্যাপারটির গুরুত্ব মনে করেন নাই। তিনি রুটি দিয়া বিচুটি শাক দিয়া দু'এক গ্রাস খাইয়া এক ঢোক জল খাইলেন। যেমন জল খাওয়া অমনি যেন তেত্রিশকোটি নাড়ি পেট থেকে উঠে পড়ল। এ যেন কাঁচা কুইনাইনের বড়ি ; আর খাইতে পারিলেন না। সাধুটি বড়ই দুঃখিত হইয়া অনেক অনুনয় করিতে লাগিলেন। পরের দিন তিনি সেখান থেকে অন্যত্র চলিয়া যান।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ কথিত শরৎ মহারাজের ত্যাগ—অনাহার ও যা-তা খাইয়া পর্যটন করায় শরৎ মহারাজের এই সময় রক্তামাশয় হইয়া যায়। একদিন রাত্রিতে অনবরত রক্তবাহ্যে হইতে লাগিল, যন্ত্রণায় অস্থির। কিন্তু প্রভাত হইলেই তিনি মন স্থির করিয়া গীতা পাঠ করিতে লাগিলেন। শরীরের কষ্টকে তিনি কষ্ট বলিয়া মনে করিলেন না। ক্রমশঃ অসুখ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে পাহাড় হইতে নামিয়া আসাই তাঁহার আবশ্যক হইল। তখন তিনি অতি দুর্বল হইয়া গিয়াছেন, পা টলিতেছিল, শরীর অবসন্ন। হাতের লাঠিটায় ভর করিয়া একটু একটু নামিতেছেন ও একবার একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছেন। এইরূপে নামিতেছেন, এমন সময় একটি বৃদ্ধ সাধু পাহাড়ে উঠিতেছিলেন। তাঁহার হস্তে লাঠি ছিল না, উঠিতে বড় কষ্ট হইতেছিল। সাধুটি বারে বারে শরৎ মহারাজের লাঠিটির দিকে তাকাইতেছিলেন। শরৎ মহারাজ বুঝিতে পারিলেন

সাধুটির লাঠিটির প্রতি বড়ই ইচ্ছা। তিনি অম্লানবদনে তৎক্ষণাৎ নিজের হাতের লাঠিটি বৃদ্ধ সাধুটিকে দিয়া দিলেন। বৃদ্ধ সাধু লাঠিটি পাইয়া বড়ই খুশী হইলেন। পরে শরৎ মহারাজ অতি কষ্টে ধীরে ধীরে উপর থেকে নামিয়া আসিলেন। ইহাতে শরৎ মহারাজের বড়ই আনন্দ হইল। ১৮৮৯ বা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বর্ষার প্রথমে শরৎ মহারাজ পুনরায় বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। গিরিশবাবু শরৎ মহারাজের এই লাঠি দেওয়া উপাখ্যানটি অনেকের কাছে গল্প করিয়া বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। গিরিশবাবু আনন্দসহকারে বলিতেন, "গ্যাখ্, এই শরৎ মহারাজের কি ত্যাগের ভাব দেখলি? সে নিজে মরবে, তখনও কিন্তু নিজের একমাত্র বাঁচবার সম্বল হাতের লাঠিটাও অপরের কষ্ট দেখে দিয়ে দিলে।"

রাখাল মহারাজের তীর্থ পর্যটন কালীন কিছু ঘটনাবলীর বর্ণনা—বরাহনগরের মঠে কিছুদিন থাকিয়া রাখাল মহারাজ তীর্থ পর্যটনে ও ইচ্ছামত নির্বিঘ্নে সাধনভজন করিবার নিমিত্ত বাংলাদেশ হইতে বহির্গত হইলেন। এই সময়কার সমস্ত বিষয় বিশেষ অবগত নহি, কারণ যে যাহার ইচ্ছামত একাকী, বা কখন দুই তিনজনে মিলিয়া আপন অভীষ্টস্থানে পর্যটন করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা সামান্য শুনিয়াছিলাম, তাহাই এইস্থানে বিবৃত করিতেছি। বহুবার বহুজায়গায় পর্যটন করায় ঘটনাগুলি বিপর্যস্ত হইবার সম্ভাবনা, এইজন্য কিঞ্চিৎ আভাষমাত্র এইস্থানে দেওয়া হইল।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, রাখাল মহারাজ কটক জেলায় বায়েনকোঠার ও ৺পুরীধামে গিয়াছিলেন। তখন জাহাজ চাঁদবালী পর্যন্ত যাইত। তাহার পর গরুর গাড়ি বা পদব্রজে যাত্রীকে চলিতে হইত। যাত্রাকালে এমন একটি সামান্য ঘটনা হইয়াছিল যে, তাহাতেই রাখাল মহারাজের ত্যাগবৈরাগ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গরুর গাড়ি করিয়া যখন যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে একটি লোক ছিল। কিছুদূর গিয়া দেখিলেন যে, পথের ধারে একখানি দশ টাকার

নোট পড়িয়া আছে। রাখাল মহারাজ সদাসর্বদাই জপ করিতেন, জপ করিতে করিতে চলিতেছিলেন, তিনি এ বিষয়ে কোনই লক্ষ্য রাখিলেন না। সঙ্গীটি গিয়া নোটখানি তুলিয়া লইল। রাখাল মহারাজ ঢের বুঝাইলেন যে, টাকাকড়িতে হাত দেওয়া ঠিক নয়, যাহার জিনিস সে লইবে, না হয় অপরে লইবে, কিন্তু সাধুসন্ন্যাসীর অর্থে মন দেওয়া ঠিক নয়। সঙ্গীটি সে সব কথায় মন না দিয়া নোটখানি তুলিয়া লইলেন এবং নানাপ্রকার তর্কযুক্তি দেখাইতে লাগিলেন যে, "নিজেদের কার্যে যদি না লাগান, কিন্তু তাহা দ্বারা গরীবদুঃখীকে সাহায্য করিলে উপকার হইবে।" রাখাল মহারাজ তাহাতে বিশেষ বিরক্ত হইলেন এবং সে বিষয়ে কোন কথাই আর কহিলেন না। তদবধি সেই লোকটির উপর তাঁহার আর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। কিছুদিন পরে সে বিবাহ করিয়া ঘোর সংসারী হইল।

রাখাল মহারাজের কোঠারে গমন—বলরামবাবুর পিতা রাধামোহন বসুর মৃত্যুর পর বলরামবাবু পিতার শ্রাদ্ধ করিবার জন্য বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী লইয়া কোঠারে তাঁহাদের জমিদারিতে যাইতে মনস্থ করিলেন। তখন উড়িষ্যা দেশেতে 'কালু', 'সি গল' ও 'বেসিন, নামক তিনখানি জাহাজ যাইত। কিন্তু 'স্যার জন্ লরেন্স' নামক একখানি বড়জাহাজ যাইবে বলিয়া বলরামবাবু সেই জাহাজে যাইতে মনস্থ করিলেন। তুলসীরাম ঘোষ ও রাখাল মহারাজ তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। জাহাজখানি ডায়মণ্ডহারবারে গিয়া ঝড়ের মুখে পড়িল। জাহাজে মালপত্র রাখিয়া, ভাগ্যক্রমে তিনজনে ডায়মণ্ডহারবার দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু সেই রাত্রেই ঝড়ের মুখে যাওয়ায় 'স্যার জন্ লরেন্স' নামক জাহাজটি ডুবিয়া যায়, ফলে প্রায় ৭৫০ জন লোক মারা যায়। যদিও দ্রব্যাদি সমস্ত নষ্ট হইল, কিন্তু ব্যক্তিত্রয়ের প্রাণ বাঁচিয়াছিল। তাহার পর তাঁহারা 'কালু' জাহাজে করিয়া যান।

উড়িষ্যা দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাখাল মহারাজ ৺বৃন্দাবন

ধামে চলিয়া যান। এই সময় তিনি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি কখন বৃন্দাবনে কখন বা কুসুমসরোবর, নন্দগ্রাম ও বর্ষাণা প্রভৃতি স্থানে থাকিতেন এবং নিবিষ্ট হইয়া একমনে জপধ্যান করিতেন। বহির্জগতের সহিত তাঁহার বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। বৃন্দাবন হইতে তিনি রাজপুতানা, আবুপাহাড় প্রভৃতি নানাস্থান দর্শন করিলেন। রাখাল মহারাজ রাজপুতানায় অবস্থানকালে মীরাবাঈয়ের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর শ্রীনাথজী দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বিগ্রহের ভোগরাগ সম্বন্ধে তিনি যা গল্প করিয়াছিলেন তাহাতে বোঝা যাইল যে, উত্তর ভারতবর্ষে এ রকম ভোগরাগ কোন বিগ্রহের হয় না। পোরবন্দরের কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। স্বভাবতঃ ধীর ও জপপরায়ণ বলিয়া তাঁহার কাছ হইতে বড় বিশেষ বর্ণনার বিষয় শুনা যাইত না। তিনি কিছুদিন বোম্বাই সহরে ভক্ত কালীপদ ঘোষের কাছে ছিলেন; লাজুক ও অল্পভাষী বলিয়া কাহারও সাথে বড় মিশিতেন না। রাজপুতানা ও আবুপাহাড়ে থাকিবার সময় তাঁহার প্রথম পাথুরি রোগ দেখা যায়। যদিও তাহা প্রথমে স্থগিত হইয়াছিল, কিন্তু বেলুড় মঠেও তাহা মাঝে মাঝে দেখা দিত, সময় সময় যন্ত্রণায় বিশেষ কষ্ট পাইতেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বাহির হইয়া যান আর একেবারে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শীতকালে আলমবাজারের মঠে ফিরিয়া আসেন।

যোগেন মহারাজের বৃন্দাবনে ভ্রমণ—যোগেন মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে, গোলাপ মা ও যোগীন মাকে লইয়া কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। তাহার পর আবার বাংলাদেশে ফিরিয়া আসেন। পুনরায় বৈদ্যনাথধাম প্রভৃতি দর্শন করিয়া প্রয়াগধামে যান এবং ডাঃ শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসুর বাড়িতে তিনি বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। নিরঞ্জন মহারাজ, কালী বেদান্তী ও নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই গিয়া এলাহাবাদে পৌঁছিলেন, এবং যোগেন মহারাজ অপর লোকের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। আর একবার তিনি কাশীতে গিয়া কিছুদিন ছিলেন, এমন সময় কলের জল

লইয়া মহা বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কাশীর অনেক লোক বিশেষতঃ সাধুগণ মারপিট দাঙ্গা করিতে আরম্ভ করিল। যোগেন মহারাজ তথায় আর থাকা যুক্তি যুক্ত বিবেচনা না করিয়া যেদিন দাঙ্গা সুরু হইল, তিনি সেই দিনই বিকেল বেলা কলিকাতায় রওয়া হইলেন।

বরাহনগর মঠ হইতে শিবানন্দ স্বামী, কালী বেদান্তী ও তুলসী মহারাজ ইঁহারা তীর্থ পর্যটনে সকলে বাহির হইলেন। কখন বা দল বাঁধিয়া, কখন বা একা একা তীর্থ পর্যটন করিয়া বেড়াইতেন। ইঁহারা প্রত্যেকে নানা তীর্থ পর্যটন করিয়া অবশেষে আমলবাজার মঠে আসিয়া উপস্থিত হন।

নরেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বসু—১৮৯০ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মের শেষ বা বর্ষার প্রারম্ভে নরেন্দ্রনাথ তীর্থ পর্যটনে যাইলেন। গঙ্গাধর মহারাজ আগ্রহ করিয়া সেবা করিবার জন্য সঙ্গে চলিলেন। হরমোহন মিত্র ও বসুমতীর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্টেশনে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন। সেদিন রবিবার, সকালের ট্রেনে উভয়ে পশ্চিমে যাত্রা করিলেন। দেওঘরে দু'একদিন ছিলেন, তথায় সুবিখ্যাত রাজনারায়ণ বসুর সহিত নরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় অতি সরল ও উচ্চমনের লোক ছিলেন। বৃদ্ধের সহিত ইংরাজীতে কথা কওয়া অসঙ্গত বিবেচনা করায় নরেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক বাংলা ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন এবং একটিও ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিলেন না। বসু মহাশয়ের সহিত নরেন্দ্রনাথের 'সেকাল ও একালের কথা', ব্রাহ্ম-সমাজের কথা ইত্যাদি নানারূপ আলোচনা হইতে লাগিল। কথা-প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ, বসু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার শরীর এত ভগ্ন হইল কি করিয়া?" বসু মহাশয় সরল অকপটভাবে বলিলেন, "মদে মদে; নূতন ইংরাজী চাল দেশে ঢুকিলে তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ধারণা ঢুকিল যে, মদ না খেলে পড়াশুনা হইবে না, দেশের কল্যাণকর কাজ হইবে না তাই সব মদ খেতে আরম্ভ করেছিলুম। বাঙ্গালীর পেটে সইবে কেন? তাই শরীর ভেঙ্গে গেল।" কথাবার্তায় বৃদ্ধ রাজনারায়ণ

বসু মহাশয়ের ধারণা হইল যে, যুবক নরেন্দ্রনাথ ইংরাজী জানেন না, সেইজন্য তিনি যখন ইংরাজী বলিয়া ফেলিতেছিলেন, তখন আবার তাহার তর্জমা করিয়া নরেন্দ্রনাথকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি ইংরাজী Plus কথাটি ব্যবহার করিয়া অঙ্গুলির দ্বারা তাহা নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া দিলেন। বৃদ্ধ বসুর ব্যবহার দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের মনে খুব হাসি আসিল। তিনি গম্ভীরভাবে তাহা চাপিয়া রাখিয়া পাছে গঙ্গাধর মহারাজ হাসিয়া ফেলেন সেইজন্য তাহাকে ইসারা করিয়া হাসিতে বারণ করিলেন। কথা শেষ হইলে উভয়ে উঠিয়া আসিয়া পথে খুব হাসিতে লাগিলেন। আত্মসংযম ও আত্মগোপন শ্রেষ্ঠ লোকদিগের যে বিশেষ একটি গুণ হইয়া থাকে ইহাই তাহার একটি উদাহরণ।

গোবিন্দ ডাক্তারের বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ—নরেন্দ্রনাথ, শিবানন্দ স্বামী ও কালী বেদান্তী এলাহাবাদে গোবিন্দ ডাক্তারের বাটিতে কিছুদিন ছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শিবানন্দ স্বামী যখন প্রয়াগে যান তখন গোবিন্দবাবু শিবানন্দ স্বামীর সহিত দেখা করিতে আসিয়া পূর্বস্মৃতির অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ, শিবানন্দ স্বামী ও কালী বেদান্তী অল্পদিন তাঁহার বাটিতে ছিলেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ হইয়াছিল। গোবিন্দবাবু এরূপ উচ্চ অবস্থার সাধু ইহার পূর্বে কখন দেখেন নাই। একদিন তাঁহারা সকলে মিলিয়া সিন্দুক নামক জনৈক সাধুকে ত্রিবেণীতে দর্শন করিতে যান। একটি বড় প্রকাণ্ড সিন্দুকের উপর সাধুটি বসিয়া থাকিতেন এবং তাহার উপরই নিদ্রা যাইতেন। ত্রিবেণী ও প্রয়াগে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিত। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। গোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করায় নরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন "লোকটা যথাসর্বস্ব সিন্দুকের ভিতর রাখিয়া তাহার উপর বসিয়া থাকে। উহার ধর্মকর্ম, ঈশ্বর, তপস্যা সমস্তই সিন্দুকের ভিতর রাখিয়াছে; সেইজন্য মনটা উচ্চদিকে যেতে পাচ্ছে না। এইটাই হচ্ছে তার মুদিখানার

দোকান।" এই সময় প্রয়াগধামে গুরুজী অমূল্য নামক জনৈক বাঙ্গালী সাধু থাকিতেন। তিনি মেডিকেল কলেজে কয়েক বৎসর পড়িয়াছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথের সহিত পূর্বপরিচয় ছিল। নরেন্দ্রনাথ গৃহত্যাগ করায় অমূল্য সন্ন্যাসী হইয়া প্রয়াগে বাস করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি থাকায় তিনি গোবিন্দ ডাক্তারের বাটিতে সাক্ষাৎ করিতে আসেন ও একত্রে বসিয়া আহার করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের গুরুজী অমূল্যর সাথে আহার—একদিন রাত্রে সকলে একত্রে আহার করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ একটি লঙ্কা চাহিয়া লইলেন, গুরুজী অমূল্য জেদ দেখাইবার জন্য ছটি কাঁচা লঙ্কা লইয়া খাইলেন। নরেন্দ্রনাথ কৌতুক করিয়া তিনটি লঙ্কা খাইলেন কারণ তিনি হটিবার ছেলে নন। অমূল্যকে হারাইবার জন্য তিনি পরে অধিক সংখ্যায় লঙ্কা খাইতে লাগিলেন; অবশেষে অমূল্য পরাস্ত হইল এবং সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিল। এই সামান্য কাজটির ভিতরও নরেন্দ্রনাথ এমন ভালবাসা, সরলভাব ও নিজের সর্বোপরি প্রাধান্য দেখাইলেন যে, সকলেই তাহা দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলেন। কথায় যত না হউক, মুখ-ভঙ্গি ও দৃষ্টিতে তাঁহার মনোভাব সমস্ত প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার চক্ষু হইতে যেন একটা ভাবরাশি বহির্গত হইয়া বলিতে লাগিল যে, আমি অজেয়। সামান্য বিষয়েতেও আমার সমকক্ষ কেহ থাকিবে না বা আমায় কেহ পরাজিত করিতে পারিবে না। কেবল ভালবাসা ও কৌতুক দিয়া আমি সকলকে আপনার ভিতর আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছি।

নরেন্দ্রনাথের প্রশংসায় কালী বেদান্তী—একদিন কালী বেদান্তী গোবিন্দবাবুকে বলিলেন, "দেখুন ডাক্তারবাবু, তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) বলিতেন নরেনকে ভোজন করাইলে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করানর ফল হয়।" নরেন্দ্রনাথ তাহা শুনিয়া কৌতুক করিয়া কালী বেদান্তীকে বলিলেন, "কিরে শ্যালা, দোকান খুলচিস নাকি? তোর বুঝি কিছু রেস্ত করতে হবে", এই কথা বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। কালী বেদান্তী

যথার্থ সরলভাবে আন্তরিক ভালবাসার সহিত প্রশংসা করিয়াছিলেন কারণ তাঁহার উচ্চ অবস্থা ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে কিরূপ স্নেহ করিতেন তাহাই তিনি সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ আত্মপ্রশংসা বা আত্মপরিচয় দিতে একেবারেই ভালবাসিতেন না, সেইজন্যই কালী বেদান্তীকে মৃদু ভাবে ভং´সনা করিয়া কথা চাপিয়া যাইতে বলিলেন। এই উপাখ্যানটিতে উভয়েরই মহত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছিল।

শ্রীশচন্দ্র বসু ও নরেন্দ্রনাথ—এই সময় শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু (যিনি গাজীপুরে মুন্সেফ ছিলেন ও পরে এলাহাবাদে District Judge হইয়াছিলেন) একদিন গোবিন্দবাবুর বাড়িতে নরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বাবু শ্রীশচন্দ্র বসুর বাড়ি এলাহাবাদে এবং বর্তমান পাণিনি অফিসই তাঁহার বাড়ি। তিনি এই সময় থিয়সফিস্টদের সহিত মিশিতেন এবং থিয়সফিস্ট ভাবে সাধন-ভজন করিতেন। নরেন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের সহিত এমন সুযুক্তি দিয়া তর্ক করিয়াছিলেন যে, শ্রীশচন্দ্রের নিজের সমস্ত মতই উল্টাইয়া যায়। ফিরিয়া যাইবার সময় শ্রীশচন্দ্র বলিয়া যাইলেন যে, "আমার এত বৎসরের সঞ্চিত ভাবসকল আজ সব উড়িয়া গেল।" নরেন্দ্রনাথ তাহা শুনিয়া বলিলেন, "তোমার দশ বৎসরের ভাব থাকল বা উড়িয়া গেল, তাহাতে কার কি এসে যায়?"

শ্রীশচন্দ্র আর একদিন গেরুয়া পরিয়া সকলের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন "গৃহীর আশ্রমে থেকে সন্ন্যাসীর ভেক্ করিও না, ইহাতে তোমার অধিকার নাই, অনিষ্ট হতে পারে।" যাহা হউক সেইদিন থেকে শ্রীশচন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন এবং নিত্য প্রাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবিখানি পূজা করিতেন। বর্তমান লেখক যখন গাজীপুরে গিয়াছিলেন তখন শ্রীশচন্দ্রের বাটিতে ছিলেন এবং তাঁহাকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি নিত্য পূজা করিতে দেখিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত বলিয়া অনেকেই তাঁহার গাজীপুরের বাটিতে থাকিতেন। যদিও শ্রীশচন্দ্র ভবিষ্যতে আবার থিয়সফিস্ট হইয়াছিলেন এবং কার্যতঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্বপরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আবার সেই পূর্বভাব জাগিয়া উঠিত এবং অতি সাদরে বাক্যালাপ করিতেন।

ঝুসিতে নরেন্দ্রনাথ, শিবানন্দ স্বামী ও গোবিন্দবাবু—এইস্থানে আর একটি ঘটনা বিবৃত হইল। নরেন্দ্রনাথ ও শিবানন্দ স্বামী কিছুদিন প্রয়াগের অপর পার্শ্বে ঝুসিতে বাস করিতেছিলেন। ছত্র থেকে মাধুকরী করিয়া ডালরুটি আনিতেন এবং তাহাই আহার করিয়া গুফার ভিতর থাকিতেন। গোবিন্দবাবুও মাঝে মাঝে দেখা করিয়া আনাজ-তরকারি দিয়া আসিতেন তাহাই রন্ধন করিয়া তরকারি হইত, তবে সর্বদা নয়। গোবিন্দবাবু আর একটি কথা বর্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন, "একদিন আমি ঝুসিতে যাই। নরেন্দ্রনাথ ও শিবানন্দ স্বামীর সহিত কথা কহিয়া সমস্ত দিন অতি আনন্দে কাটে, বৈকাল হইলে তিনজনে মিলিয়া এলাহাবাদে ফিরিলাম। আমার পায়ে জুতা, গায়ে ভাল কাপড়-জামা ইত্যাদি ছিল; মোটকথা আমি, সে দিন বেশ সাজাগোজা বাবুর মত ছিলুম। 'নরেন্দ্রনাথ খালি-পা, শুধু পায়ে হাঁটিয়া হাঁটিয়া গোড়ালি ফাটিয়া গিয়াছে, কৌপীন ও একখানি বহির্বাস এবং গায়ে একখানা মোটা ঘোড়ার কম্বল। শিবানন্দ স্বামীরও পরিধেয় সেইরূপ, আমি খানিকটা চলিয়া মনে বড় কষ্ট পাইতে লাগিলাম, পায়ের জুতা খুলিয়া হাতে লইলাম। মনে মনে কহিতে লাগিলাম আমি কি অন্যায় করিয়াছি, এই দুই মহাপুরুষ খালি পায়ে ঘোড়ার কম্বল গায়ে দিয়া যাইতেছেন, আর আমি অতি নগণ্যব্যক্তি ইঁহাদের সহিত জুতা পায়ে দিয়া আরাম করিয়া যাইতেছি। আমি যেই পায়ের জুতা খুলিয়া ফেলিয়া হাতে লইয়াছি, নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি অমনি আমার উপর পড়িল। তিনি স্নেহপূর্ণ মধুর স্বরে আমায় বলিলেন, 'জুতা খুলিলে কেন? পায়ে দাও না।' কথায় কিছু না হউক, কিন্তু তাহার স্বর ও দৃষ্টি থেকে আর একটি

ভাব প্রকাশ পাইল। তিনি যেন ভিতর থেকে বলিতে লাগিলেন, 'গোবিন্দ, তুমি সামান্য সুখের প্রত্যাশী, কেন তুমি তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছ? তুমি সে উচ্চ জিনিস পাইবার জন্য সুখ, মান, ধাম সকলি তো বিসর্জন কর নাই। তোমার পক্ষে ইহা সাময়িক ভাবোচ্ছাস, একঘণ্টা পরে এ ভাব থাকিবে না। আবার যা তাই হইবে। আর আমরা একটা মহা উচ্চবস্তু লাভের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছি। ভিক্ষান্নে দেহধারণ করিতেছি'।" যাহা হউক গোবিন্দবাবু যখনই এই কথাটি উল্লেখ করিতেন তখনই তাঁহার মুখভাবের পরিবর্তন হইয়া যাইত। ঈশ্বরে বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি যেন তাঁহার তখন জাগিয়া উঠিত এবং অল্পক্ষণ কথা কহিয়া নিস্তব্ধ হইয়া যাইতেন। বর্তমান লেখক তাঁহার এরূপ ভাবাবেশ হইতে কয়েকবার লক্ষ্য করিয়াছেন। গোবিন্দ-বাবু উচ্ছাসের সহিত বলিতেন, "এরূপ ত্যাগ, এরূপ বৈরাগ্য ও এরূপ জ্বলন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস কখন দেখি নাই।"

খোকা মহারাজ—খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) বৃন্দাবনে গিয়া কিছুদিন ছিলেন। এই সময় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। কিছুকাল বৃন্দাবন অঞ্চলে বাস করিয়া তিনি বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

বরাহনগর মঠে লাটুমহারাজের বাংলা ভাষায় কথা বলা—১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে গরমকালে বৈকাল বেলায় অনেকেই বড় ঘরটিতে বসিয়া আছেন, নানাবিষয় কথাবার্তা হইতেছিল। প্রসঙ্গক্রমে সকলেই কোন ব্যক্তি-দ্বয়ের উপর কটাক্ষ করিয়া দোষারোপ করিতে লাগিলেন। ব্যাপারটা কৌতুকছলে হইতেছিল, এমন কোন গুরুতর বিষয় নয়। লাটু মহারাজ একটু উত্তেজিত হইয়া কথায় যোগ দিলেন। অবশেষে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আরে দেখ্ সোরোট্, আমি ত আগে বলিছি, শ্যালারা মাসতুতোয় মাসতুতোয় চোরে ভাই।" সকলেই ত পূর্বকথিত বিষয় ত্যাগ করিয়া "মাসতুতোয় মাসতুতোয় চোরে ভাই" লইয়া হাস্য-কৌতুক করিতে লাগিলেন। কারণ লাটু মহারাজ ছাপরা অঞ্চলের লোক, বাংলা বলিতে তাঁহার ভুল হইত।

কালীবেদান্তী ও গুপ্ত মহারাজের ঝুসিতে তপস্যা—এই সময়কার ঘটনাগুলি বিশেষ স্মরণ নাই এবং বিশিষ্ট কোন কথাবার্তা হইয়াছিল বলিয়া মনে নাই, তবে যৎকিঞ্চিৎ যাহা স্মরণ হইতেছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। কালী বেদান্তী ও গুপ্ত মহারাজ প্রয়াগের ঝুসিতে তপস্যা করিতে যান। কাশী, গাজীপুর প্রভৃতি স্থানেও ছিলেন। তবে ঝুসির একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য বলিয়া এখানে সন্নিবেশিত হইল। কালী বেদান্তী এই সময় ঝুসিতে কঠোর জপধ্যান করিতে লাগিলেন, বৈরাগ্যভাব অতি প্রবল, অতিশয় কঠোর করিতেন। একদিন সকাল থেকে ঝিমঝিমে বৃষ্টি হইতে লাগিল। অপর হিন্দুস্থানী সাধুরা ছত্রে গিয়া আহার্য লইয়া আসিলেন। কালী বেদান্তী ও গুপ্ত মহারাজকে যাইবার জন্য সকলে অনুরোধ করিল। কিন্তু বৈরাগ্যভাব খুব প্রবল হওয়ায় দেহরক্ষা অতি তুচ্ছ মনে করিতেন এইজন্য ছত্রে যাইতে তাঁহারা ইচ্ছা করিলেন না। কালী বেদান্তী গুপ্ত মহারাজকে বলিলেন, "আজ আর ভিক্ষায় গিয়া কাজ নাই, ধর গান ধর" এই বলিয়া ভজন গাহিতে লাগিলেন। হিন্দুস্থানী সাধুরা ফিরিয়া আসিয়া আহার করিয়া বাঙ্গালী সাধুদ্বয়কে পরিহাস করিল। বেলাও ক্রমে অধিক হইল। সেইদিন মৈত্র মহাশয় নামক জনৈক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত এলাহাবাদে পৌঁছিয়াছিলেন। ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র বসুর কাছে সন্ধান করিয়া জানিলেন যে, তথায় নিজেদের দুইজন আছেন। মৈত্র মহাশয় বলিলেন, "আরে, দেখিগে ভূত দুটো কোথায় আছে আর কি কচ্চে।" এই বলিয়া অনেক পরিমাণে দোকানের মেঠাই কিনিয়া লইয়া তিনি ঝুসিতে চলিলেন। পৌঁছিতে অবশ্য বেলা হইয়াছিল। বাঙ্গালী সাধুদ্বয় কোথায় আছেন অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে তিনি বাহির করিলেন। মৈত্র মহাশয় বলিলেন, "আরে, গোবিন্দ ডাক্তারের কাছে তোদের খবর পেয়ে খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়েছি; তোদের দেখতে বড় ইচ্ছা হয়েছিল তাই হুড়তেপুড়তে এসেছি, তা ভাই তোদের জন্যে এই কিছু এনেছি খা।" সঙ্গের জিনিস

দুই জনের চেয়ে ঢের বেশী ছিল। কালী বেদান্তী মহাতেজস্বী, তিনি তখনি নিজেদের মত কিছু রাখিয়া অপর অংশ বাকী সাধুদের দিয়া দিলেন। তখন হিন্দুস্থানী সাধুরা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল এবং বাঙ্গালী সাধুদের মধ্যে যে কিছু শক্তি আছে তাহা বুঝিতে পারিল।

"নারায়ণ হরি"—গুপ্ত মহারাজ আর একটি উপাখ্যান বলিতেন, কিন্তু কোন্ সময়কার তাহা বিশেষ স্মরণ নাই। তিনি বলিতেন, "স্বামীজী ও আমি এক সময়ে কাশীতে বাস করিতাম। একটা লেবু বাগানে পড়ে থাকতাম আর মাধুকরী করতাম। স্বামীজী কঠোর জপধ্যান সুরু করিলেন। একদিন স্বামীজী আগে আগে যাচ্ছেন ও আমি পেছনে। একজন গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছি। আমাদের উপর থেকে দেখিয়া, কিছু চাল লইয়া একটি ছোট মেয়ে আসিয়াছে। কিন্তু স্বামীজী তখন অন্যভাবে রহিয়াছেন, মনটা খুব উঁচুতে ও তন্ময় অবস্থা। স্বামীজী বাড়িতে প্রবেশ করিয়া 'নারায়ণ হরি' এই কথা বলিলেন। শব্দটা এত গম্ভীর ও সিংহ গর্জনের মত হয়েছিল যে, সমস্ত বাড়িটা কেঁপে উঠলো। যে ছোট মেয়েটা চাল হাতে করে এসেছিল সে ভয়ে দুড় দুড় করে ভিতরে পালিয়ে গেল। আমিও যেন কেঁপে উঠলুম। শব্দটা এমন শক্তিপূর্ণ, এমন শ্রুতিমধুর যে, কখন এমন রব শুনি নাই। পরক্ষণেই স্বামীজী যখন দেখিলেন যে, মেয়েটা আঁৎকে উঠেছে আর বাড়ির ভিতর সব চঞ্চল হয়ে উঠেছে তখন তিনি ভাব গোপন করিয়া সাধারণের ন্যায় হইলেন। তখন আবার মেয়েটি ধীরে ধীরে আসিয়া যা দেবার দিয়ে গেল। এই সময় স্বামীজী কি একটা ভাবে থাকিতেন তাহা বলা যায় না। সর্বদাই বিভোর, যেন মনটা দেহ ছাড়িয়া কোথায় উচ্চে চলিয়া গিয়াছে। মুখ এত গম্ভীর, নেত্রদ্বয় এত জ্যোতিপূর্ণ যে, মুখের দিকে চাওয়া যাইত না এবং সব সময়ে কাছে যাইতে সঙ্কোচ বোধ হইত। স্বামীজীর এরূপভাব কয়েক মাস ছিল।"

গিরিশচন্দ্রের শিশু সন্তান ও নরেন্দ্রনাথ—গিরিশবাবুর কনিষ্ঠ একটি

সন্তান হইয়াছিল। ছেলেটি সর্বদাই রুগ্ন এবং লিভার রোগে আক্রান্ত। ছেলেটি মাতৃহীন হওয়ায় গিরিশবাবু সর্বদাই ছেলেটিকে কোলে করিয়া রাখিতেন। ছেলেটির লিভার রোগ বাড়িতে লাগিল, অনেক চিকিৎসা করা হইল কিন্তু কিছুতেই আরোগ্য হইল না; শেষে মৃতপ্রায় হইল। বাহিরের বাড়ি হইতে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ভিতরে যাইবার যে ঘরটি সেই ঘরে কাপড় মুড়ি দিয়া ছেলেটিকে রাখা হইল। মারা গেছে, শীঘ্র নিয়ে যাবে, গিরিশবাবু বাহিরের ঘরটিতে নিতান্ত শোকার্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় নরেন্দ্রনাথ গিরিশবাবুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত শুনিয়া নরেন্দ্রনাথের প্রাণ বড় ব্যথিত হইল। তিনি শায়িত শিশুর ঘরটিতে চলিয়া গেলেন এবং দুদিককার দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ঠাকুরের কাছে প্রার্থনাই করুন বা শক্তি সঞ্চারই করুন তাহা কেহই বলিতে পারে না, তাহাই করিলেন; যাহা হউক; ছেলেটি পুনর্জীবিত হইল। খানিকক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথ গিরিশবাবুর কাছে ফিরিয়া আসিয়া ছেলেটিকে কিছু খেতে দিতে ও ঘরে তুলিয়া লইতে বলিলেন। ইহার একবৎসর পরে গিরিশবাবুর ছেলেটি যখন পুনরায় মুমূর্ষু হইল, তখন গিরিশবাবু শরৎ মহারাজকে ও নিরঞ্জন মহারাজকে ছেলেটিকে ছুঁইয়া দিতে বা শক্তি সঞ্চার করিতে অনেক অনুরোধ করিলেন। শরৎ মহারাজ নিতান্ত ভালমানুষ লোক, স্পষ্টই বলিলেন, "নরেন শক্তি সঞ্চার করিতে পারে, তা বলে কি সকলে পারে!" শোকার্ত গিরিশবাবু শরৎ মহারাজকে ও নিরঞ্জন মহারাজকে গাল দিতে লাগিলেন; কিন্তু সেইবার ছেলেটি মারা যায়।

নরেন্দ্রনাথের জন্য গিরিশচন্দ্রের কাতর ভাব—গিরিশবাবু পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন, "নরেন থাকলে আমার ছেলেটি মারা যাইত না।" কারণ এই সময়ে গিরিশবাবুর মানসিক কষ্ট অতিশয় হইয়াছিল। স্টার থিয়েটারের সহিত বিবাদ হওয়ায় তাঁহাকে পৃথক হইতে হইয়াছিল এবং তখন নানাপ্রকার মামলা-মকদ্দমা চলিতেছিল। এমন সময়ে সেই

ছেলেটি মারা গেল। গিরিশবাবু এই সময়ে 'নরেন নরেন' করিয়া বড় কাতর হইয়া পড়িতেন।

গঙ্গাধর মহারাজের তিব্বত হইতে আগমন—সম্ভবতঃ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর মহারাজ তিব্বত হইতে লাডাক দিয়া কাশ্মীরে পৌঁছিলেন। Colonel Nisbet, তখন কাশ্মীরে Resident, গঙ্গাধর মহারাজকে নজরবন্দী করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন, অর্থাৎ শ্রীনগর ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিবে না। নিসবেট জম্মু হইতে শ্রীনগরে যাইয়া গঙ্গাধর মহারাজের সহিত কথাবার্তা কহিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন; কিন্তু ভিতরে ভিতরে কলিকাতায় তাঁহার বিষয় সমস্ত খবর লইতে পুলিশকে আদেশ দিলেন। পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট যোগেন মিত্র সমস্ত খবর লইয়া লোকটি সাধু ও সৎলোক এই রিপোর্ট দিলে নিসবেট তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। গঙ্গাধর মহারাজ গ্রীষ্মকালে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি তিব্বতীয় পরিচ্ছদ সঙ্গে আনিয়াছিলেন—একটি রক্তবর্ণের পট্টি, বা পশমী নির্মিত তিব্বতীয় বক্কু অর্থাৎ লম্বা হাতা, হাঁটুর নীচে পর্যন্ত ঝুল, বুকের কাপড়টা দো-ভাঁজকরা একটি জামা। এই জামাটির কাপড় তিব্বত দেশীয় অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্রে নির্মিত, ভারতবর্ষে সচরাচর ইহা পাওয়া যায় না। একটি হাঁটু পর্যন্ত তুলোভরা জামা, তাহাতে স্ফটিকের এক ইঞ্চি লম্বা বোতাম, একটি তিব্বতীয় টুপি, একটি ভ্রাম্যমাণ জপযন্ত্র, আর পুঁথির একখানি পাতা। পুঁথির কালো পাতাখানি যেন কালো আবলুসকাঠের মতন ও মধ্যস্থানে স্বর্ণ-অক্ষরে তিব্বতী ভাষায় স্তব লেখা।

গঙ্গাধর মহারাজ প্রত্যাবর্তন করিলে তিব্বতের গল্প শুনিতে অনেকেই তাঁহার কাছে যাইতেন, এবং তাঁহার বাক্যবিন্যাসের ক্ষমতা থাকায় বর্ণিত স্থানের বিষয়গুলি অতি স্পষ্ট বলিয়া বোধ হইত। বর্তমান লেখক অবসর পাইলে গঙ্গাধর মহারাজের কাছে থাকিয়া ভ্রমণবৃত্তান্ত নিবিষ্টমনে শুনিতেন। তাঁহার ঘটনাবৃত্তান্ত অতি অদ্ভুত ও লোকরঞ্জক হইত।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর মহারাজ নরেন্দ্রনাথের সহিত পশ্চিমে যাইলেন। নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সেইজন্য অনেকেই গঙ্গাধর মহারাজকে কেশব ভারতী বলিতেন। নরেন্দ্রনাথ এইবার যে বহির্গত হইয়াছিলেন, একেবারে আমেরিকা ও ইংলণ্ড হইয়া বহুদিন পর তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

গাজীপুরে নরেন্দ্রনাথ—প্রয়াগে গোবিন্দবাবুর বাড়িতে দিন পনেরো থাকিয়া নরেন্দ্রনাথ পওহারী বাবাকে দর্শন করিবার জন্য গাজীপুরে যাইলেন এবং পরে বাবুরাম মহারাজ ও শিবানন্দ স্বামী তথায় গিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ কয়বার গাজীপুরে গিয়াছিলেন, বর্তমান লেখক তাহা বিশেষ পরিজ্ঞাত নন; সম্ভবতঃ দুই বা তিনবার গিয়াছিলেন। তখন গাজীপুরে শ্রীশচন্দ্র বসুর বাড়ি বা গগনচন্দ্র রায়ের বাড়িতে অনেকেই গিয়া থাকিতেন। শ্রীশচন্দ্র বসু তখন গাজীপুরে মুন্সেফ ছিলেন। গাজীপুর থেকে নরেন্দ্রনাথ গোবিন্দবাবুকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল, "গোবিন্দ, আমি গাজীপুরে আসিয়াছি ও পওহারী বাবার সাথে দেখা করিতে যাইব। আশা করি, তাঁহার নিকট কিছু পাইব।"

পওহারী বাবার আশ্রম—গাজীপুর থেকে গঙ্গার কিনারায় কিনারায় দুইখানি গ্রাম পার হইয়া যাইলে পওহারী বাবার আশ্রম। দূরত্ব বোধ হয় নয় বা দশ মাইল হইবে। গঙ্গার দিকে একটি বাঁধানঘাট ছিল, ঘাটের সন্নিকটে একটি গোড়াবাঁধান অশ্বত্থগাছ। উঠানটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুমুখে একখানি বড় চালাঘর এবং বাঁদিকে লম্বা পাঁচিলঘেরা একটি স্থান। স্থানটি অতি নির্জন ও সুরম্য এবং তথায় একটি পঞ্চবটি আছে। চালাঘরটিতে লম্বা একটি মেটে দাওয়া আছে এবং সুমুখে দুইটি প্রকোষ্ঠ ও দুইটি দরজার মাথায় মালার মত চৌকা চৌকা সাত রঙের নেকড়ার টুকরা ঝুলান ছিল। বাঁদিকের দরজাটির অভ্যন্তরে একটি উঠান। দরজাটি সব সময়ে বন্ধ থাকিত এবং কপাটের উপরিভাগে চিঠি ফেলবার মত সামান্য একটি কাটা গর্ত

ছিল। মধ্যের ঘরটির মাঝখানে একটি দরজা ছিল তাহা দিয়া বামপার্শ্বের উঠানটিতে যাওয়া যাইত। একটি ছোট গরাদবিহীন জানালা ছিল তাহা সর্বদাই বন্ধ থাকিত, সেই গবাক্ষের কপাট খুলিয়া পওহারী বাবার ভোজ্যদ্রব্য দেওয়া হইত। ভিতরের উঠানে একটি পাতকুয়া ছিল, কারণ ঘটি বা লোটাতে দড়ি বেঁধে জল তোলবার আওয়াজ পাওয়া যাইত। তা'ছাড়া উঠানে গুফা ছিল, পওহারী বাবা নাকি সেখানে বাস করিতেন। সাধারণ লোকের সহিত তিনি কখন কথা কহেন নাই এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন বড় একটা হইত না। যাহাকে তিনি কৃপা করিতেন তাহারই সহিত দরজার পূর্বোক্ত ছিদ্র দিয়া অল্পক্ষণ কথা কহিতেন।

নরেন্দ্রনাথ ও পওহারী বাবা—এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের সহিত পওহারী বাবার কি কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা কেহই বিশেষ জানেন না। তবে লণ্ডনে বক্তৃতাকালে পওহারী বাবার প্রসঙ্গ উঠায় তিনি বলিয়াছিলেন যে "পওহারী বাবার মতন এমন উচ্চস্তরের লোক অতি অল্পই পাওয়া যায়; তাঁহার উচ্চাবস্থার কথা অতি অল্প বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে।" কারণ পওহারী বাবা নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন যে, "এ সব যে ধর্ম-কর্ম কচ্চ, এ সবই বাজে জিনিস, আসল এখানে নেই। যেখানে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু এক হইয়াছে সেইটি জানিবে যে, ধর্মজীবনের প্রথম বনেদ। তারপর থেকে মনকে ধীরে ধীরে উপরে তুলিতে হইবে। অর্থাৎ বিপরীত ভাব যখন এক হইবে বা দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় পৌঁছিবে সেইটিই চরম অবস্থা মনে করিও না, সেইটি প্রথম সোপান।" নরেন্দ্রনাথ বক্তৃতাকালে এই কথাটি উল্লেখ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতেন। পওহারী বাবার সহিত কয়বার নরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং কি কথাবার্তা হইয়াছিল, বর্তমান লেখক তাহা জানেন না কারণ নরেন্দ্রনাথ এ বিষয় বড় কিছু কাহাকেও বলিতেন না বা কখন প্রকাশ করিতেন না।

গাজীপুরে নরেন্দ্রনাথের বেদ শুনান—বর্তমান লেখক যখন

গাজীপুরে শ্রীশচন্দ্রের বাটিতে ছিলেন তখন এই গল্পটি শুনিয়াছিলেন। গাজীপুরে এক সরকারি ঠাকুরদা ছিল, জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং গাঁজা, গুলি ও চরসে সিদ্ধপুরুষ। কোন কথা উত্থাপন করিবার আগেই ঠাকুরদা বলিত, "ও বিষয় আমি জানি" অর্থাৎ একটা গেঁজেল সবজান্তা লোক ছিল। একদিন শ্রীশচন্দ্রের বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ বসিয়া আছেন এমন সময় সেই ঠাকুরদা আসিয়া উপস্থিত হয়। সকলে ঠাকুরদাকে পাইয়া খুব স্ফুর্তি করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরদাকে বেদ পড়িয়া শুনাইতে লাগিল, "কস্মিংশ্চিৎ বনে ভাসুরকো নাম সিংহঃ প্রতিবসতি স্ম" এই হইল বেদের প্রথম স্তোত্র। বেদের নাম শুনিয়াই ত ঠাকুরদা আগে থেকে কান্না জুড়িয়া দিল। নরেন্দ্রনাথ তাহার পর ব্যাখ্যা সুরু করিলেন। আহা কি পদ-লালিত্য! কি শব্দ-বিন্যাস! কি ভাবপূর্ণ শ্লোক! নরেন্দ্রনাথ চেয়ারে বসিয়া আছেন আর ঠাকুরদা মেঝেতে উপু হইয়া বসিয়া বেদের ব্যাখ্যা শুনিয়া হাপুস্ নয়নে কাঁদছে আর রুদ্ধকণ্ঠে শোকব্যঞ্জক উহু উহু করিতেছে। এমন সময় শ্রীশচন্দ্র আসিয়া পড়িল। সে ত নরেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তুই যা এখন, এখান থেকে চলে যা, আমি ঠাকুরদাকে এখন বেদ শোনাচ্চি। কি বল ঠাকুরদা, বেদ বুঝতে পারছ ত?" শ্রীশচন্দ্র বাড়ির ভিতরে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল; আর গেঁজেল ঠাকুরদা সুমুখে বসে বেদের কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নরেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল বসু—একদিন নরেন্দ্রনাথ, বাবুরাম মহারাজ ও শিবানন্দ স্বামী পওহারী বাবাকে দর্শন করিতে যান। পওহারী বাবার মেটে দালানটি থেকে বেরিয়ে এসে সকলে সুমুখের অশ্বত্থগাছটির তলায় বসিলেন। কেশববাবুর সমাজের অমৃতলাল বসু সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। অমৃতলাল বসু কেশববাবুর সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইতেন ও তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। অনেক দিনের পর দেখা হওয়াতে প্রথম বেশ মিষ্টালাপ

হইল। অমৃতলাল বসুর ভিতর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধাভক্তি আছে জানিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ দুষ্টামি বুদ্ধি করিয়া বিপরীত ভাব ধারণ করিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা উঠিলে নরেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, "কি একটা লোক ছিল! পুতুল পূজা করত আর থেকে থেকে ভির্‌মি যেত, তাতে আবার ছিল কি?" বাবুরাম মহারাজ ও শিবানন্দ স্বামী নরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন এবং যেন তাঁহারা নরেন্দ্রনাথের দলের লোক বলিয়া ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া অমৃতলাল বসু একেবারে চটিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, "নরেন তোমার মুখে এমন কথা, পরমহংস মশাই তোমাকে কত সন্দেশ খাওয়াতেন, কত ভালবাসিতেন আর তুমি অবজ্ঞা করে কথা কইছ, এই তোমার কাজ! তুমি পরমহংস মশাইকে মান না! তাঁর মতন তখন কটা লোক হয়েছে?" তাঁহার ভিতর থেকে আরও কথা বাহির করিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ পরমহংস মশায়ের প্রতি আরও কটূক্তি করিতে লাগিলেন। অমৃতলাল বসু ক্রুদ্ধ হইয়া ততই পরমহংস মহাশয়ের সুখ্যাতি ও প্রগাঢ় ভক্তির সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। অবশেষে অমৃতলাল বসু রাগিয়া কহিতে লাগিলেন, "যাও, তোমার সঙ্গে তাঁর কথা কইতে নেই, তুমি পরমহংস মশায়ের এমন নিন্দা কর?" এই বলিয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন হাসিতে হাসিতে শিবানন্দ স্বামী ও বাবুরাম মহারজকে বলিলেন, "এই লোকটি আজ থেকে আমার উপর চিরকাল চটিয়া রহিল। লোকটির ভিতর পরমহংস মশায়ের প্রতি যে এ রকম শ্রদ্ধাভক্তি ছিল তা ত আমরা জানতুম না।" অমৃতলাল বসুর নরেন্দ্রনাথের প্রতি অবজ্ঞাভাব বহুদিন ছিল, কারণ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আহিরীটোলার সুরেন্দ্রনাথ বসু (স্বামী সুরেশ্বরানন্দ) স্বামী বিবেকানন্দের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণকালে অমৃতলাল বসু বলিয়াছিলেন, "কি হে সুরেন, গুরু কি আর খুঁজে পেলে না, শেষকালে একটা কায়েত ছোঁড়ার কাছে সন্ন্যাস নিলে!" সুরেন্দ্রনাথ তখনি

জবাব করিল, "আপনার কি আর সহরে গুরু জুটল না, শেষকালে একটা বস্তির চেলা হইলেন" অর্থাৎ কেশবচন্দ্রের চেলা হইলেন।

এই সময় শ্রীশচন্দ্র বসু পাণিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। কালী বেদান্তী তাঁহাকে এই কাজে প্রণোদিত করিয়াছিলেন।

গাজীপুরের District Judge ও নরেন্দ্রনাথ—জনৈক ইংরাজ তখন গজীপুরে District Judge ছিলেন এবং শ্রীশচন্দ্র বসুর বাটির নিকট বাগানবাড়িতে বাস করিতেন। শ্রীশচন্দ্র বসুর সহিত তাঁহার খুব হৃদ্যতা ছিল। ইংরাজটির বেশ বয়স হইয়াছিল এবং বেশ সৎলোক ছিলেন। একটি যুবক সন্ন্যাসীকে মুন্সেফের বাড়িতে যাতায়াত করিতে দেখিয়া ইংরাজটি শ্রীশচন্দ্রের নিকট সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেন এবং শ্রীশচন্দ্রও সন্ন্যাসীটির অদ্ভুত প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য ইংরাজটিকে বুঝাইয়া দিলেন, ফলে ইংরাজটি সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ পরিচয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। একদিন শ্রীশচন্দ্র নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া ইংরাজটির বাড়ি গেলেন। নরেন্দ্রনাথ তেজস্বী যুবক ও তর্কযুক্তিতে বিশেষ পারদর্শী, ইংরাজটি বৃদ্ধ ও ধীর; দু'জনায় নানা প্রসঙ্গ ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য, অসাধারণ তর্কযুক্তি এবং ত্যাগ-বৈরাগ্য দেখিয়া ইংরাজটি আশ্চর্যান্বিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে তাঁহার বাড়িতে যাইতেন এবং কখন বা খৃষ্টানধর্মের উপর, কখন বা বেদান্তশাস্ত্রের উপর, কখন বা ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের উপর, কখন বা ইতিহাসের উপর আলোচনা করিতেন। ধীরে ধীরে ইংরাজটি ও তাঁহার পত্নী নরেন্দ্রনাথের অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন ইংরাজটি নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "দেখুন স্বামী, আপনি ইংলণ্ডে যান, তথায় আরও ভাল করে লেখাপড়া শিখুন। আপনার ভিতর যা শক্তি আছে তাহার উপর যদি উচ্চবিদ্যা শিক্ষা হয়, তাহা হইলে জগতের বিশেষ কল্যাণকর কার্য হইতে পারে; তাহার জন্য যাহা খরচ লাগিবে, আমি নিজে

তাহা আনন্দের সহিত বহন করিতে রাজি আছি।" নরেন্দ্রনাথের তখন মহা বৈরাগ্যভাব, ঐ সকল কথায় কোন মনোযোগ দিলেন না। নরেন্দ্রনাথের নিকট বৈরাগ্যের কথা ও ভগবান লাভের কথা শুনিয়া ইংরাজটির মন ক্রমশঃ সংসার থেকে ফিরিয়া ধর্মমার্গের দিকে চলিল। তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন, "আর সংসার ভাল লাগে না।" এমন কি তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, পেনশন লইয়া অপরস্থানে গিয়া ধর্মচর্চা করিবেন। ইংরাজটির বৈরাগ্যের ভাব দেখিয়া তাঁহার পত্নী বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া বৃদ্ধ ইংরাজটি তাঁহার পত্নীকে রহস্য করিয়া বলিতেন, "আমি এখনি সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া যাইতেছি না, তোমার কোন ভয় নাই গো।" কিন্তু ইংরাজটি ও তাঁহার পত্নী উভয়েই নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন, স্থির মনে যীশুর বৈরাগ্যভাব এবং বাইবেলটি নরেন্দ্রনাথের নিকট নূতনভাবে বুঝিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ ইউরোপীয়ানদিগের কাছে নরেন্দ্রনাথের বেদান্ত প্রচার করা এইটি প্রথম হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথ ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গাজীপুরে আফিম ডিপার্টমেণ্টে বড় চাকরি করিতেন। বাল্যবন্ধু, এইজন্য সাক্ষাৎ হওয়াতে দুজনে বড় প্রীত হইলেন। সতীশচন্দ্র ভাল পাখোয়াজ বাজিয়ে ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে নরেন্দ্রনাথ ধ্রুপদ গাহিলে সতীশচন্দ্র পাখোয়াজ লইয়া অনেক সময় সঙ্গত করিতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সতীশচন্দ্রকে বেশ স্নেহ করিতেন, কারণ ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ কৃপালাভ করিয়াছিলেন। গাজীপুরে দুই পুরাতন বন্ধু একত্রিত হওয়ায় ভজন ও সঙ্গীত খুব চলিয়াছিল; এবং সতীশচন্দ্র বাল্যবন্ধু হইলেও নরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি ছিল।

রামচন্দ্র দত্তের হাঁপানী রোগ—১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠমাসে রামচন্দ্র দত্তের হাঁপানী রোগে যায় যায় অবস্থা হইল। বর্তমান লেখক

বলরামবাবুর বাড়িতে যোগেন মহারাজকে খবর দেওয়ায় যোগেন মহারাজ ও নিরঞ্জন মহারাজ দ্রুতপদে দৌড়াইয়া আসিলেন। গিরিশবাবু এক ঘণ্টা পরে আসিয়া পৌঁছিলেন। নিরঞ্জন মহারাজ মহেন্দ্রলাল সরকারকে ডাকিয়া আনিলেন ও সকলে প্রাণপণে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এই সময় শিবনারায়ণ নামক রামচন্দ্র দত্তের জনৈক ভক্ত বড় এড়ানীপাখা লইয়া বাতাস করিয়াছিল; সে তিনদিন তিনরাত্রি নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বাতাস করিয়াছিল। শিবনারায়ণের সেবাভাব ও গুরুভক্তি দেখিয়া সকলেই প্রশংসা ও আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। মাধব নামক রামচন্দ্র দত্তের জনৈক ভৃত্য এই সময় খুব সেবা করিয়াছিল। যাহা হউক, রামচন্দ্র দত্ত সেইবার আরোগ্যলাভ করিলেন। যোগেন মহারাজ ও নিরঞ্জন মহারাজের উপর তাঁহার ভালবাসা সমধিক হইয়া উঠিল। রামচন্দ্র দত্ত বলিতেন যে, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদিগের ভিতর এমন একটা জিনিস আছে যাহা সাধারণের ভিতর পাওয়া যায় না। যদিও হাসিতামাসা এবং কার্যকালে সকলেই পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু আবশ্যক হইলে যে যেভাবেই থাকুক না কেন, সকলে এক হইয়া যায়—সকলেরই ভিতর এক ভাব, এক উদ্দেশ্য।"

গুপ্ত মহারাজের জৌনপুরে গমন ও পিতৃ ঋণ শোধ—সম্ভবতঃ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বর্ষাকালে গুপ্ত মহারাজের শরীর বড় খারাপ হইয়া যায়। তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে অনবরত ভুগিতে লাগিলেন এবং মনও বড় বিষণ্ণ হইয়া গেল। বরাহনগরের মঠ থেকে শরৎ মহারাজের পরামর্শ অনুযায়ী নিজেদের দেশে জৌনপুরে তিনি চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার পিতামাতা সকলেই জীবিত ছিলেন। তাঁহার পিতা যদুনাথ গুপ্ত পুত্রকে পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং নানা উপায় করিয়া গৃহত্যাগী পুত্রকে পুনরায় সংসারে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

যদুনাথ গুপ্ত মহাশয় বলিতেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, অধর গুপ্ত

সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গিয়াছে। শরৎ গুপ্ত (গুপ্ত মহারাজ) সেও সন্ন্যাসী হইয়া গেল। বৃদ্ধ বয়স, বড় সংসার, কিছু ঋণ হইয়াছে; অতএব গুপ্ত মহারাজের সে ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া উচিত। গুপ্ত মহারাজ অতি তেজীয়ান্ লোক ও নির্ভীকচেতা; কিছুতেই তিনি দ্বিধাবোধ করিতেন না। তিনি পিতার ঋণ পরিশোধ করিতে তখনই সম্মত হইলেন এবং বার্ড কোম্পানির কাছে এক কর্ম স্থির করিয়া লইলেন। বার্ড কোম্পানি কালকা থেকে সিমলা যাত্রীদিগের মাল লইয়া যাইবার জন্য এক অফিস খুলিয়াছিল। গুপ্ত মহারাজ আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া ম্যানেজার হইয়া তথায় বসিলেন। সকল বাঙ্গালীর সহিত তাঁর পরিচয় থাকায় তাঁর কাজ খুব বাড়িতে লাগিল এবং প্রতিমাসে বেতনের যাহা সঞ্চয় করিতে পরিতেন তাহা পিতাকে পাঠাইয়া তাহার রসিদ নিজে রাখিয়া দিতেন। নির্ধাতির ঋণ পরিশোধ হইবামাত্রই তিনি কর্ম ত্যাগ করিয়া আলমবাজারের মঠে ফিরিয়া আসিলেন। গুপ্ত মহারাজ আবার যে সন্ন্যাসী সেই সন্ন্যাসী হইলেন।

গুপ্ত মহারাজ ও Sir Mortimar Durand—সিমলাপাহাড়ে বাসকালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইয়াছিল বলিয়া তাহা এই স্থানে বর্ণিত হইল। গুপ্ত মহারাজ অপরাহ্ণে আফিসে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন ও কুলি মজুরদের মাল লইয়া যাইতে আদেশ দিতেছিলেন। এমন সময় এক দীর্ঘাকৃতি ইংরাজ আফিসঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কুলিদিগের সহিত কথাবার্তা শুনিয়া আফিস ঘরে প্রবেশ করিলেন। গুপ্ত মহারাজ তাঁহাকে একখানি চেয়ারে বসিতে দিলেন। তিনি টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া স্থির হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। যাইবার সময় শুধু "Well, Gupta, thank you" বলিয়া চলিয়া গেলেন। তদবধি সেই লোকটি প্রায় অপরাহ্ণে তথায় আসিতেন ও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেন। গুপ্ত মহারাজ তাহার বিষয় বড় কিছু অনুসন্ধান করিলেন না। একদিন একটি বাঙ্গালী বাবু বৈকালে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইয়া গুপ্ত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

ঘরে ঢুকিয়াই ইংরাজটিকে দেখিয়া নিঃশব্দে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। গুপ্ত মহারাজ তাহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পরে গুপ্ত মহারাজকে সেই বাঙ্গালী বাবুটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ইংরাজটি কে জানেন?" গুপ্ত মহারাজ সরল লোক, বলিলেন "এ ইংরাজটি আসে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, খানিকক্ষণ পরে চলিয়া যায়। উহার বিষয় কিছুই জানি না।" বাঙ্গালী বাবুটি বলিলেন, "উনিই হচ্ছেন Sir Mortimar Durand, কাবুল Mission-এ যাইবেন।" ব্যাপারে বোঝা গেল, লোকটি সারাদিন চিন্তায় ক্লান্ত হইয়া সরলপ্রাণ গুপ্ত মহারাজের কাছে আসিয়া একটু স্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেন। গুপ্ত মহারাজের প্রাণটা কিরূপ সরল ছিল এই উদাহরণটিতে তাহা বোঝা যায়।

দক্ষ মহারাজের উন্মাদ অবস্থা—১৮৯০ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে দক্ষ মহারাজ একেবারে উন্মাদ হইয়া ফিরিয়া আসেন। অল্পদিন বরাহনগর মঠে থাকিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নিরঞ্জন মহারাজ প্রথমে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। শরৎ মহারাজ সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কোন উপকার হইল না।

শরৎ মহারাজের খৃষ্টীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন—শরৎ মহারাজ উত্তরাখণ্ড হইতে ফিরিয়া বরাহনগর মঠে রহিলেন। উত্তরাখণ্ডে খাওয়ার অনিয়ম হওয়ায় শরীর কৃশ হইয়াছিল ও আমাশা রোগে ভুগিতেছিলেন। তিনি এই সময়ে বাইবেল ও নানাপ্রকার খৃষ্টীয়গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। অতি শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে তিনি সমস্ত খৃষ্টীয়গ্রন্থগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিতেন। বর্তমান লেখক খৃষ্টীয়গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করিয়া নিজে পাঠ করিয়া শরৎ মহারাজকে দিতেন এবং উভয়ে বসিয়া খৃষ্টীয়গ্রন্থের নানা বিষয় আলোচনা করিতেন। বাইবেল, Cunnigham Geikie-র 'The Life and Words of Christ,' Farrar-এর 'Life of Saint Paul' প্রভৃতি অনেক গ্রন্থই তিনি সেই সময়ে পাঠ

করেন। তিনি সকলের কাছে এরূপ বিনীতভাবে থাকিতেন যে, অনেক সময় লোকের তাহাতে কষ্ট বোধ হইত।

শরৎ মহারাজের সেবা ভাব—এই সময় তাঁহার সেবা ভাবটা খুব জাগ্রত হয় এবং বসন্ত রোগাক্রান্ত রোগীকেও তিনি অম্লান-বদনে গিয়া সেবা করিতেন। এক সময় নরেন্দ্রনাথের বাটিতে কোন ব্যক্তির বিষম বসন্ত রোগ হইয়াছিল। ডাক্তারেরা কেহ ঘরে যাইতে সাহস করিতেছিল না। যিনি শুশ্রূষা করিতেছিলেন, অনবরত কয়েক রাত্রি জাগরণ করায় অতি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। শরৎ মহারাজ শুনিবামাত্র গুপ্ত মহারাজকে শুশ্রূষা করিতে পাঠাইয়া দিলেন। গুপ্ত মহারাজ একরাত্র জাগরণ করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পর দিবস প্রাতে চলিয়া গিয়া বলিলেন, "রোগীর খুব খারাপ অবস্থা, আরোগ্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।" শরৎ মহারাজের তখন ভালবাসা ও দয়ার ভাবটা এত প্রবল যে, শুনিয়াই সন্ধ্যার সময় তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কিরূপে শুশ্রূষা করিতে হয় দেখাইলেন। তিনি রোগীর তক্তাপোশের পার্শ্বে একখানি চেয়ার লইয়া বসিলেন এবং যেই রোগী উসখুস করিতে লাগিল, অমনি হয় বাতাস করিতেছেন, না হয় কার্বলিক তেল গায়ে মালিশ করিতেছেন এবং ওর মধ্যেই চেয়ারে বসিয়া নিজে একটু ঘুমাইয়া লইতেছেন। মাঝে মাঝে স্নেহপূর্ণ মিষ্ট-ভাষায় রোগীর অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাই একপ্রকার ঔষধের কার্য করিতেছে। শরৎ মহারাজের দেবভাবপূর্ণ কার্য দেখিয়া সকলে আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হইলেন।

এই সময় তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন, "এত ত চেষ্টা করা গেল ভগবান ত পাওয়া গেল না ; আর ও কি ব্যাপার তাও বুঝিতে পারিলাম না। তবে লোকের সেবা করিতে করিতে দেহটা পাত করিব এই স্থির করিয়াছি।" শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এক ভায়ের বসন্তরোগ হইয়াছিল ; গরীবমানুষ, দেখবার শুনবার তেমন লোক নাই, শরৎ মহারাজ শুনিবামাত্রই চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জনীটি

কাটিয়া ক্ষত হইয়াছিল। বসন্ত রোগীর সেবায় ডান হাতেরই বেশী আবশ্যক, কারণ সর্বদাই গায়ে হাত বুলাইতে এবং কার্বলিক তেল মালিশ করিতে হয়। ক্ষতস্থানে বসন্তের বিষ লাগিলে সংক্রমণ হইতে পারে, ইহাও তিনি জানিতেন। এইজন্য তিনি তর্জনীতে নেকড়া জড়াইয়া অঙ্গুলিটি উচ্চ করিয়া অপর কয়েকটি অঙ্গুলি দিয়া রোগীর গাত্র মার্জনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শুশ্রূষা ও স্নেহপূর্ণ বাক্যে রোগী অল্পদিনেই আরোগ্য-লাভ করিলেন। একবার নরেন্দ্রনাথের বৃদ্ধা মাতামহীর রোগাক্রান্ত হইয়া মরমর অবস্থা হইল। শরৎ মহারাজ ইহা শুনিবামাত্রই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত গোপালচন্দ্র কবিরাজ ও যোগেন মহারাজকে লইয়া বেলা ৩টার সময় রামতনু বসুর গলির বাটিতে উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নরেন্দ্রনাথের মাতাকে এমন মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন যে, সকলে তাহাতে পরম সন্তুষ্ট হইলেন ও সাহস পাইলেন। গোপাল কবিরাজ বাগবাজার থেকে আসিবার সময় গাড়িতে আমোদ করিতেছিলেন যে, "এইবার বুড়ীর Firework হবে, লুচির খোলা চড়বে আর আমি এমনি করে খোল বাজাব"। এই বলিয়া নানারকম অঙ্গভঙ্গি করিয়া সকলকে হাসাইয়া মুখে ও হাতে খোল বাজাইতে লাগিলেন। কোথায় লোকে শোক করিবে, না সকলে হাসিয়া লুটোপুটি। বাড়িতে আসিয়া নাড়ি দেখিয়া কৌতুকপ্রিয় গোপাল কবিরাজ মশাই বলিলেন, "আরে সব ফাঁক, লুচির খোলাটাই মাঠে মারা গেল, বুড়ির ত মরবার এ নাড়ি নয়, বুড়ি যে বেঁচে উঠবে! হায় আমাদের কপাল! কোথায় লুচি খাব, খোল বাজাব, না বুড়ি ঝেড়ে উঠবে। যা হউক, একটু করে দুধ খেতে দাও আর এই ঔষধটা খাওয়াও। একবার করে রোজ এসে দেখে যাব এখন" এই বলিয়া গোপাল কবিরাজ মশাই ফিরিয়া যাইলেন। প্রকৃতই নরেন্দ্রনাথের মাতামহী সেবার আরোগ্যলাভ করিলেন।

নরেন্দ্রনাথের পরিজনবর্গের দেখাশুনা—তখন নরেন্দ্রনাথের পরিজনের দেখাশুনা শরৎ মহারাজ, যোগেন মহারাজ, সান্ন্যাল মশাই

ও অপর সকলেও যথাসাধ্য করিতেন। কিন্তু এই তিনজন বিশেষভাবে খবর লইতেন। রাখাল মহারাজ ও হরি মহারাজ তখন পশ্চিমে ছিলেন সেইজন্য তাঁহাদের এই সময় নামোল্লেখ হইল না। একদিন যদি দেখাশুনা না হইত বা খবর যদি না পাইতেন তাহা হইলে যোগেন মহারাজ ছুটিয়া আসিতেন এবং সমস্ত খবর লইয়া বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেন। ভক্তসংখ্যা কম থাকায় তখন পরস্পর দেখাশুনা হইত এবং সকলেই পরস্পরের রোজ খবর লইতেন। এই সময় যেন একটা ভালবাসার স্রোত বা বন্যা চলিয়াছিল। অপর দেশে আর কোন সম্প্রাদায়ের ভিতর এরূপ হইয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু এইটি স্বচক্ষে দেখিয়াছি বলিয়া এত মিষ্ট লাগিত এবং তাহারই একটু আভাসমাত্র এখানে উল্লেখ করা হইল।

বর্তমান লেখকের অসুস্থতা ও শরৎ মহারাজের যত্ন—আর একটি উদাহরণ এখানে দিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সময়ে বর্তমান লেখকের রক্তপিত্ত বা blood spitting হইয়াছিল। মুখ দিয়া অনবরত রক্ত উঠিত—আহারে রুচি নাই, কৃশ ও দুর্বল হইয়া গেলেন। শরৎ মহারাজ শুনিয়াই রামতনু বসুর গলির বাড়িতে চলিয়া আসিলেন এবং বর্তমান লেখককে নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। পাছে কোন আহারের অনিয়ম বা ঔষধের ব্যতিক্রম হয় সেইজন্য তিনি রুগ্ন ব্যক্তিটিকে নিজের কাছে রাখিয়া বরাহনগরের ডাক্তার মহেন্দ্র মজুমদারকে দিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের মাতা ইহাতে অনেক সান্ত্বনালাভ করিয়াছিলেন। শরৎ মহারাজের তত্ত্বাবধানে রোগী কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিলে শরৎ মহারাজ বন্দোবস্ত করিয়া গাজীপুরে মুন্সেফ্ শ্রীশচন্দ্র বসুর বাটিতে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। তুলসী মহারাজ হাওড়া স্টেশনে গিয়া ট্রেনে বসাইয়া দিয়া আসিলেন এবং সর্বদাই চিঠি লিখিয়া খবরাখবর লইতেন।

সামান্য গুটিকতক উদাহরণ-মত দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল কিন্তু শরৎ মহারাজ গোপনে কত লোকের যে শুশ্রূষা করিয়াছিলেন তাহার

সীমা নাই। বন্যা বা অগ্নিদাহ বা দুর্ভিক্ষে শরৎ মহারাজ যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন, এই ভাবটি আলমবাজারের মঠে প্রথমে তাঁহার ভিতর প্রকাশ পাইয়াছিল। আর একটি সদ্‌গুণ তখন তাঁহার ভিতর পরিলক্ষিত হইত। পূর্ব রাত্রের বাসি বা দগ্ধ-অন্ন যাহা অপরে খাইতে পারিত না, শরৎ মহারাজ অম্লানবদনে তাহা ভোজন করিতেন। তাঁহার যে নাকে পূতিগন্ধ লাগিত না একথা নহে, কিন্তু তাঁহার এমন ধৈর্যগুণ ছিল যে, তিনি মুখ-বিকৃতি না করিয়া স্থির হইয়া ভোজন করিতেন।

শরৎ মহারাজের যীশুর সংক্রান্ত গ্রন্থসকল পাঠ করা—বলরামবাবুর বাড়ির বড় ঘরটির পূর্বদিকের দেওয়ালের কাছে শুইয়া শরৎ মহারাজ নিবিষ্টমনে যীশুর সংক্রান্ত গ্রন্থসকল পাঠ করিতেন। পূর্বদিকের দেওয়ালের গায়ে একখানি যীশুর মাথা ও গলা পর্যন্ত, পুরাতন তৈলচিত্র ছিল। এই সময়ে যীশুর উপাখ্যান পড়িতে পড়িতে শরৎ মহারাজ ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। চক্ষুদ্বয় জলে পুরিয়া যাইত, কখনও বা জল গড়াইয়া পড়িত। বর্তমান লেখকের সহিত যীশুর সম্বন্ধে নানা বিষয় কথা হইত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যীশুর বিষয় যে সব কথা বলিয়াছিলেন, সেইসব কথা অতি ভক্তিভাবে কহিতেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "দেখ, তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) বলিতেন, যখন তিনি খৃষ্টীয়ভাবে কয়েক দিন সাধনা করিয়াছিলেন তখন যীশুকে দর্শন করিয়াছিলেন—হাতে-পায়ে পেরেক পোঁতার চিহ্ন ছিল। তাহারপর সেই রূপটি তাঁহার শরীরে মিশাইয়া গেল।" শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে শুনিয়াছিলেন যে তিনি ভাবাবেশে বড় বড় বিশপের সারগর্ভ উপদেশ কানে শুনিতে পাইতেন।

শরৎ মহারাজের নির্ভরতা—কাশীপুর বাগানে নরেন্দ্রনাথ দিনকতক বাইবেলের উপাখ্যান তুলিয়া অনবরত বলিয়া যাইতেন। শরৎ মহারাজও এই সময়েতে এই কথাটি পুনঃপুনঃ বলিতেন, "If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say

unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you, অর্থাৎ যদি সরিষার বীজতুল্য বিশ্বাস তোমার ভিতর থাকে, তা হলে তুমি যদি এই পর্বতকে দূরে চলে যেতে বল, সে তৎক্ষণাৎ চলে যাবে এবং অসম্ভব বলে কোন জিনিস তোমাদের নিকট থাকবে না। এইরূপ নির্ভর ও বিশ্বাসের ভাব শরৎ মহারাজের তখন খুব প্রবল হইয়াছিল। "The woman suffering from issue of blood twelve years"-এর উপাখ্যানের শেষ কথাটি "Thy faith hath made thee whole" তিনি অনবরত বলিতেন, তখন তাঁহার কি নির্ভরের ভাব! কি ভক্তি-নম্র বিনয়ের ভাব!

শরৎ মহারাজের বিষণ্ণ ভাব—কিছুদিনের পর বিশেষ কিছু দিক নির্ণয় করিতে না পারিয়া শরৎ মহারাজের মনে বড় বিষাদের ভাব আসিল। এখন মাঝে মাঝে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "কি হল? বড় একটা আশা করে বাড়ি ঘরদোর ছেড়েছিলাম; কই কিছুই ত পেলুম না, শুধু ভিক্ষা করে খাওয়া আর এখানে ওখানে শুয়ে রাত কাটান। তবে একসঙ্গে থাকতে ভালবাসি সেইজন্যে পড়ে আছি, ফিরে যেতে পাচ্ছি না।" এক এক সময়ে বিষণ্ণভাব এত অধিক হইত যে, তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতেন না, নিজেকে অপদার্থ মনে করিয়া মৌন হইয়া থাকিতেন। এই সময় রাত্রি অধিক পর্যন্ত তিনি জপধ্যান করিতেন। St. Xavier's College-এ পড়েছিলেন সেইজন্য "Roman Catholic-দের আচার-ব্যবহার অনেক দেখিয়াছিলেন। দিনকতক তিনি 'Ave Maria' জপ করিতে সুরু করিলেন, তবে ক'দিন ও কতক্ষণ ধরিয়া জপ করিতেন তাহা কেহ জানেন না। মাঝে মাঝে তিনি অতি করুণভাবে যে সব কথা কহিতেন তাহাতেই কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইত। শরৎ মহারাজ ও বর্তমান লেখকের সহিত সর্বদা যীশুর কথাবার্তা শুনিয়া যোগেন মহারাজের বাইবেল পড়িতে ইচ্ছা হইল। বর্তমান লেখকের একখানি Cassel-এর ছবিওয়ালা

বাইবেল ছিল, তিনি সেই বইখানি দেখিতেন ও মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে পাঠ করিতেন ; তাঁহার Zacharias-এর উপাখ্যানটি বড় পছন্দ হইত ; এবং গীতাখানি তিনি নিত্য পাঠ করিতেন।

যোগেন মহারাজের শিরঃপীড়া ও গিরিশবাবু কর্তৃক তাহার নিরাময় করণ—১৮৯১ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে বলরামবাবুর বাড়ির সিঁড়িতে উঠিয়া ডানদিকের ছোট ঘরটিতে পশ্চিমদিকের দেওয়ালের কাছে যোগেন মহারাজ একখানি তক্তপোশে শুইয়া আছেন, চক্ষুদ্বয় লোহিত ও অত্যন্ত শিরঃপীড়া হইয়াছে। বর্তমান লেখক বেলা সাড়ে-তিনটা বা চারটার সময় তথায় উপস্থিত হইলে যোগেন মহারাজ বলিলেন, "তুই যা গিরিশবাবুর কাছে বলগে যা, আমার বড় মাথাব্যথা করছে ও মাথার ভিতর বড় যন্ত্রণা হচ্ছে, আমি বড় অস্থির হয়েছি।"

বর্তমান লেখক দ্রুতপদে পশ্চিমদিকের ছোট গলি দিয়া গিরিশবাবুর কাছে গেলেন। গিরিশবাবু তখন স্নান করিবার উপক্রম করিতেছিলেন সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "আমি এখনই যাচ্ছি। তুই গিয়ে যোগেকে একটু ফিকে চা করে খাইয়ে দিগে যা, তা'হলেই মাথার যন্ত্রণা ভাল হবে।" বর্তমান লেখক বলিল, "যোগেন মহারাজ যে কখন চা খান না, চা খেলে তাঁর মাথা ধরে।" গিরিশবাবু বলিলেন, "সেইজন্যই ত বলছি, ফিকে চা খেলে উপকার করে। আমি গিয়ে যা ঔষধ দেবার দিচ্ছি।" বর্তমান লেখক সেই গলি দিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত যোগাড় করিয়া দুধ চিনি না দিয়া যোগেন মহারাজকে চা করিয়া খাওয়াইয়া দিলেন ; খাইবামাত্রই তাঁর মাথাব্যথা কমিয়া গেল। তখন তিনি উঠিয়া বসিয়া একটি তাকিয়া কোলে লইয়া কনুই দুটি তাকিয়াতে রাখিয়া বর্তমান লেখককে বলিতে লাগিলেন, "দ্যাখ্, কদিন অনবরত জপ কচ্ছি, সমস্ত রাত্রি জপ করি তাহাতেই বোধ হচ্ছে এই মাথাব্যথাটা হয়েছে।" এমন সময় গিরিশবাবু আসিয়া সামনের টেবিলের উত্তর-দিকের চেয়ারটিতে বসিয়া বলিলেন, "কিরে তোর মাথাব্যথা কেমন আছে?" যোগেন মহারাজ বলিলেন, "ফিকে চা-টা খেতে মাথাব্যথা

ছেড়ে গিয়েছে।” গিরিশবাবু হাসিয়া বলিলেন, “দেখলি শ্যালা, হোমিও প্যাথিক ঔষধের গুণ দেখলি”, এই বলিয়া দুইজনে হাস্যকৌতুক করিতে লাগিলেন। তাহার পর গিরিশবাবু নিজের জীবনের অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে উঠিল যে গিরিশবাবুর বাড়ির আশেপাশে অনেক জমি তাঁহার পূর্বপুরুষের ছিল। গিরিশবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “দেখ, আমার বাবা বড় মামলাবাজ ছিলেন, মকদ্দমায় কখন হারিতেন না। তখন কলিকাতায় জমির দর কিছুই ছিল না ; জায়গার দর একটু বাড়িলে তিনি অনেক জায়গা বেচিয়া নগদটাকা করিয়াছিলেন তা নইলে পাড়ার অনেক জায়গা আমাদের ছিল”, এইরূপ নানা বিষয় কথাবার্তা হইতে লাগিল। যোগেন মহারাজের নিদ্রা-ত্যাগ ও সমস্ত রাত্রি জপের কথা বর্তমান লেখক কালী বেদান্তীকে বলিলে তিনি বলিলেন, “যোগেকে বলিস যেন সে অমন করে ঘুম বন্ধ করে না, তা হলে উৎকট মাথার ব্যামো হতে পারে।”

গিরিশবাবুর বাড়িতে সকলের চা খাওয়া, শাস্ত্র প্রসঙ্গ ও নানা আলোচনা—বর্তমান লেখক অপরাহ্ণ সাড়ে-তিনটা বা চারটায় সময় বলরামবাবুর বাড়িতে প্রায় যাইতেন। তাহার পর তথা হইতে গিরিশবাবুর ঘরে গিয়া সকলে জমা হইতেন। গিরিশবাবুর ঈশ্‌নে নামে এক চাকর ছিল ; সে চায়ের বাটি, গরম জল প্রভৃতি সব তৈয়ারি করিয়া রাখিত। বর্তমান লেখক গিয়া চা প্রস্তুত করিয়া সকলকে দিতেন। এই চা খাওয়ার দলেতে গিরিশবাবু, শরৎ মহারাজ, কালী বেদান্তী এবং আরও অনেকে থাকিতেন। এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, বর্তমান লেখক চা তৈয়ারি করিয়া না দিলে গিরিশবাবুর তৃপ্তি হইত না। বর্তমান লেখকের কোনদিন যাইতে বিলম্ব হইলে সকলে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতেন এবং এই চা পান উপলক্ষ করিয়া নানা শাস্ত্র-প্রসঙ্গ চলিত। কখন বুদ্ধদেবের, কখন বেদান্তের, কখনও বা অন্যান্য শাস্ত্রের কথা হইত। সেই সময়টা অতি গম্ভীরভাবপূর্ণ আলোচনায় অতিবাহিত হইত এবং সকলেই তাহাতে বিশেষ আনন্দ অনুভব

করিতেন। তাহার পর সকলে বলরামবাবুর উপরকার ঘরে ফিরিয়া আসিতেন। এই সময়কার কথাবার্তার একটা উদাহরণ এইস্থানে দেওয়া হইল। একদিন গিরিশবাবু বলিলেন, "আমাদের আগে duty বোধ বলে কিছু ছিল না, 'অদৃষ্টে করায় তাই করি' এই ভাবটাই ছিল, নিঃস্বার্থ হয়ে প্রাণ দিতে পারা এ ভাবটা আমাদের ছিল না, কোন জায়গায় ত উল্লেখ পাচ্ছি না।" বর্তমান লেখক বলিলেন, "কেন, আপনার 'বুদ্ধদেব-চরিতে'ই ত সেটা আছে ঃ—

"ফোটে ফুল সৌরভ হৃদয়ে ধরি,
সৌরভ বিতরি
আপনি শুখায়ে যায় ;
মৃত্যু ভয় আছে কি কুসুমে ?"

গিরিশবাবু যদিও খেয়ালের মাথায় লিখিয়াছিলেন কিন্তু ভাবের গুরুত্ব তাঁর নজরে তখন পড়ে নাই। অতুলবাবু পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। গিরিশবাবু বলিতে লাগিলেন "কি সুন্দর ভাব, কি সুন্দর কথা!" এই বলিয়া শ্লোকটি পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিতে করিতে যেন বিভোর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষু অর্ধনিমীলিত হইল, মাথাটি একটু নিচু করিয়া অল্প অল্প এদিক্ ওদিক্ ঘোরাইতে লাগিলেন এবং শ্লোকটি বারেবারে বলিতে লাগিলেন। অতুলবাবু বলিলেন, মেজদা, তোমার বইয়ে অনেক অনেক উৎকৃষ্ট ভাব আছে যাহা সাধারণের চোখ এড়িয়ে যায়। ভেবে না পড়লে সেগুলো বোঝা যায় না।" গিরিশবাবু বর্তমান লেখককে বলিলেন, "মহিন, তুমি এমন করে আমার বইগুলো পড়েছ!" এই চা পান উপলক্ষে কালী বেদান্তী ও শরৎ মহারাজের সহিত গিরিশবাবুর বেদান্তের চর্চা হইত এবং তাঁহার নাটকগুলিতে যে সকল বেদান্তের ভাব আছে এই আলোচনায় তাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছিল।

যোগেন মহারাজ ও বর্তমান লেখক—গিরিশবাবুর বাড়ি থেকে সকলে বলরামবাবুর বাড়িতে প্রত্যাগমন করিলে যোগেন মহারাজ কোনদিন ঘরের ভিতর বসিয়া, কোনদিন বারাণ্ডায় পায়চারি করিতে

করিতে হাস্য-কৌতুকছলে অনেক সারগর্ভ কথা বলিতেন। বর্তমান লেখককে বলিতেন, "তুই শ্যালা কেবল চা খাবি আর বই পড়বি।" এইরূপ সুরু করিয়া ক্রমে ক্রমে বুদ্ধদেব বা যীশুর কথা উঠিত। তিনি বইয়ের ভিতরের ভাবটা এমন দেখিতে পাইতেন যে, সাধারণ বইপড়া-লোকে সেটা পাইত না। যেদিন যাহাকে কোন বিশেষ কথা বলিবেন, সেইদিন তাঁহার উপর মৌখিক গালের ভাবটা অধিক হইত, তবে সেটা এমন আনন্দময় স্নেহপূর্ণ ছিল যে, শব্দবিন্যাসের দিকে কাহারও দৃষ্টি থাকিত না। প্রত্যেক শব্দটাই ভালবাসা পূর্ণ ছিল।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও যোগেন মহারাজ—যোগেন মহারাজ একদিন বলিলেন, "ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের গাড়ি করে একদিন যাচ্ছি। ঠন্‌ঠনের কাছে গাড়িখানা এলে আমি হাত তুলে মা কালীকে প্রণাম কল্লুম। ডাক্তার সরকার ত চটে আগুন, বললেন 'তুমি কি করলে?' আমি বললুম 'মা ব্রহ্মময়ীকে নমস্কার করলুম।' ডাক্তার সরকার বললেন 'একটা বীভৎস সাঁওতাল মাগীকে প্রণাম করা একটা জাতের কলঙ্কস্বরূপ'। আমি তাঁহাকে কালীর বিষয় একটু বোঝাবার চেষ্টা কচ্ছি এমন সময় ডাক্তার আরও চটে উঠে বললেন, 'ধর্মকর্ম অতি অপদার্থ জিনিস। মেরীনন্দন, যশোদানন্দন আর শচীনন্দন এই তিন গুয়াটার নন্দন জগৎটাকে নষ্ট করেছে, বুঝলে'। আমার ত হাসিতে হাসিতে পেট গুলিয়ে উঠলো। আমি বললুম, 'আচ্ছা কে কি করেছে সেটা বলুন, আপনি ত কেবল গাল দিচ্ছেন'। ডাক্তার সরকার আরও উত্তেজিতভাবে বলিলেন, 'এই দেখ—না গুয়াটা মেরীনন্দনের দোহাই দিয়ে এক Crusade তুলে কোটি কোটি লোকের প্রাণ গেছে। যদি মেরীনন্দন না জন্মাত তা'হলে জগৎটা ঢের ভাল হত এইরূপ ক্রিশ্চান গোঁড়ামি জগতে হত না। আর ওই যে গুয়টা যশোদানন্দন, ও গুয়াটা ব্যাভিচার আর লাম্পট্যের স্রোত বইয়ে গেছে'। আমি ত হাসি চেপে রাখতে আর পারিনে। ছ্যাখ্‌ এত বড় পণ্ডিত লোকটা কি বলচে। হাসিটা খানিকটা ভেতরে থামিয়ে

বললুম, 'আচ্ছা শচীনন্দন কি করলে'? তিনি বলিলেন, 'দেখ দিকিনি, লোকগুলো সমস্ত দিন খেটেখুটে রাত্রে একটু সুস্থির হয়ে কোথায় ঘুমুবে তা নয় এক খোল আর করতাল নিয়ে হৈ-হৈ করে বেড়ান। মাথা খারাপ হয়ে পাগলামির ভাব আসে আর ওতেই ত সব ব্যামো হয়। কোথায় সময়ে খাবে, সময়ে বিশ্রাম করবে, না কেবল হৈ-হৈ করে নাচা'। আমি বললুম যে, 'কেত্তন করে নাচাই কি ব্যামোর কারণ'? ডাক্তার সরকার বললেন, 'আর দেখ এই যত গুয়াটা ডাক্তার আজকাল হয়েছে, তারাই ব্যারামটা বাড়ায়। আজ যদি সমস্ত ডাক্তার মরে যায়, কালকে দেখবে আর ব্যারাম থাকবে না। গুয়াটারা দু'টাকা পাবে বলে যা-তা ঔষধ দেয়, একটা ব্যামো বন্ধ হয় ত পাঁচটা ব্যামো উঠে পড়ে'। এইসব কথা হইতে হইতে ডাক্তার সরকারের বাড়িতে গিয়ে পৌছাইলাম। তারপর আমি ডাক্তার সরকারের নিকট হতে ফকিরের জন্য ঔষধ নিয়ে ফিরে এলুম।"

বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল—বৈকুণ্ঠ সান্ন্যাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যাইতেন এবং প্রথমশ্রেণীর ভক্ত বলিয়া পরিগণিত। তিনি Stationery অফিসে কার্য করিতেন, তখন অল্প বেতন পাইতেন তাহাতেই কষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ হইত। নরেন্দ্রনাথের নিতান্ত অনুগত থাকায় তিনি সর্বদাই নরেন্দ্রনাথের আত্মীয়দের খবর লইতেন এবং নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিজনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আন্তরিক টান ও স্নেহ ছিল। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, মাতামহী ও শিশু তৃতীয় ভ্রাতার জন্য যাহাতে চিন্তিত না হন এইজন্য তিনি অতি যত্ন করিয়া নরেন্দ্রনাথের আত্মীয়দের পর্যবেক্ষণ করিতেন। অফিসে চাকরি করেন সেইজন্য বরাহনগরের মঠে সর্বদা যাইতে পারিতেন না, কিন্তু অবসর পাইলেই যাইতেন। কখন বা তিনি বলরামবাবুর বাড়িতে আসিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, কখন বা তাঁহাদের বাসস্থানে যাইয়া দেখা করিতেন। তখন তিনি শোভাবাজারে নন্দরাম সেনের গলিতে মৈত্রদের বাড়িতে থাকিতেন।

রামকৃষ্ণ-ভক্ত-মণ্ডলী সন্ন্যাল মহাশয়কে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন। গিরিশবাবু ও অতুলবাবু তাঁহাকে বিশেষ যত্ন-ভালবাসা দেখাইতেন; এবং নিতান্ত আপনার লোক বলিয়া সকলেই তাঁহাকে সম্মান করেন।

বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ—নরেন্দ্রনাথ যখন তৃতীয়বার পশ্চিমে চলিয়া গেলেন সান্ন্যাল মশাই তখন অধীর হইয়া পড়েন, সংসারে থাকা তখন তাঁহার কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি সব ত্যাগ করিয়া নরেন্দ্রনাথের কাছে থাকিবার ইচ্ছায় সন্ন্যাসী হইয়া কয়েক বৎসর উত্তরাখণ্ডে অবস্থান করিয়াছিলেন। সান্ন্যাল মশাই তখন প্রায় সন্ন্যাসীরই মতন হইয়াছিলেন। সকলে যেমন তিনিও তেমনি, এবং মনুস্মৃতি ও গীতাখানি খুব মন দিয়া পড়িতেন। উত্তরাখণ্ডের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া সকলে মীরাটে আসিলেন এবং মীরাটে কিছুদিন অবস্থান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে সকলে চলিয়া গেলেন। এই সময় সান্ন্যাল মহাশয় জপধ্যান ইত্যাদি খুব করিতেন এবং কঠোর সাধুপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া কখন বা আলমবাজারের মঠে, কখন বা বলরামবাবুর বাড়িতে থাকিতেন। তাঁহার পরিজনের বিশেষতঃ তাঁহার বৃদ্ধা মাতার কষ্ট ক্রমশঃ অধিক হইয়া উঠিল এবং সকলের অনুরোধে তিনি স্বভবনে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় নিজের কর্মে যোগ দিলেন। তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্য, সকলের সহিত সৎব্যবহার এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও নরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি রামকৃষ্ণসঙ্ঘেরভিতর একজন বিশিষ্ট প্রণম্য ব্যক্তি।

কিশোরীমোহন রায়—কিশোরীমোহন রায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত। আলমবাজারের সন্নিকটস্থ বনহুগলিতে ইহার আবাসস্থান হওয়ায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে যাওয়া ইহার বেশ সুবিধা ছিল। ইনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুল যখন সুকিয়া ষ্ট্রীটে ছিল তখন তারিণীনাথ রায় শিশু-

বিভাগের সুপারিন্‌টেনডেন্ট ছিলেন। বর্তমান লেখক তখন শিশু-বিভাগে পড়িতেন সেইজন্য তারিণীবাবুকে বিশেষ চিনিতেন ও শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। কিশোরীমোহন, তারিণীবাবুর পুত্র,—দেখিতে দীর্ঘাকৃতি কিঞ্চিৎ কৃশ বলা যাইতে পারে, বর্ণ অল্প কৃষ্ণ এবং শ্মশ্রু লম্বা। তিনি পূর্ববঙ্গের মুসলমানদিগের ভাষা হুবহু নকল করিতে পারিতেন ও নিতান্ত কৌতুকপ্রিয় বলিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে আহ্লাদ করিয়া প্রীতিপূর্ণ শব্দে "আব্দুল" বলিয়া ডাকিতেন। এইজন্য অনেকেই তাঁহাকে কৌতুকছলে "আব্দুলদাদা" বলিতেন। কিশোরীদাদার আর একটি রহস্যের ক্ষমতা ছিল। তিনি কাবুলিদের পস্তুভাষা অনুসরণ করিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতে পরিতেন। দূর হইতে শুনিলে বোধ হইবে যেন কোন কাবুলি ক্রুদ্ধ হইয়া কথা কহিতেছে। তিনি পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের নানাস্থানের ও নানালোকের ভাষা হাস্যোদ্দীপক-ভাবে অনুকরণ করিয়া কহিয়া যাইতে পারিতেন। তিনি Government Stationery আফিসে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং কয়েক বৎসর হইল পেনসন পাইয়াছেন।

কিশোরীদাদা বরাহনগরের মঠে বিশেষতঃ আলমবাজারের মঠে সর্বদাই যাতায়াত করিতেন এবং কর্মদক্ষ ও বিচক্ষণ বলিয়া অনেক বিষয়ে কর্মের ভার লইতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও নরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার অচলা শ্রদ্ধাভক্তি থাকায়, রামকৃষ্ণভক্তেরা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন।

দাশরথি সান্ন্যাল—দাশরথি সান্ন্যাল নরেন্দ্রমাথের সহপাঠী ও বিশেষ সুহৃদ্। ইঁহার পূর্ব আবাসস্থান বরাহনগর মঠের অনতিদূরে। নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু হওয়ায় দাশরথি সান্ন্যাল অবসর পাইলেই বরাহনগর মঠে আসিতেন এবং আলমবাজারে মঠ উঠিয়া গেলে সেখানেও মাঝে মাঝে যাইতেন। পরে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে সুবিখ্যাত উকীল হইয়াছিলেন এবং বহু অর্থ ও মানসম্ভ্রম উপার্জন করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি সেই যুবক দাশু হইয়া সরল বালকভাবে নরেন্দ্রনাথের বিষয় বলিতে বলিতে বিভোর হইয়া যাইতেন। ওকালতী ভাব তখন আর তাঁহার থাকিত না। বরাহনগরের মঠে সর্বদা যাইতেন এবং নরেন্দ্রনাথের গুরুভাইদিগের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকায় দাশরথি সান্ন্যালের নাম এইস্থানে উল্লেখ করা হইল।

সাতকড়ি মৈত্র—যে রাত্রে নরেন্দ্রনাথের পিতা পরলোক গমন করেন নরেন্দ্রনাথ সেইদিন অপরাহ্ণে ও রাত্রির কিয়দংশ পর্যন্ত বরাহনগরে সাতকড়ি মৈত্রের বাড়িতে অবস্থান করিতেছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারী শনিবার রাত্রে নরেন্দ্রনাথকে সাতকড়ি মৈত্রের বাড়ি হইতে সংবাদ দিয়া একেবারে নিমতলার দাহস্থানেতে তাঁহার পিতার সৎকার করিবার জন্য আনিতে হইয়াছিল। সাতকড়ি মৈত্র নরেন্দ্রনাথের পাঠ্যাবস্থার বন্ধু এবং খুব সৌহার্দ ছিল। বরাহনগরের মঠেতে অবসর পাইলেই তিনি আসিতেন এবং ভূমিতে বসিয়া শালপাতে করিয়া অন্ন আহার করিতেন। যদিও তিনি বিভবশালী ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু নরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার এরূপ অনুরাগ ও প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল যে, আনন্দসহকারে সামান্য অন্ন মহাপ্রসাদ বলিয়া আহার করিতেন এবং অকপটভাবে সকলের সহিত মিশিতেন ও সকলকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন।

ভাই ভূপতি—ভাই ভূপতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণকুমার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদ পাইয়াছিলেন। তিনি বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর শিক্ষকের কার্য করিতেন এবং ভক্তমণ্ডলীর ভিতর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের গরমকালে তিনি কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার মস্তিষ্ক কিছুপরিমাণে বিকৃত হইয়াছিল। কথাবার্তা বেশী কহিতেন না তবে মাঝে মাঝে কিছু বিড়বিড় করিয়া বকিতেন, কখনও বা কোন কিছু ভাবিতে ভাবিতে ভাবোচ্ছ্বাসে চিৎকার করিয়া উঠিতেন। যাহা হউক, তিনি অনবরত জপ করিতেন; এবং কলিকাতায় হেদোর ধারে পায়চারি করিতেন। এইরূপ কয়েক বৎসর

অনবরত জপ করার পর তাঁহার সহিত বাক্যালাপে জানা গেল যে, তাঁহার মন খুব উন্নত হইয়াছে এবং অনেক উচ্চভাবের কথা তিনি বলিতেন। তাঁহার একটি বিশেষ গুণ ছিল যে, ব্যঙ্গচ্ছলেও তিনি কখন মিথ্যা কথা বলিতেন না। নানা ছলে বাক্‌চাতুরি করিয়া তাঁহার কথা বিপর্যস্ত করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার সত্য কথাই ঠিক থাকিত। এইজন্য সকলে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন এবং অনেকেই তাঁহার কাছে পরে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মৌখিক ত্যাগ বা বৈরাগ্য বলিয়া কোন শব্দ ব্যবহার করিতেন না, কিন্তু তাঁহার জীবনটাই ছিল ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতীক। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। স্বভাব, ছোট শিশুর ন্যায়। জগৎটা কি ব্যাপার, তা তাঁহার স্মরণ ছিল না। শেষ পর্যন্ত তিনি নিরবচ্ছিন্ন জপ করিতেন।

দয়ালবাবু ও মহেন্দ্র কবিরাজ—রামদয়াল চক্রবর্তী বলরামবাবুর গুরু বা পুরোহিত বংশ ; তিনি বলরামবাবুর বাড়িতেই কয়েকটি ঘর লইয়া বাস করিতেন। ইহারা তিন সহোদর, সকলেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যাইয়া তাঁহার বিশেষ কৃপা পাইয়াছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথের পাঠ্যাবস্থায় গৌরমোহন মুখার্জির গলির বাড়িতে আসিয়া নরেন্দ্রনাথের সহিত সর্বদা সাক্ষাৎ করিতেন। স্বভাব অতি ধীর নম্র, কথা মৃদু ও মধুর এবং সকলের সহিত অতি ভক্তিপূর্ণ বিনীতভাবে আলাপ করিতেন। সকলেই ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। সাধারণতঃ ইঁহাকে দয়ালবাবু বলিয়াই ডাকা হয়।

মহেন্দ্র কবিরাজ আগে সিঁথিতে বাস করিতেন। এই জন্য ইঁহাকে সকলে সিঁথির কবিরাজ বলিতেন। অবশেষে ইনি বরাহনগরে মালিপাড়াতে আসিয়া বাস করেন। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ কৃপা পাইয়াছিলেন এবং সর্বদা দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। নরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি ছিল এবং তিনি গোপালদাদার নিকট-কুটুম্ব। মহেন্দ্র কবিরাজ মহাশয়কে সকলেই শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন।

গঙ্গায় ভীষণ জলরাশি—সম্ভবতঃ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে রবিবার প্রাতে সিমলাপাহাড় হইতে এক পত্র আসিল যে, নরেন্দ্রনাথের এক কনিষ্ঠা ভগ্নী তথায় আত্মহত্যা করিয়াছে। বর্তমান লেখক শোকার্তমনে বরাহনগর মঠে চলিয়া গেলেন, এবং সাড়ে-দশটার সময় তথায় পৌঁছিলেন। মঠে তখন শশী মহারাজ, শিবানন্দ স্বামী, নিরঞ্জন মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, দক্ষ মহারাজ ও সুরেন মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। বেলা এগারটার সময় পরামাণিক ঘাটের পার্শ্বে 'অশ্বত্থগাছওয়ালা ঘাটে সকলে স্নান করিতেছেন, দাশরথি সান্ন্যালও সকলের সহিত স্নান করিতে করিতে বাক্যালাপ করিতেছেন। হঠাৎ দেখা গেল যে, গঙ্গার উত্তরদিক হইতে ১০ বা ১২ ফুট বা তাহারও অধিক এক প্রকাণ্ড জলরাশি অতি গম্ভীরভাবে দক্ষিণদিকে আসিতেছে। পূর্ব হইতেই পুলিশের বন্দোবস্ত ছিল। ভীষণ জলরাশি দেখিয়া সকলেই নিম্নস্থান হইতে বাঁধান পোস্তার উপর উঠিলেন। তিন বা চার মিনিটের ভিতর জল আসিয়া অশ্বত্থগাছটির তৃতীয় অংশ ডুবাইয়া দিল। বোধ হয় পরে অশ্বত্থগাছটি সমস্ত ডুবিয়া গিয়াছিল। স্নানান্তে কয়েক ব্যক্তি বরাহনগর মঠে আসিয়া প্রসাদ পাইয়া বেলুড় যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রায় বেলা একটার সময় বর্তমান লেখক ও বাবুরাম মহারাজ দুজনায় গিয়া একখানি খেয়া নৌকায় বসিলেন, দক্ষ মহারাজ গিয়া পারঘাটা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন। নৌকা গঙ্গা পার হইয়া অপর পারে আসিয়া ঘুসুড়ির নিকট বেগে গিয়া পড়িল। জল তত্রস্থ অশ্বত্থগাছের পাতা পর্যন্ত হইয়াছে। যাহা হউক, উপরের ডাঙ্গায় নামিয়া যেমনি দুজনে যাইতেছেন, অমনি জল আসিয়া উপরের ডাঙ্গা আক্রমণ করিল এবং কোন্‌টা ডাঙ্গা কোন্‌টা গঙ্গা, পরে কিছুই প্রভেদ রহিল না। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তখন ঐ স্থানের একটি বাড়িতে বাস করিতেছিলেন, সেই বাড়িটি এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং তাহার আর কোন চিহ্ন নাই। বর্তমান লেখকের তখন যোগেন মহারাজের সহিত দেখা করা বিশেষ আবশ্যক ছিল এইজন্য সত্বর তথায়

যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন রবিবার, গিরিশবাবু দুই একটি লোক লইয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বাবুরাম মহারাজের ভ্রাতা তুলসীরাম ঘোষ, লাটু মহারাজ এবং অপর ছয়-সাত জন লোকও তথায় উপস্থিত ছিলেন।

Gona flood—হিমালয়ে গণা নামক নদীর জল পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ায় কয়েক বৎসর আবদ্ধ ছিল। স্থানটি নন্দপ্রয়াগের নিকট। অবরোধকারী প্রাচীরসদৃশ পাহাড় ফাটিয়া যাওয়ায়, রুদ্ধ জল ভৈরবনাদে নিম্নে ছুটিতে লাগিল এবং নানাদেশ ডুবাইয়া দিয়া অবশেষ কলিকাতায় আসিয়া পড়িল। ইহাকে Gona flood বলিয়া থাকে। ঘুসুড়ি গ্রামটি নাবাল থাকায় জল পিছন দিক্ হইতে ঘুরিয়া আসিয়া গ্রামস্থ অনেক বাড়ি ডুবাইতে লাগিল। গৃহবাসীরা শয্যাদি লইয়া কেহ কেহ দ্বিতলে উঠিল, কিন্তু যাহাদিগের দ্বিতলবাটি ছিল না তাহাদের সমস্ত ডুবিয়া যাইতে লাগিল। চারিদিকে হাহাকার উঠিল। বেলা তিনটার সময় জলের প্রকোপ অনেক কমিয়া গেল এবং গ্রাম হইতে জল অপসৃত হইল।

নরেন্দ্রনাথ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি অনেকেই তখন আলমোড়ায় বদ্রিসা-র বাড়িতে অবস্থান করিতেছিলেন। যোগেন মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ ও গিরিশবাবু এই তিনজনে মিলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শরৎ মহারাজের নামে টেলিগ্রাম করিলে শরৎ মহারাজ সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া নরেন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দিতে পারেন, কারণ নরেন্দ্রনাথের মাতা তখন অতি শোকার্ত হইয়াছিলেন।

শরৎ মহারাজের নামে টেলিগ্রাম করা—একটা নৌকা লইয়া যোগেন মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ ও বর্তমান লেখক কলিকাতার দিকে চলিলেন, তখন গঙ্গায় আরও দুই চারখানি নৌকা বাহির হইয়াছে। নৌকাখানি মাঝখান দিয়া চলিল, যখন কাশী মিত্রের ঘাটের কাছে আসিয়াছে তখন কাশী মিত্রের সমস্ত ঘাটটি ভুস করিয়া ডুবিয়া গেল, জল বিশেষ আলোড়িত হইয়া উচ্ছ্বাস ও তরঙ্গ তুলিল কিন্তু

নৌকাখানি গঙ্গার মাঝে থাকায় বিশেষ কিছু ক্ষতি হইল না। গঙ্গায় বয়ার উপর ছোট ছোট লাল নিশান বাঁধিয়া দিয়াছিল, বয়াগুলি ডুবিয়া গিয়াছে, নিশানের কাপড়টা কেবলমাত্র একটু উঠিয়া আছে। বাগবাজার হইতে পোল পর্যন্ত ডাঙ্গাটি জাগিয়াছিল, জল উঠিতে পারে নাই। পোলটি এক সুবৃহৎ ত্রিকোণ হইয়া গিয়াছে, গরু ও ঘোড়ার গাড়ির যাতায়াত বন্ধ। বড়বাজার মিরবহরের ঘাটে নৌকা লাগিল। তিনজনে অতিকষ্টে ত্রিকোণ পোলটি দিয়া পাহাড় চড়াই ও উৎরাইয়ের মত হাওড়া স্টেশনে গিয়া শরৎ মহারাজের নামে টেলিগ্রাম করিয়া পূর্ববৎ পোলটি পার হইয়া রামতনু বসুর গলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যোগেন মহারাজ কর্তৃক নরেন্দ্রনাথের মাতাকে সান্ত্বনা দান— নরেন্দ্রনাথের মাতা তখন শোকার্ত হইয়া কাঁদিতেছিলেন। যোগেন মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ নরেন্দ্রনাথের মাতাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। নরেন্দ্রনাথের মাতাও যোগেন মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। বাবুরাম মহারাজ শোকার্ত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন এবং যোগেন মহারাজ ধীরে ধীরে অতি মিষ্টবাক্যে সন্তনা করিতে লাগিলেন রামতনু বসুর গলির বাড়িতে বাহিরদিকেও সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উপরকার ঘরেতে তখন সকলে বসিয়াছিলেন। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া গেল, সকলেই অতি বিষণ্ণ, যোগেন মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, যে, মাষ্টার মহাশয়ের একটি কন্যার লোকান্তর হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে আরও পাঁচ-সাতটি মৃত্যুসংবাদ দিলেন।

যোগেন মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজের মিষ্ট, সহৃদয় ও স্নেহপূর্ণ কথায় নরেন্দ্রনাথের মাতা অনেক পরিমাণে সান্ত্বনালাভ করিলেন। নানা কথাবার্তার পর রাত্রি নয়টার সময় বাবুরাম মহারাজ ও যোগেন মহারাজ বাগবাজারে ফিরিয়া গেলেন। যোগেন মহারাজের কি ভালবাসাপূর্ণ প্রাণ ছিল, কি অদ্ভুত বিবেচনাশক্তি ছিল, কি আমায়িক অকপট ভাব ছিল এবং কি প্রকারে সকলের সহিত সমানভাবে তিনি

মিশিতে পারিতেন, এই উদাহরণটিতে তাহার অল্পমাত্র আভাস পাওয়া যাইবে।

জনৈক গণৎকার ও নরেন্দ্রনাথের দেহের শুভ চিহ্ন বর্ণনা— একদিন বৈকালবেলা বর্তমান লেখক গিরিশবাবুর বাটিতে যাইলেন। শরৎ মহারাজ ভিতরকার বারাণ্ডার দিকে উভয় দরজার মধ্যস্থিত দেওয়ালটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। গিরিশবাবু তাঁহার বিছানার উপর বসিয়া আছেন। বর্তমান লেখক যাইয়া শরৎ মহারাজের পার্শ্বে বসিলেন। জনৈক গণৎকারের কথা উঠিল, শরৎ মহারাজ বলিলেন, "শুনেছ, তুই একদিন আগে এক গণৎকার এসেছিল, সে হাত পায়ের লক্ষণ দেখতে খুব ভাল পারে। নরেনের সঙ্গে তাহার আলাপ-পরিচয় ছিল না, হঠাৎ নরেনের পায়ের দিকে চাহিয়া বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইল। নরেনের ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের তলা ও তৎনিম্নস্থিত স্ফীত স্থানটি বিশেষ করিয়া বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'এই যুবকটির পায়ে শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতি চারিটি চিহ্ন রহিয়াছে, ইহা প্রায় সাধারণ লোকের দেখা যায় না।' তারপর গণৎকারটি একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, 'ইহার এখন যেমন অবস্থা দেখছি তাতে ঐ সব লক্ষণের সঙ্গে ত কিছু মিলছে না'।" কারণ নরেন্দ্রনাথ তখন নগ্নপদে কোঁচার কাপড়টি গায়ে দিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং উপস্থিত কেহ কিছু অন্ন দিলে গ্রহণ করিতেন।

নরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যতে যে বিশ্বজয়ী শক্তি হইয়াছিল তখন তা হার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সাধারণ ভক্তবৃন্দ যেমন, তি নি তদ্রূপই ছিলেন তবে সামান্যমাত্র প্রভেদ ছিল। এই সমস্ত কথা শুনিয়া শরৎ মহারাজ কিঞ্চিৎ হর্ষিত ও বিস্মিত হইয়া অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। গিরিশবাবুও কথায় যোগ দিয়া বলিলেন, "এ গণৎকারটি বড়ই বিচক্ষণ, যখন এ সকল শুভ লক্ষণের কথা বলেছে তখন ঠিকই হবে, তবে এখন তেমন কিছু বুঝা যাইতেছে না।" ঘরে আরও অনেকেই ছিলেন, সকলে দোমনা হইয়া ঐ কথাই কহিতে লাগিলেন।

তারপর সকলেই আপন আপন ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির নিম্নস্থান দেখিতে লাগিলেন। যাঁরা এ বিষয়ে একটু-আধটু পারদর্শী ছিলেন তাঁরা কিরূপ লক্ষণকে শঙ্খ বলে, কিরূপ লক্ষণকে চক্র বলে, কাকেই বা যব, ধান বলে বুঝাইতে লাগিলেন। কষ্টকল্পনা করিয়া উপস্থিত সকলের একটি বা দুইটি শুভলক্ষণ দেখা গেল কিন্তু চারটি শুভলক্ষণ কাহারও হইল না। সকলেই সেদিন অনিশ্চিত গণৎকারের কথা লইয়া হর্ষিত ও সন্দিগ্ধমনে নানাভাবের কথা কহিতে লাগিলেন।

পায়ের তলা অনেক প্রকার হয় এবং সেই হিসাবে লক্ষণও হইয়া থাকে। রাখাল মহারাজের পা ছিল হাতী পা বা চ্যাপটা পা অর্থাৎ পায়ের তলার অধিকাংশ মাটির সহিত সংলগ্ন থাকিত। কাহারও বা ঘোড়া পা বা খড়ম পা হয়, অর্থাৎ মাটিতে পায়ের মধ্যস্থান সংলগ্ন হয় না, শুধু একদিকের ধারটা উপর নীচু মাটি স্পর্শ করে। নরেন্দ্রনাথের পা ছিল নাতি-হ্রস্ব, নাতি-দীর্ঘ এবং ঘোড়া পা বা খড়ম পা কিঞ্চিৎ ন্যূনভাবে ছিল। মোট কথা, অল্প পরিমাণে হাতী পা ও অল্প পরিমাণে ঘোড়া পা মিশ্রিত ছিল।

নরেন্দ্রনাথের নখের চিহ্ন—নরেন্দ্রনাথের হাতের অঙ্গুলি বা নখের বিশেষ লক্ষণ ছিল। যাঁহারা এটা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। অঙ্গুলি গোড়া হইতে আসিয়া ডগার দিকে কিঞ্চৎ পরিমাণে ক্ষীণ হইয়াছে। থ্যাবড়া বা ফ্যাটকা নখ নহে, ইংরাজিতে যাহাকে tapering finger বা বাংলায় যাহাকে চাঁপারকলি অঙ্গুলি বলে সেই প্রকার ছিল, কিন্তু মেয়েদের আঙ্গুলের মত নয়। এইরূপ অঙ্গুলি যাহাদের হয় তাহাদের মনের ভাব চোস্ত কাটাগড়া তৈয়ারি অর্থাৎ দ্বিধাশূন্য নিশ্চয়াত্মিক। আঙ্গুলের নখে আর একটা বিশেষ লক্ষণ ছিল। অনেকের ফ্যাকাসে সাদা, চ্যাপটা বা ছুঁচোলো মাথা ইত্যাদি নানাপ্রকার নখ হইয়া থাকে। নরেন্দ্রনাথের নখ ছিল ঈষৎ রক্তবর্ণাভ বা জৌলুসযুক্ত এবং নখের মাথাটি অর্ধচন্দ্রাকার ছিল। বর্তমান লেখক এইরূপ আঙ্গুল বা নখ খুব কম লোকের দেখিয়াছেন। সংস্কৃতে এই নখকে 'নখমণি' বলিয়াছে।

নরেন্দ্রনাথের পদবিক্ষেপ ও হস্তভঙ্গি—নরেন্দ্রনাথের পদবিক্ষেপ অতিদ্রুত বা অতিশ্লথও ছিল না; যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বিজয়াকাঙ্ক্ষায় অতি দৃঢ় সুনিশ্চিত ভাবে ভূপৃষ্ঠে পদবিক্ষেপ করিয়া চলিতেন। বাহিরে কথাবার্তায় যে প্রসঙ্গই হউক না কেন, পদবিক্ষেপে কিন্তু বিশেষ গাম্ভীর্য ও নিশ্চয়তা প্রকাশ পাইত। বুদ্ধদেব যখন সুজাতার বাড়িতে অল্পদিন আহারাদি করিয়া পুনরায় প্রস্তরখণ্ডে বসিবার উপক্রম করিতেছেন সেই সময় তাঁহার পদবিক্ষেপের বহু প্রকার বর্ণনা আছে, যথা শশকবৎ, ভেকবৎ, করীবৎ, সিংহবৎ ইত্যাদি। নরেন্দ্রনাথের পদবিক্ষেপ সব সময়ই নিশ্চয় বিজয় লাভের সূচনাস্বরূপ ছিল। কোন সময় হর্ষিত হইলে বা বক্তৃতা দিবার কালে তিনি ডান হাতের অঙ্গুলি প্রথমে সংযত করিয়া হঠাৎ ছড়াইয়া ফেলিতেন এবং তাঁর মনে যেমন যেমন ভাব উঠিত, অঙ্গুলি-সঞ্চালনও তদনুরূপ হইত। ডান হাতের পর বাম হাতে ঠিক এইরূপ ভাবই দেখাইতেন। একটু বিশেষ উত্তেজিত হইলে উভয় হস্ত ও অঙ্গুলি দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতেন। নরেন্দ্রনাথের মনে যেরূপ ভাব উঠিত, তাহার অর্ধাংশ কথা দিয়া ও অপর অর্ধাংশ হস্ত, অঙ্গুলি ও মুখভঙ্গি দিয়া প্রকাশ করিতেন এইজন্য আমেরিকানরা বলিত, "He is an orator by divine right" অর্থাৎ ঈশ্বরদত্ত বাগ্মীশক্তি তাঁহার আছে। নাট্যশালার অভিনেতারা ভাব প্রকাশ করিতে যেরূপ অঙ্গভঙ্গিমা করে, নরেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক অবস্থায় তার চেয়ে ঢের বেশী অঙ্গভঙ্গিমা প্রকাশ হইত। ছ্যাবলাম বা ভাঁড়ামি করিয়া কেহ হাত পা নাড়িয়া চপলতা প্রকাশ করিলে, নরেন্দ্রনাথ তাহাতে বড়ই বিরক্ত হইতেন; কারণ তাঁহার হস্তাদি সঞ্চালন অতি গম্ভীরভাব প্রকাশ করিত এবং প্রত্যেক জিনিসটিই দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্যভাবে প্রস্ফুটিত হইত।

আলমবাজার মঠ ও মঠের বর্ণনা—সম্ভবতঃ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কার্তিক মাসেতে বরাহনগরের পুরাতন বাড়িটি ছাড়িয়া দিয়া আলমবাজারের একখানি বাড়িতে মঠ উঠিয়া গেল। আলমবাজার থেকে লোচনঘোষের

ঘাটে যাইবার যে সড়কটি তাহার দক্ষিণ দিকের বাড়িখানি—রাস্তার উত্তর দিকে মোটা মোটা থামওয়ালা চট্টোপাধ্যায়দের বাড়ি। সদর দোরটি পূর্বদিকের গলির ভিতর। সদর দোর দিয়া ঢুকিয়া উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইটি ছোট দালান বা রক; সামনে একটি উঠান; তাহার পর পশ্চিমমুখী তিন-ফোকরী ঠাকুরদালান। উত্তর দিকের দালান দিয়া একটি ঘোরান সিঁড়ি দোতলায় উঠিয়াছে; দোতলায় উঠিয়া দক্ষিণ পূর্ব দিকে দুইটি দালান বা বারাণ্ডা—বারাণ্ডা, লাল, নীল রঙ্গীন আটকোণা টালিদিয়ে মোড়া। পূর্বদিকের বারাণ্ডার পশ্চাতে অর্থাৎ উপর দিকে একটি লম্বা বড় ঘর, তিনটি দরজা এবং তাহার পরে একটি ছোট ঘর।

দক্ষিণদিকের গরাদে দালান বা বারাণ্ডা দিয়া গিয়া একটি কাঠের ঝিলমিলি দেওয়া স্নানের ঘর দক্ষিণ ও পূর্বদিকের বারাণ্ডায় গোল থাম ও কাঠের গরাদ দেওয়া। স্নানের ঘরের পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিলে একটি দরজা, সেই দরজা দিয়া দক্ষিণদিকে যাইবার পথ এবং ডানদিকের ও বাঁদিকের ঘরের জানালাগুলি তথায় স্থাপিত।

দক্ষিণদিকের দরজা হইতে একটি প্রশস্ত পথ রহিয়াছে, পথটির বাঁদিকে একটি এবং ডানদিকে সারি সারি তিনটি ঘর, উভয় পার্শ্বের দুইটি ঘরের জানালা এই গলির ভিতর। বাঁদিকের ঘরটিতে ঠাকুরঘর হইল, দরজা ও দুইটি জানালা দক্ষিণমুখী। ভিতর বাড়িতেও একটি উঠান ছিল এবং উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে একটি ছাদওয়ালা বারাণ্ডা বা দালান, কেবল পূর্বদিকে বড় একটি ছাদ, তার উপরে আবরণ ছিল না। ঠাকুরঘরের পার্শ্ব দিয়া নিচে নামিবার একটি সিঁড়ি এবং ঠাকুর ঘরের সুমুখে যে দালানটি তাহার পূর্ব কোণে একটি ছোট ঘর, তথায় ঠাকুরের ভাঁড়ার থাকিত। পূর্বদিকের খোলা ছাদের পূর্বপ্রান্তে প্রাচীরের কাছে নিম্নস্থ রন্ধন-গৃহের ধোয়া বাহির হইবার জন্য একটি আওয়াজি বা ধূম নির্গমনের অনেকগুলি ঘুলঘুলি ছিল। এই আওয়াজিটির কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একটি ছোট পায়খানা।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, পশ্চিমদিকে তিনটি ছোট গৃহ। এই তিনটির, পশ্চিম-দক্ষিণটিতে বা সর্বশেষটিতে শশী মহারাজ থাকিতেন। এই গৃহের জানালা হইতে বাহিরের পল্লী অনেকটা দেখা যাইত; শশীমহারাজের ঘরের উত্তরদিকে অর্থাৎ মধ্য কক্ষটিতে কালী বেদান্তী পড়াশুনা ও জপধ্যান করিত এবং পশ্চিমদিকের ঘরে আবশ্যকমত লোক থাকিত কিন্তু অধিকাংশ লোকই বারবাড়ির বড় হল ঘরটিতে থাকিত।

ঠাকুরঘরের পার্শ্বে অবস্থিত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া একতলাতে গেলে বাঁদিকে অর্থাৎ পূর্বদিকে রাঁধিবার ঘর রান্নাঘরের দক্ষিণ দিকে আর একটি ঘর ছিল, এঁদোপড়া, তাহার পর রান্নাঘরের সুমুখের দক্ষিণদিকে গেলে পূর্বদিকে একটি গলি; গলি দিয়া যাইলে একটি ঘাটবাঁধান পুকুর। পূর্বদিকের পুকুরটাও বাড়ির অন্তর্গত। উঠানের উত্তরপশ্চিমদিকে কয়েকটি এঁদোপড়া ঘর ছিল, কিন্তু সেগুলো বিশেষ কোন কাজে আসিত না এবং বারবাড়ি যাইবার উপরকার পথের নীচেও একটা পথ ছিল সেটা প্রায় ব্যবহার হইত না। বারবাড়ির উপরকার হলঘরের নীচে এক-তলায় গোটাদুই এঁদোপড়া ঘর ছিল, তাহা কোন বিশেষ কাজে লাগিত না। এই হইল সমস্ত বাড়ির বর্ণনা।

কালীকেষ্ট মহারাজ—বরাহনগরের মঠের শেষ অবস্থাতে কালীকেষ্ট মহারাজ (স্বামী বিরজানন্দ) প্রথম আসিয়া মঠে যোগ দিলেন। ইহাদিগের আদিবাস নরেন্দ্রনাথের পৈতৃক বাটির সন্নিকটে, কিন্তু ইহার পিতা ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ বসু নারকেলডাঙ্গায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন; কালীকেষ্টর বয়স তখন উনিশ বা কুড়ি বৎসর হইবে। সোনার পাতের মতন চেহারা, কথাবার্তা, অতি মধুর ও বিনয়ী এবং অতি কাতরভাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যেন শরণাগত হইয়াছে। তখন তাহার অল্প অল্প কোঁকড়ান দাড়ি ছিল এবং ধনাঢ্য ঘরের ছেলে, সেইজন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলা অতি কোমল, যেন কখন কষ্ট বা অভাব সহ্য করে নাই। কালীকেষ্ট বরাহনগর মঠের বারবাড়িতে কালী বেদান্তীর ঘরের পার্শ্বের ঘরটিতে বা কখন ভিতরে ঢুকিয়া ঠাকুরঘরটিতে নিবিষ্ট

মনে অনবরত জপ করিত। বয়স অল্প, এইজন্য জপ করিতে করিতে অনেক সময় নিদ্রা যাইত। তাহার কঠোরতা দেখিয়া সকলেরই মনে স্নেহের ভাব উদ্রেক হইত। কথাগুলি জড়িয়ে অতি মিষ্টভাবে কহিত এবং বিশেষ আবশ্যক না হইল কথা কহিত না। সকলের কাছে অতি বিনীত ও নম্রভাবে থাকিত। কয়েক মাস মঠে থাকিয়া শরীর অসুস্থ হওয়ায়, নিজেদের বাড়িতে চলিয়া যায় এবং বরাহনগর মঠের শেষ সময় পুনরায় চলিয়া আসে। কিন্তু তাহার পর আবার ম্যালেরিয়া জ্বর হওয়ায় বাড়ি ফিরিয়া যায়।

সুধীর, সুশীল, হরিপদ ও খগেন—সুধীর (স্বামী শুদ্ধানন্দ) ও তাহার কনিষ্ঠভ্রাতা সুশীল (প্রকাশানন্দ), হরিপদ (বোধানন্দ) ও খগেন (বিমলানন্দ) বরাহনগরের মঠের মাঝামাঝি অবস্থাতে কখন কখন আসিত। তখন চারিজনই স্কুলে পড়ে। বয়স কালীকেষ্টরই সমান। ইহারা আসিয়া যোগেন মহারাজের সহিত বরাহনগরের মঠের বাহিরের দিকের দালানের শেষ প্রান্তে, অর্থাৎ দক্ষিণদিকের কোণটিতে বসিয়া নানাপ্রকার কথাবার্তা কহিত। সুশীল সকলের চেয়ে অল্পবয়স্ক, খর্বাকৃতি ও ডান চোখটি কিঞ্চিৎ টেরা অর্থাৎ কথা কহিবার সময় ঘাড়টি ডান দিকে ফিরাইয়া ডান চোখটি কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে করিয়া কথা কহিত। অতি সরল ও অল্প বয়সবশতঃ যোগেন মহারাজের কথার ভাব অনেক সময় বুঝিতে পারিত না, এইজন্য এককথার জায়গায় অপর কথা বলিয়া ফেলিত। সেইজন্য যোগেন মহারাজ অনেক সময় বলিতেন, "তুই ছোঁড়া বড্ড বোকা!" সুশীলকে অপ্রতিভ দেখিয়া অপর সকলে হাসিত। সর্বদাই না হউক, তবে মাঝে মাঝে ইহারা বরাহনগর মঠে যাইত এবং সকলেই ইহাদিগকে বিশেষ স্নেহ করিত ও ভালবাসিত।

কানাই, নিবারণ, নন্দলাল, পটল—কানাই (স্বামী নির্ভয়ানন্দ) নিবারণ, নন্দলাল ও পটল ইহারা আহিরীটোলার ছেলে। বরাহনগরের মঠে মাঝে মাঝে আসিত এবং কাজকর্ম করিত। শশী মহারাজ

ইহাদিগকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। নিবারণ শ্যামা-বিষয়ক গান বেশ রচনা করিতে পারিত এবং তাহার স্বরচিত গানগুলি আলমবাজার মঠের ঠাকুরঘরের সুমুখে বসিয়া অথবা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরের সুমুখে বসিয়া গাহিয়া সকলকে শুনাইত। রাখাল মহারাজের ছেলে সত্যচরণ নয়-দশ বৎসরের হইলে, তাহাকে এবং মনোমোহন মিত্রের পুত্র গৌরীকে পড়াইবার জন্য নিবারণকে নিযুক্ত করা হয়। নিবারণ সিমলা ষ্ট্রীটে মনোমোহন মিত্রের বাড়িতে আসিয়া নিত্য তাহাদের পড়াইত।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি

শিব ওম্‌ !

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

ভ্রম সংশোধন

পৃঃ নং	পংক্তি নং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২	৺বিশ্বাথ	৺বিশ্বনাথ
১৭	৬	যৎকিঞ্চিত	যৎকিঞ্চিৎ
২৪	১২	সংহোজন	সংযোজন
৩৪	১২	উয়াঠি	উঠিয়া
৫৩	২৭	ছল	ছিল
৬৫	১৮	চক্রংমণ	চংক্রমণ
৮৩	১৬	ভ্রূপেক্ষ	ভ্রূক্ষেপ
৮৫	১২	বসুর বাটিতে	বসুর গলির বাটিতে
৯১	১৭	যক্ষা	যক্ষ্মা
৯২	৪	আফিম	আফিমও

মহেন্দ্রনাথ দত্ত
রচিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান
পুস্তকের
ইংরাজী অনুবাদ
প্রকাশিত হইল।

Books by Sri Mohendra Nath Dutt

ENGLISH

Religion, Philosophy, Psychology

1.	Natural Religion	—
2.	Energy	4·00
3.	Mind	—
4.	Mentation	2·50
5.	Theory of Vibration	2·50
*6.	Cosmic Evolution—Part I	—
7.	Cosmic Evolution—Part II	4·00
8.	Ttiangle of Love	2·00
9.	Formation of the Earth	2·50
10.	Metaphysics	2 50
11.	Theory of Motion	2·50
12.	Biology	7·00
13	Logic of Possibilities	4·00
14.	Devotion	4·00
15.	Ego	6·00
16.	Theory of Sound	3.50
17.	Theory of Light	5·00
18.	Ethics	3·00
19.	Thoughts On Religion	4·50
20.	Action	3·00

Art & Architecture

1.	Dissertation on Painting	4·00
*2.	Principles of Architecture	—

Literary Criticism Epic ete.

1.	Appreciation of Michael Madhusudan and Dinabandhu Mitra	1·50
*2.	Kurukshetra	—
3.	Nala and Damayanti	5·00
4.	Language and Grammar—Retoric—	

Social Seiences

1.	Lectures on Status of Toilers	2·50

* Books marked with asterisks are out of print.

2.	Homocentric Civilization	2·50
3.	Reflections on Society	2·00
*4.	Lectures on Education	—
5.	Federated Asia	4.50
6.	National Wealth	5·50
7.	Nation	2·00
8.	New Asia	3·00
*9.	Rights of Mankind	
*10.	Social Thoughts	
11.	Temples and Religious Endowments	1 50
*12.	Status of Women (with Bengali Translation)	—
13.	Toilers Republic	0·50
*14.	Reflections on woman (Published by Saradeswari Ashram)	—
15.	Society and Education—Society and woman	4·00
16.	Society (in the press)	

HINDI

1.	Nari: Adhikar ("Translation of Status of Women")	0.75
2.	Manab-Kendrik Sabhyata (Translation of Homocentric Civilization)	1·00

Books Awaiting Publication

1. Dissertation on Poetry
2. Lectures on Philosophy

বাংলা **মূল্য**

অনুধ্যান, দর্শন প্রভৃতি

১	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান	১০·০০
২	লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ১ম খণ্ড,	৮·০০
৩	লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ২য় খণ্ড,	
৩	লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড	
৩	লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, (২য় ও ৩য় খণ্ড একত্রে)	১৫·০০
৪	শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী ১ম খণ্ড,	১৫·০০

৫।	ঐ ২য় খণ্ড	৪.০০
৬।	ঐ ৩য় খণ্ড	৪.০০
৭।	স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী	৩.৫০
৮।	কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ	৪.০০
৯।	শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী	
১০।	শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান	২.০০
*১১।	ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ	—
*১২।	দীন মহারাজ	--
*১৩।	গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ)	—
১৪।	সাধুচতুষ্টয় (সারদেশ্বরী আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত)	৮.০০
*১৫।	জে· জে, গুডউইন (স্বামীজীর ক্ষিপ্র লিপিকার)	—
*১৬।	গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান	—
*১৭।	মাতৃদ্বয় (গৌরী মা ও গোপালের মা)	—
১৮।	ব্রজধাম দর্শন	৩.৫০
১৯।	নিত্য ও লীলা (বৈষ্ণব দর্শন)	২.০০
২০।	বদরীনারায়ণের পথে	—
২১।	মায়াবতীর পথে	১.৫০
২২।	তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান	৩.৫০
২৩।	মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান	৮.০০
২৪।	অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুধ্যান	৮.০০
*২৫।	মাষ্টার মহাশয় (শ্রীম)	—
২৬।	ব্রহ্মানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন	২.৫০

কাব্য সমালোচনা প্রভৃতি

*১।	বাংলা ভাষায় প্রধাবন	—
২।	পশুজাতির মনোবৃত্তি	১.০০
৩।	পাশুপত অস্ত্রলাভ (কাব্য)	৫.০০
৪।	গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত)	—
৫।	সঙ্গীতের রূপ	১.৫০
৬।	নৃত্যকলা	১.০০
৭।	শিল্প প্রসঙ্গ	—
*৮।	খেলাধুলা ও পল্লীসংস্কার	—

*৯।	বৃহন্নলা (কাব্য)	—
*১০।	প্রাচীন ভারতের সংশ্লিষ্ট কাহিনী	—
১১।	বিবিধ কবিতাবলী	˙৫০
১২।	কাব্য অনুশীলন	১˙০০
১৩।	কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা	৬˙০০
১৪।	প্রাচীন জাতির দেবতা ও বাহনাবাদ	৩˙০০
১৫।	প্যালেষ্টাইন ভ্রমণকাহিনী ও ইহুদী জাতির ইতিহাস	১˙৫০
*১৬।	ঊষা ও অনিরুদ্ধ	—
১৭।	দৌত্য কার্য	৬˙০০

Allied Publications

১।	স্মৃতি-তর্পণ শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	৩˙৫০
*২।	কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমহেন্দ্রনাথ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘটক	—
৩।	স্মৃতি-কথা শ্রীসাতকড়ি মিত্র	১˙২৫
৪।	আমার দেখা মহিমবাবু শ্রীরঘুনাথ বসু	১˙০০
৫।	বিবধ প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ শ্রীমানসপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	২˙৫০
৬।	শতবার্ষিকী লেখমালা	৫˙০০
৭।	পুণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে শ্রীসত্যচরণ দত্ত	৩˙০০
*৮।	সংলাপে মহেন্দ্রনাথ ১ম খণ্ড	—
	,, ,, ২য় খণ্ড শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু	১০˙০০

গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া মহেন্দ্র দর্শনের ভূমিকায় পরিচিত হউন।

9	Labour and Capital Sri R. K. Ghosh	1·00 P.
10.	Education in Free India Sri R K. Ghosh	0.37,,
11.	Dialectics of Land-Economics of India Sri Bhupendra nath Dutta A. M. (Brown) Dr. Phil (Hamburg)	40·00 ,,